শ্রীঅরবিন্দের দিব্য কর্ম্মযোগ

শ্রীমতী সুধা বসু

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রকাশকের কথা

"শ্রীঅরবিন্দের যোগ" সম্বন্ধে শ্রীমৎ অনির্বাণ শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে ধারাবাহিকভাবে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তা 'বর্ত্তিকা' নামক পত্রিকাতে তাঁরই ভাষণ অবলম্বনে ঐ নামেই ক্রমানুসারে প্রকাশিত হয়েছিল। "শ্রীঅরবিন্দের দিব্য কর্মযোগ" তারই সংকলন মাত্র, ভিন্ন নামে। শ্রীমতী সুধা বসু, শ্রীমৎ অনির্বাণের ভাষণগুলি সরল সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শ্রীমৎ অনির্বাণ, যা বলতে চেয়েছিলেন তাঁর ভাষণে, তা ব্যাহত হয়নি কোথাও কারণ বিষয় ও ভাষায় তাঁর প্রত্যক্ষ অনুমোদন আছে।

সূচীপত্র

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য কর্মযোগ

(১)

জীবন ও যোগ

যোগের কথায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই বললেন, All life is yoga—সমস্ত জীবনটাই একটা যোগ। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখি, ঘোর আঙ্গিরস্ দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে বলছেন, 'পুরুষই যজ্ঞ। তার জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর হল প্রাতঃসবন, তারপর চুয়াল্লিশ বছর ধরে মাধ্যন্দিন সবন এবং অবশেষে আটচল্লিশ বছর সায়ন্তন সবন। এমনি করে তার সমস্তটা জীবনই একটা সোমযাগ—বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য সমস্তই একটা অমৃত আনন্দের উচ্ছলন।' উপনিষদ বলছেন, 'একথা শুনে কৃষ্ণ অপিপাস হয়ে গেলেন।'

এখানে দুটি ভাবনার সমন্বয় দেখতে পাচ্ছি। জীবন আনন্দে উচ্ছল অথচ পুরুষ অপিপাস, অকামহত—বাসনার উত্তালতা বা অবসাদ তাঁর মধ্যে নাই। গীতাতেও দেখি এই ভাবনারই উদ্দীপ্ত প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের সমস্তটা জীবনই ভূতভাবন একটা যজ্ঞ, তিনি উন্মেষে-নিমিষে যোগযুক্ত। অথচ তাঁর যোগ পর্বতকন্দরে নয়—কুরুক্ষেত্রে, সেখানে তিনি নিত্যজাগ্রত। এই তাঁর বহির্যোগ। আর, তাঁর অন্তরে বৃন্দাবনের স্বপ্ন—এই তাঁর অন্তর্যোগ। তাঁর কুরুক্ষেত্রের শিক্ষা আজও রূপ ধরে নি। সমস্ত জীবনই যে যোগ বা যজ্ঞ—একথা কোথাও তেমন জোর দিয়ে যেন বলা হয় নি। বিবিক্ত সাধনার শেষে জীবন্মুক্তের জীবন যোগজীবন—এ-আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সাধনার শুরুতেই ব্যবহারিক জীবনও যে যোগজীবন হতে পারে—একথা একবার আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনেছিলাম, আবার তার উদাত্ত ঘোষণা শুনলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে।

তা-ই হয়। 'কালেন মহতা' যোগ নষ্ট হয়ে যায়, আবার সেই পুরাতনকে যুগের প্রয়োজনে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবনের আদর্শ এবং যোগ-সমন্বয়ের ভিত্তি এই ফিরিয়ে আনার উপরে। তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমার যোগ আনকোরা নতুন, একথা আমি বলি না। পূর্বের যোগধারার সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে, এবং তা থেকে অনেক-কিছুই আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাতে ফুটে উঠেছে অভিনবের একটা ব্যঞ্জনা'—যেমন আমরা দেখি গীতাতে। পূর্ণযোগের তিনটি অভিনবত্বের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। প্রথমতঃ, এ-যোগে শুধু উপরে উঠে যাওয়াই নয়, সেখান থেকে সমৃদ্ধ হয়ে আবার নীচে নেমে এসে জীবনকে সমৃদ্ধ করারও একটা দায় যোগীর আছে। দ্বিতীয়ত, ঠিক এই কারণেই এ-যোগ একার যোগ নয়, সবাইকে নিজের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাবার জন্য এ একটা বিশ্বযোগ। তৃতীয়ত, লক্ষ্য ও প্রকারের এই ভেদ হতে এ-যোগের রীতিতেও অনেক-কিছু নতুনত্ব থাকবে, অতীতের অনুবৃত্তি হয়েও সবটাই তার পুনরাবৃত্তি হবে না। পূর্ণযোগের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হতে বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দের সাধনপদ্ধতিতে যোগ আর জীবনে কোথাও কোনও ছেদ পড়ে নি কেন।

* * *

মাণ্ডুক্যোপনিষদে আত্মাকে বলা হয়েছে চতুষ্পাৎ—জাগরিতস্থান স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান পুরুষরূপে তাঁর তিন পাদ, আর চতুর্থপাদে তিনি প্রপঞ্চোপশম, শান্ত শিব এবং অদ্বৈত। সাধারণ জীবনে আমরা দিনের বেলায় জেগে থাকি আর রাতে ঘুমাই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, আবার সুষুপ্তিতে স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ি। তারপর আবার জেগে উঠতে হয়, ঘুম ভেঙে যায়। এই জাগ্রত চৈতন্যকেই সাধারণতঃ আমরা জীবন বলে বুঝে নিয়েছি। অবশ্য স্বপ্নেও এর ছায়া পড়ে, কিন্তু সুষুপ্তির স্মৃতি আমাদের থাকে না—এক প্রাণারাম সুখানুভব ছাড়া। তাইতে বুঝি যে, ঘুম আর জাগরণ তখনও একই

সঙ্গে চলেছিল—মন ঘুমিয়ে পড়লেও প্রাণ কিন্তু জেগেই ছিল। এমনি করে চেতনাকে খুলে-মেলে-ছড়িয়ে দিয়ে যেমন আমাদের জেগে থাকতে হয়, তেমনি আবার তাকে গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রামেও যেতে হয়। এর মধ্যে কাকে আমরা যোগভূমি বলব—বাইরে চেতনার বিস্ফারণকে, না অন্তরে তার সংহরণকে ?

আমাদের দেশে বহুদিন ধরে যে-যোগপন্থাগুলি চলে এসেছে তাতে সংহরণ বা নিরোধের ধারাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। নির্বীজ সমাধি বা প্রপঞ্চোপশমে তুরীয় স্থিতি যোগের লক্ষ্য হয়ে ওঠায় প্রাকৃতজীবন থেকে যোগজীবন যেন বিযুক্ত —এইরকম একটা ধারণা সাধারণ মনে দানা বেঁধে আছে। যোগের ভাষায়, চেতনাকে গুটিয়ে এনে নিরোধের দিকে যাওয়া 'সমাধি' আবার বাইরে বা জাগ্রতে ফিরে আসা হল 'ব্যুত্থান'। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বলেছেন, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। মরমীয়ারা বলেছেন, নিদ্রা আর সমাধিস্থিতি এক। তাঁদের মতে এই হল যোগভূমি। ব্যুত্থানে চিত্ত মূঢ়, ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত। এগুলি যোগভূমি হতে পারে না, যদিও এসব ভূমিতেও মানুষের সমাধি হতে পারে—কেন না সমাধি সার্বভৌম চিত্তধর্ম। কিন্তু সে-সমাধি যোগের সমাধি নয়। বিক্ষিপ্ত ভূমির পর একাগ্রভূমিতেই যথার্থ যোগ শুরু হয়, যদি সে একাগ্রতার আলম্বন হয় অন্তরাবৃত্ত আত্মচৈতন্য বা বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য। উভয় ক্ষেত্রেই জগৎ যোগের এলাকা থেকে বাদ পড়ে যায়।

কিন্তু এভাবে সমাধি হলেও তাতে সর্বক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না। সমাধির পর আবার স্বভাবের নিয়মেই সাধকের ব্যুত্থান হয়। রামকৃষ্ণদেব সপ্তস্বরের উপমা দিয়ে বলতেন 'সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,—নি-তে সর্বক্ষণ থাকা যায় না আবার সা-তে ফিরে আসতে হয়।' ফিরে এসে দেখি, বাইরের জগৎ তার ঝামেলা নিয়ে যেমন ছিল তেমনি আছে। তখন বাইরের ঝামেলা থেকে আবার আমরা ভিতরের শান্তিতে ডুবে যেতে চাই। এমনি করে বারবার

নিরোধের অভ্যাসদ্বারা সর্বনিরোধ নির্বীজ সমাধি লাভ ক'রে সেখানেই থেকে যাবার দিকে আমাদের একটা ঝোঁক আসে।

কিন্তু, এতে সমাধি ও ব্যুত্থানে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। বাইরের জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়া কাম্য হয়ে ওঠে, বাইরের ঝামেলা থেকে বরাবর দূরে থাকার চেষ্টাই প্রবলতর হয়। যোগের এই ধারা সাংখ্যসম্মত। সাংখ্যের মতে যোগের লক্ষ্য আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানো। কথাটা ঠিক, কিন্তু গীতা আরও গভীর সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়ে বললেন, 'সমত্বই যোগ'। দুঃখনিরোধের আদর্শ তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হ'ল—দুঃখ ও সুখকে সমানভাবে গ্রহণ করা। সমাধি ও ব্যুত্থানে সমতা আনতে হবে। সমাধিতে প্রপঞ্চের উপশমের ফলে যে অদ্বৈতবোধনিবিড় শান্তি, তার প্রসাদ নামিয়ে আনতে হবে জাগ্রতে। স্থিতধী বা জাগ্রতেও সমাধিস্থ পুরুষের প্রধান লক্ষণ হল সমতা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তিনি কি বলেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে বিচরণ করেন?' এটা এমন একধরনের প্রশ্ন, যা প্রচলিত সমাধির লক্ষণের সঙ্গে মেলে না। সমাধির পরিপাক হলে অন্তর্মুখীনতার চরমে আসে এক প্রশমের অবস্থা, তাকে বলা হয় ব্রহ্মনির্বাণ। কিন্তু তাকে অন্তরে রেখে সেই আত্মশক্তির প্রসাদেই বিচরণ করতে হবে বাইরেও। তার লক্ষণ দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

—ইন্দ্রিয় হবে রাগদ্বেষ হতে বিযুক্ত এবং আত্মার বশীভূত। এই ইন্দ্রিয় নিয়ে পুরুষ আত্মার শাসন মেনে যদি বিষয়ে বিচরণ করেন তাহলে তিনি অধিগত করেন প্রসাদ বা প্রসন্নতা।

এইভাবেই স্থিতধী পুরুষ সহজ হয়ে যান। বাসনা-কামনার উত্তালতায় তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ, অকামহত। ইন্দ্রিয়গুলি আত্মবশ তাই তারা আত্মার

সত্যকেই বিচ্ছুরিত করছে বহির্জীবনে। এইভাবে বিচরণ করার ফলে চিত্তে নামছে প্রসাদ। তাইতে সর্বদাই তিনি প্রশান্ত এবং প্রসন্ন। তখন বুদ্ধির দ্বৈত ও সংসারের বহুত্ব তাঁর সহজ সমতাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। এই হল যোগের সম্যক্ ফল। আর, এরই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের 'অপিপাস' হওয়ার আভাসও আমরা পেয়ে যাই। এটিকেই আমরা সহজ যোগের লক্ষণ বলতে পারি। কেন না এ শুধু উপরে উঠে, সেখানে থেকে-যাওয়াই নয়, আবার নীচে নেমে এসে আত্মার শক্তিকে জীবনে বিচ্ছুরিত করা। কুরুক্ষেত্রের ঘোর কর্মে নিয়োজিত থেকেও ধর্মক্ষেত্রের সচেতনতাকে বজায় রাখা—এই হল শ্রীঅরবিন্দের সহজ যোগ।

তাহলে যোগের মুখ্য লক্ষণের মধ্যে আমরা পেলাম সাংখ্যে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি এবং গীতায় সমত্ব। কিন্তু আরও গভীরে তলিয়ে বলতে পারি যোগ বস্তুটা এক পরম আবেশ। এই লক্ষণটি বৈদিক সাধনাতে পাই। প্রাচীন বৈদিক সাধনায় জীবনকে সৌরালোকে উদ্ভাসিত, প্লাবিত করে নেওয়ার একটা সহজ পথ ছিল। সমস্ত যোগজীবন ছিল যেন এক তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের মত। ভোরের শান্ত আকাশে আলো ফুটছে। ক্রমে সে আলোয় যেন দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষ সব ঝলমলিয়ে উঠছে। এমনি ক'রে এক বৃহৎ সত্তার উদ্ভাসে এবং আবেশে সমস্ত জীবন যদি এমনভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যাতে চোখ বুজে যা পাই চোখ মেলেও তাকে সহজে বহন করে নিয়ে চলতে পারি, তবে তা-ই হবে বৈদিক যোগজীবনের আদর্শ। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা তার আভাস পাই। এই জীবনের পারিভাষিক সংজ্ঞা ছিল ব্রহ্মচর্য বা ব্রহ্মবিহার। অর্থাৎ মীন যেমন সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তেমনই এক বৃহতের মধ্যে বিচরণ করা। ব্রহ্মচর্য ছিল ঔপনিষদ যোগপন্থাগুলিরও একটা মূল স্তম্ভ। অন্তেবাসীর প্রতি আচার্যের প্রথম অনুশাসনই হল 'বস ব্রহ্মচর্যম্'—এ ছাড়া আর কোন উপদেশ নয়। তাকে একটা অতি সাধারণ

কাজ দেওয়া হল—যেমন গোচারণ। উষার আলোয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হৃদয়টি মেলে নিয়ে ব্রহ্মচারী চলেছে গোচারণে। সে দেখছে,—শান্ত প্রকৃতি ঘুম ভেঙে চোখ মেলে যেন ধীরে ধীরে নন্দিত হয়ে উঠছে—দিকচক্রবালে জগতের আত্মা সূর্যের উদয়ে। ব্রহ্মচারীর হৃদয়কমলটিও সেই পরমজ্যোতির আবেশে উদ্দীপ্ত হয়ে উন্মীলিত হচ্ছে। হৃদয়ের অন্ধকার গুহা থেকে জ্যোতির উৎসারণ—এই অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রতিচ্ছবি সূর্যোদয়ে। বাইরে যা ভূতাকাশ, অন্তরে তাই চিদাকাশ। সেখানে সূর্যের উদয় দেখাই ব্রহ্মচারীর পরম আকূতি। দেবতা তার যে-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করেন তাঁর জ্যোতি দিয়ে, তমিস্রার কুহর হতে কিরণরাজিকে দোহন ক'রে উৎসারিত করেন এক অনিবাধ বৈপুল্যে। এই জ্যোতি সবার জন্য। বাইরে জ্যোতির সর্বোত্তম প্রকাশ সূর্যে। তাই সূর্যোদয়ে সর্বভূতের মহান আত্মা যে-দেবতা, তাঁর আবির্ভাবে অন্তেবাসী সহজেই আপ্তকাম হতে পারেন। এই সহজযোগে অধিকার ছিল সত্যকামের, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি ছান্দোগ্য উপনিষদে।

মধ্যযুগের মরমীয়ারা এই সহজযোগের পথ ধরেছিলেন। তাঁরাও সহজ-সমাধির কথা বলে গেছেন। কবীরের প্রসিদ্ধ উক্তি—'আঁখ ন মূদূঁ কান ন রুধূঁ সহজ সমাধি ভালা'। চোখও বুঁজতে হবে না, কানও বন্ধ করতে হবে না, সেই সহজ সমাধিই তো ভাল। অষ্টাবক্র সংহিতাতেও এই ধরনের কথা পাওয়া যায়—

'অয়ম্ এব হি তে বন্ধো যৎ সমাধিম্ অনুতিষ্ঠসি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥'

—এই তোমার এক বন্ধন যে তুমি সমাধির অনুষ্ঠান করতে চাইছ। মন যেখানে-যেখানে যাবে, সেখানেই তো সমাধি হতে পারে।

কিন্তু এই সহজ অবস্থা লাভ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয় না কেন? তার কারণ, যে-কোনও যোগেই নিম্নপ্রকৃতিকে ছাপিয়ে উঠতেই হয়। আর,

এই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, ছাপিয়ে ওঠাটা কোনক্রমেই সহজ হয় না। তাইতে, যোগের প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ নিরোধের পথে খানিকটা চলতেই হয়। কিন্তু চিত্তবৃত্তিকে বরাবরের জন্য সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করা পূর্ণযোগের লক্ষ্য হতে পারে না। নিরোধ সেখানে অন্যতম উপায় মাত্র। আসল লক্ষ্য হল রূপান্তর। নিরোধের ফলে শক্তি জাগে, সেই শক্তি দিয়ে বৃত্তির সুষম ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটানোই যোগীর পুরুষার্থ। এইটিই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের মুখ্য লক্ষণ। তাঁর যোগে স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান থেকে পুরুষই যোগশক্তিতে নেমে আসেন জাগ্রতে। তখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে জীবনকে সুধাসিক্ত করে তোলে। এতে জীবনের কোনও প্রস্থানের সঙ্গে কোনও প্রস্থানের বিরোধ ঘটে না। তুরীয়ের প্রপঞ্চোপশমে নিত্য সমাহিত থেকে যোগী তখন জগতেও জেগে থাকেন।

(২)

প্রকৃতি-পরিণামের তিনটি পর্ব

পাশ্চাত্য মনীষীরা সমাজের প্রাক্তন কাঠামোতে খুশী নন। তাঁরা একটা সার্থকতর সমাজ গড়ে তুলতে চান, যা হবে মনস্বীর সমাজ (Society of intellectuals)। তাতে বুদ্ধিমানেরাই সমাজের কর্ণধার হবেন। আধুনিক জগতে বুদ্ধির জয়জয়কার হলেও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিবর্তনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। বুদ্ধির উর্ধ্বে রয়েছে বিজ্ঞান, যা যোগের ভিত্তি। আমাদের আদর্শ সমাজ হবে যোগীর সমাজ—বা যৌগিক উপায়ে সত্যশক্তির মুক্তি। ব্যক্তির জীবনের প্রতি পর্বে যেমন যোগশক্তির উন্মেষ ঘটবে, তেমনি সমাজের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা দিয়ে উদ্ভাসিত হবে।

এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে অবলম্বন করতে হবে "ক্রিয়াযোগ"। পতঞ্জলি বলছেন, অষ্টাঙ্গযোগের যে ফল, ক্রিয়াযোগেরও সেই ফল। অথচ ক্রিয়াযোগ অষ্টাঙ্গযোগের প্রাথমিক অনুসাশনের একদেশ মাত্র। পতঞ্জলি তাঁর অষ্টাঙ্গ-যোগে নির্বীজ সমাধিলাভের কথার পর ক্রিয়াযোগের কথা তুলেছেন। তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান হল ক্রিয়াযোগের অঙ্গ। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশগুলিকে ক্রমসূক্ষ্ম করে মিলিয়ে দিয়ে সমাধিকে প্রবর্তিত করা (সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ)—এটি যেমন অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তেমনি ক্রিয়া-যোগের দ্বারাও হতে পারে। যোগের এই পরিচয়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে পূর্ণযোগে তাকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেটা বুঝতে পারলে শ্রীঅরবিন্দের যোগবৈশিষ্ট্য কি তা ধরা সহজ হবে।

শ্রীঅরবিন্দ যোগকে একটি সার্বভৌম সাধনরূপে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যোগ চিত্তের সবভূমিতেই চলবে, এই তাঁর মত। 'নেতি নেতি' করে অপ্রাকৃত

ভূমিতে উজিয়ে গিয়ে যেমন পরম পদে পৌছতে হবে, তেমনি আবার ভাটিয়ে প্রাকৃত ভূমিতে নেমে এসে উপলব্ধ সত্যের শক্তিতে জীবনকেও রূপান্তরিত করতে হবে। জীবনের গভীরে তাকালে দেখি, প্রকৃতিতেও এই যোগ চলছে। বস্তুত প্রকৃতি মহাযোগিনী। পরম পুরুষের দিব্য ঈক্ষা, সংকল্প ও তপস্যাকে বহন করে অনন্তের পথে তিনি চিরাভিসারিণী।

সাংখ্যে ও যোগে আছে বিবিক্ত পুরুষের কথা ; প্রকৃতিতে আশ্লিষ্ট পুরুষকে মুক্ত করতে হবে। বিবিক্ত পুরুষ হবেন প্রকৃতির উপদ্রষ্টা মাত্র। তা-ই হল তাঁর স্বরূপে অবস্থান। যোগীদের প্রবর্তদশায় এটা অবশ্যকরণীয়। কেন না, অপরা প্রকৃতির কবলে সম্মূঢ় থাকলে তো যোগ হয় না। কিন্তু এটিকে চরম লক্ষ্য করে নিলে সর্বনাশ। তখন মহাপ্রকৃতি থেকে যোগজীবন বিযুক্ত হয়ে পড়ে। দুঃখের নিবৃত্তি চাই এবং তার জন্য গুহাহিত হতে হবে—এসবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু জীবনের দুঃখের জন্য আমরা প্রকৃতিকেই শুধু দায়ী করি। এতে প্রকৃতির অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। প্রকৃতি যে শুধু দুঃখের কারণ তা নয়, দুঃখ মোচনের কারণও তিনি। আগেরটিকে যদি বলি অপরা প্রকৃতি, তাহলে পরেরটিকে বলব পরমা প্রকৃতি। সাংখ্য শুধু আগেরটিকে গ্রহণ করেছে—পরেরটিকে নয়। সাংখ্যের এই দৃষ্টির সংশোধন আছে গীতায়। ভগবান বলেছেন, সব প্রকৃতিই তাঁর। যেমন আছে তাঁর অপরা প্রকৃতি—যা নাকি সাংখ্যসম্মত অষ্টধা প্রকৃতি, তেমনি আছে তাঁর পরা প্রকৃতি—"যয়েদং ধার্যতে জগৎ"। তার পরেও আবার তিনি বলেছেন তাঁর স্বীয়া বা পরমা প্রকৃতির কথা, যিনি তাঁর লোকাতত ও লোকাতীত চেতনায় নিত্যযুক্তা। একই প্রকৃতি, শুধু অভিব্যক্তির তারতম্য বোঝাতে তাকে বলা হচ্ছে অপরা, পরা ও পরমা। সাংখ্যযোগে অপরা থেকে বিবিক্ত হয়ে নিরোধে যাবার কথাই বলা হয়েছে। এতে অহং থেকে মুক্তি ঘটে, আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই নিম্ন প্রকৃতির বন্ধন খসলেই পুরুষের

মুক্তি ঘটে পরা প্রকৃতিতে, যা জীবভূতা সনাতনী—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় Psychic Being বা চৈত্যসত্তা। জীবের এই চৈত্যসত্তা স্বভাবতই পুরুষে প্রপন্না এবং যোগযুক্তা। আমাদের মধ্যে তিনিই সাধনা করে চলেছেন। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃতির একদিকেই যত বিড়ম্বনা। অন্যদিকে, এই অষ্টধা প্রকৃতির মধ্যেই "শুদ্ধ আমি"র বিকাশ হচ্ছে, পরম-পুরুষের সঙ্গে যার মধুর সম্পর্ক। এইখানে সাংখ্যের জ্ঞানের সঙ্গে মেলে গীতার ভক্তি। ভক্তিপথের সাধকেরা জীবনকে পুরাপুরিই স্বীকার করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবানের সংস্পর্শে জীবন দিব্য হয়ে ওঠে। সেখানেও জীবন ও যোগ যে একাত্মক—এই ভাবনার আমরা উদ্দেশ পাই।

একদিকে যেমন ব্যবহারে সমত্ব আশ্রয়ের ফলে অপরা প্রকৃতি থেকে সাধকের মুক্তি ঘটবে, তেমনি তার সঙ্গে-সঙ্গেই পরা প্রকৃতির প্রপত্তি ও শরণাগতি থেকে জীবনে আসবে রসের জোগান—এটাই শ্রীঅরবিন্দের আত্ম-সমর্পণ যোগের (Self-surrender) মূল কথা। এ-জীবন তাঁরই, তাঁতেই উৎসৃষ্ট—এ-ভাবে সমর্পিত হয়ে চলা শুরু হয় পরাপ্রকৃতি উদ্বুদ্ধ হলে; তাইতে অপরা প্রকৃতিও পরিশুদ্ধ হয়। 'সাধকের আধারে তখন ঝলকে-ঝলকে যোগ-মায়ারূপিনী তাঁর স্বীয়া বা পরমা প্রকৃতির শক্তিপাত হতে থাকবে। এটাই যোগসিদ্ধি। পরমার আবেশ, পরার উন্মেষ আর অপরার রূপান্তর—এই তিনের সমন্বয়ে আরুরুক্ষু যোগী পুরুষ ক্রমে যোগের পরম ভূমিতে আরূঢ় হন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, সাংখ্যের বিবেক দিয়ে অপরা প্রকৃতিকে প্রথম প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। কিন্তু পরে পরা ও পরমার শক্তিতে তার রূপান্তর ঘটে যায়। তখন একে বলতে পারি সর্বাঙ্গীণ যোগ। এই যোগে পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত নন—বরং তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত। পুরুষ-প্রকৃতির এই যুগনদ্ধতাই তন্ত্রে শিব-শক্তির সামরস্য। তাকে লাভ করা পূর্ণযোগের প্রাথমিক লক্ষ্য। তার পরিপাকে সমস্ত জীবনে সেই শিব-শক্তির অদ্বৈতবোধনিবিড় সামর্থ্যের

প্রকাশ ঘটবে। তখন জীবনে আর যোগে, প্রকৃতিতে আর পুরুষে কোনও ভেদ বা বিরোধ থাকবে না। তখনই আমরা বলতে পারব All life is yoga.

*　　　*　　　*

সমস্ত জীবনই যে যোগ—এ শুধু আরুরুক্ষু যোগীর পক্ষেই নয়, সর্বসাধারণের পক্ষেও সত্য। বস্তুত যোগের মূলে রয়েছে স্বোত্তরণের (self-exceeding) একটা প্রবেগ। এই প্রবেগ আছে জীবনেরও মূলে। বৃহৎ হবার এক দুর্বার আকৃতি সবার মধ্যেই আছে। বাইরে তার সার্থকতায় আমরা পাই অভ্যুদয়ের আদর্শ কিন্তু তাই জীবনের সবখানি নয়। আমরা যথার্থ বৃহৎ হতে পারি অন্তরেই। তাই নিঃশ্রেয়স, তা-ই পরম পুরুষার্থ। এই নিঃশ্রেয়সের রূপ হল আত্মচৈতন্যের ব্রহ্মচৈতন্যে বিস্ফারণ। বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে যে অগ্নি তাপ রূপে রয়েছেন, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে জ্যোতিরূপে; এবং সেই জ্যোতি এক হয়ে যাবে দ্যুলোকের অগ্নি আদিত্যের সঙ্গে। তখন যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।' আমার এই বৃহৎ হওয়াই আত্মার ব্রহ্ম হওয়া। আদিত্যের আলো, বৃহতের আবেশ—এ যদি সহজ হয়েই পাওয়া যায়, তাহলে নিরোধের কথা ওঠে না। নিরোধের ফলে যে-আত্মপ্রতিষ্ঠা, তা আবেশের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু যোগজীবনে নিরোধেরও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। অবশ্য নিরোধ, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য নয়, সাধনাঙ্গ মাত্র। বাইরের আকাশে সহজ আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম, এই হল সাধনার একটা দিক। আবার সেই আকাশকে গুটিয়ে আনলাম হৃদয়ের আকাশে, এও সাধনার আরেকটা দিক। এই হল নিরোধের বা গুহাহিত হবার রীতি। যোগজীবনে একেও একটা স্থান দিতে হবে। অহোরাত্রের মধ্যে একটা সময় এবং সংবৎসরেরও কিছুটা সময় একেবারে সবকিছু থেকে বিবিক্ত হয়ে নিজের মধ্যে

ডুবে যেতে হবে। কবির ভাষায় একে তখন বলতে পারি—তাঁর "ছুটির নিমন্ত্রণ" বা আমাদের Spirtual holiday। চব্বিশ ঘণ্টার অন্তত একটা ঘণ্টাও চাই, যখন চিত্ত সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাবে, সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে একেবারে অনন্তের মধ্যে তলিয়ে যাবে। এমনি করে তাঁর মুখোমুখি হওয়া—এও Hour of God, তাঁর সঙ্গে আমার মিলনের পরম লগ্ন। এরই আকৃতি দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে অন্তরে বহন করে চলতে হবে। আমরা সব সময় কিছু কাজ করতে পারি না। অন্তত ঘুমের মধ্যেও কিছুটা বিশ্রাম চাই। এই হল প্রকৃতিতে নিরোধের স্বাভাবিক ছন্দ—কর্মে ও বিশ্রামে, জাগ্রতে ও নিদ্রায়। এই নিরোধের সময়টাকে যদি Hour of God-এ পরিণত করতে পারি, তার মধ্যে তলিয়ে যেতে পারি একেবারে শেষ পর্যন্ত, তাহলে চিত্তের অতল থেকে যোগশক্তিও সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সার্থক করে তুলতে পারে।

এই সত্যকে রূপ দিতে হলে ধৃতিশক্তিতে উজ্জ্বল রাখতে হবে। Hour of God এ তাঁর সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক, তার স্মৃতিকে বহন করে চলতে হবে। তবেই বহির্জীবনেও সহজ হতে পারা যাবে। এরই ইঙ্গিত পাই গীতায় ভগবানের এই উক্তিতে: 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—তাইতে সর্বকালে আমার অনুস্মরণ কর, আর যুদ্ধও কর। ধর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের সব ক্ষেত্রে এই অনুস্মৃতিকে যেমন বহন করে চলতে হবে, তেমনি করতে হবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও। 'বিদ্বান্' এর কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি 'যোষয়েৎ সর্বকর্মাণি' অর্থাৎ সার্থক যোগীর জীবন সবার সব কর্মই রস যুগিয়ে চলবে। এইভাবে থাকতে পারলেই তাঁর ভিতর দিয়ে ভাগবত শক্তির একটা সহজ বিচ্ছুরণ ঘটবে এবং সর্বভূতে তা সংক্রামিত হবে। এই আত্ম-বিচ্ছুরণ প্রকৃতিতেও দেখতে পাচ্ছি—যেমন অগ্নির তাপে, সূর্যের তেজে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমরা প্রত্যেকেই পরমা শক্তির দ্বারা আবিষ্ট এমনিতর একটা শক্তিকূট, (dynamo)। এইভাবে নিজেকে জানাই সত্যকার

আত্মসচেতনতা। একে অপরার বিপাক হতে মুক্ত করে পরমার আবেশে উজ্জ্বল রাখতে হবে। তা-ই ব্যষ্টিজীবনের পুরুষার্থ।

ক্রমশ আত্মসচেতনতাকে বাড়িয়ে তোলা যদি যোগের প্রধান লক্ষণ বলে ধরি, তাহলে দেখতে পাব, সমষ্টি প্রকৃতিতেও একটা যোগের ক্রিয়া চলছে। জড়প্রকৃতিতে প্রাণ ও চেতনার উন্মেষ হল প্রকৃতিপরিণামের তাৎপর্য। জড়ের অন্ধ-তমিস্রায় প্রাণ ও চেতনা সুপ্ত রয়েছে। এই অবস্থাকে বেদের ভাষায় বলা যায় 'নির্ঋতি' অর্থাৎ যেখানে আপাতদৃষ্টিতে ঋতচ্ছন্দের কোন নিশানাই নেই। আধুনিক বিজ্ঞানে এটাকেই বলে running down of matter—যার ফলে জড়ের মধ্যে এলোমেলো ভাবটা বেড়েই চলে। কিন্তু Schrödinger দেখিয়েছেন, এরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণের ক্রিয়া একটা ঋতচ্ছন্দ সৃষ্টি করে চলেছে। তাকে বলা যেতে পারে runing up of matter এমনি করে জড়কে উপাদান ও প্রাণকে নিমিত্ত করে ঋতায়নী প্রকৃতির একটা ছন্দোলীলা নেপথ্যে চলছেই। এমন কি এও দেখা যায়, অণুপরমাণু ও সৌরজগতের ছাঁদে গড়া। এই ছাঁদ ঋতেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং প্রকৃতির সর্বত্র নির্ঋতিকে ঋতে আনার প্রয়াসে চলছে একটা সংহনন (organisation)-সৃষ্টির তপস্যা। এও এক দুর্লক্ষ্য প্রাণ ও চেতনার ক্রিয়া।

এমনি করে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে জড় অণু-পরমাণুর লীলায়ন। তারপর তার মধ্যে প্রাণের উন্মেষ এবং চেতনার বিকাশে সবার শেষে মানবের আবির্ভাব, মনোধর্ম যার বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিপরিণামের এই তিনটি পর্বকে যথাক্রমে দেহ, প্রাণ ও মন সংজ্ঞা দেওয়া যায়। প্রাণ ও চেতনাকে আমরা একই ধর্মের এপিঠ-ওপিঠ মনে করি—কেননা যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চেতনা আছে, যেখানে চেতনা আছে সেখানে প্রাণও আছে। তবে কিনা, চেতনার প্রকাশের তারতম্য আছে। সর্বত্র প্রাণময় হলেও উদ্ভিদে চেতনা আচ্ছন্ন, পশুতে অস্পষ্ট, মানুষে স্পষ্ট। এই তারতম্যের

ভাবটি মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে যথাক্রমে তার দেহে, প্রাণে ও মনে। যোগের ক্রিয়া এই তিনটি পর্বের ভিতর দিয়ে চলছে, কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠছে মনেই। যোগ আত্মসচেতন মনের ধর্ম। তাইতে যোগচেতনা আদিপর্বে নেপথ্যচারী, মধ্যপর্বে সংঘর্ষে সঙ্কুল, কেবল অন্তপর্বেই স্পষ্ট।

প্রাণ একটি বিশেষ তত্ত্ব। যোগসাধনা সচেতনভাবে শুরু হয় এই প্রাণলোকে। এটি বেদের ভাষায় অন্তরিক্ষ, যেখানে আলো-আঁধারির দ্বন্দ্ব। যত সাধনসমর, সবই এই মধ্যপর্বে, প্রাণের ওঠা-নামার দোলায়। আদিপর্বে জড়শক্তি বা তমোগুণের প্রাধান্য। ব্যষ্টিজীবনে দেখতে পাওয়া যায়, আমরা অসাড়, আমাদের প্রকৃতিও আচ্ছন্ন। চেতনা দেহাশ্রিত বা দেহসর্বস্ব। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক এই দেহে, এই জড়ের উপাদানেই জাগে প্রাণচৈতন্য। জড়ের কুমেরুতে যদি জড়কেই শুধু দেখি, মনে হয় আয়তনে সেটাই সর্বাধিক; প্রাণ ও চেতনাকে যেন সে গ্রাস করে রেখেছে। কিন্তু এই জড়ের আধারেই তো জাগছে প্রাণচৈতন্য। স্তূপাকার ইন্ধনে একটিমাত্র অগ্নিকণার সংযোগের মত এই প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলাই তো ঐ মূঢ় মূক জড়প্রকৃতির উদ্দেশ্য। যোগের উদ্দেশ্যও তাই। মনে পড়ে, প্রশ্নোপনিষদের প্রশ্ন, 'সব ঘুমিয়ে পড়লে কে জেগে থাকে?' তার উত্তর, 'প্রাণাগ্নয়ো জাগ্রতি অস্মিন্ পুরে',— এই দেহপুরে প্রাণের আগুনরাই জেগে থাকে। আদিপর্বের লক্ষ্য হচ্ছে, এই প্রাণের উন্মেষ ঘটানো। জড়প্রকৃতির সার্থকতাও তাতেই। কোটি-কোটি বর্ষ ধরে যে ভূমি বন্ধ্যা হয়েছিল, তাকে স্ফুরিত করে সে পুরুষের উন্মীলন ঘটায়। এরই উদাহরণ দেখি বেদে অশ্বিদ্বয়ের ভাবনায়, তন্ত্রের শক্তিপূজার বোধনে, সপ্তশতীর দেবীমাহাত্ম্যে।

মধ্যরাত্রের নেপথ্য থেকে অন্ধকারের বুক চিরে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান শুরু হয়। আলোর রশ্মি ছুটে আসে গভীর অন্ধকার বা একার্ণবীকৃত অব্যক্তের মধ্য দিয়ে। ঊষার আলো ফুটবে, তার অনেক দেরী। এটি তার প্রস্তুতির

পর্ব মাত্র। নেপথ্যের ওই আলো পুরোভাগে এলে হয় বোধন, যেমন উষার আবির্ভাবে আদিত্যদ্যুতির সূচনা। দুর্গাপূজায় দেবীর বোধনও ষষ্ঠীতিথিতে, আগের পাঁচটি তিথি পার হয়ে। এই পাঁচদিন দেবীর আবির্ভাবের প্রস্তুতি চলে নেপথ্যে, দেবী তখন মহাকালী। তমিস্রায় কুণ্ডলিতা যোগমায়া প্রসন্না না হলে জগৎপতি যোগনিদ্রার আবেশে গুটিয়েই থাকেন। তিনি জাগলেই বোধন এবং তাইতে অধ্যাত্মজীবনেরও সূত্রপাত। তারপরেই দেবীর শক্তিরূপে আবির্ভাব। তখন দেখতে পাই প্রবল অপশক্তির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ। তিনি তখন মধুপানোন্মত্তা মহিষাসুরমর্দিনী মহালক্ষ্মী, বোধনের পর তিনদিন ধরে আমরা যাঁর পূজা করি। বোধন হতে পঞ্চম দিনে বিজয়া, এটি বেদের সোমযাগেরও সুত্যাদিবস। দেবী তখন অপরাজিতা। তারপর দ্যুলোক হতে অন্তরিক্ষের প্রাণলোকে তাঁর আবির্ভাব বা শক্তিপাত। সাধনা তখন উত্তীর্ণ হয় প্রাণ থেকে মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে। এখান থেকেই প্রজ্ঞার সাধনা ও ধীযোগের শুরু, যার লক্ষ্য অতিষ্ঠার (Transcendence) সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত থাকা। জড় যদি হয়ে থাকে অস্তিত্বের কুমেরু, তাহলে অতিষ্ঠা তার সুমেরু। এটি স্বপ্রকাশ। মানুষের মধ্যে মনের বিকাশে এরই উজ্জ্বল আবির্ভাবের সূচনা।

মনের চোখ দিয়ে দেখা ও বোঝা মানুষের অভিনব এক বৈশিষ্ট্য, যা তাকে ইতর প্রাণিজগৎ থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। সাধারণ প্রাণীর মত সেও ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় আহরণ করে; কিন্তু ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে সুস্পষ্টভাবে সে মননও করতে পারে স্মৃতি ও কল্পনার সহায়ে—যা পশু পারে না। মানুষের পক্ষে এমনি করে সামান্যপ্রত্যয়ের সাহায্যে ভাবনা (conceptual thinking) যে সম্ভব হয়েছে, তা প্রকৃতির ক্রমবিকাশের একটি সার্থক পর্ব। তারও পরে মানুষের মধ্যে এসেছে আত্মসচেতনতা। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা হল ব্যবসায়। সাধারণত মনন চলে একেই আশ্রয় করে। কিন্তু তারও পরে 'কে দেখছে'? এই বোধে

দ্রষ্টাকে দেখা হল অধ্যবসায়। তখন বাইরের জগৎদর্শন পরাবর্তিত হয় আত্মদর্শনে। এবং তাইতে অন্তরাবৃত্তি ও আত্মসচেতনায় যোগভূমির শুরু।

উপনিষদে এই ভূমিকে বিজ্ঞানভূমি বলা হয়। দেহ, প্রাণ ও মনের পরে এই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পর আনন্দ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি প্রাকৃত ও পরের দুটি ভূমি যথার্থ যোগভূমি। পাশ্চাত্য নবসমাজ গঠনের চেষ্টা আগের তিনটি ভূমি নিয়েই, শেষের দুটি ভূমি নিয়ে নয়। উপনিষদ-বর্ণিত বিজ্ঞানও আনন্দের সিদ্ধ রূপ এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যোগের লক্ষ্যই হল বিজ্ঞান ও আনন্দকে অধিগত করে তাদের আলো ও শক্তিতে জীবনকে সমৃদ্ধ করা। পতঞ্জলিও চিত্তের পাঁচটি ভূমির কথা বলেছেন—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, তারপর একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি যথাক্রমে প্রাকৃত দেহ, প্রাণ ও মনের আশ্রিত। পতঞ্জলির একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিই উপনিষদের বিজ্ঞান বা স্বপ্ন এবং আনন্দ বা সুষুপ্তির ভূমি। যোগের প্রারম্ভে এগুলিকে ভাল করে চিনে নিতে হয়। মূঢ় চিত্ত নিশ্চেষ্ট ও তামসিক, ক্ষিপ্ত চিত্ত চঞ্চল ও রাজসিক এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত সাত্ত্বিক হলেও তা শুদ্ধ নয়, তাতে মূঢ়তা ও ক্ষিপ্ততার মিশ্রণ আছে। তবু তাতে লক্ষ্য অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে—যদিও যোগের প্রয়াস তখনও স্থায়ী হচ্ছে না, আত্ম-সচেতনতাও উজ্জ্বল নয়। অতএব যোগও তখন সর্বাঙ্গীণ নয়, কেননা তখন পর্যন্ত একাগ্রতার আলম্বন অনেকটা বাইরেই থেকে যাচ্ছে। চিত্ত সমাধিস্থ হতে পারে যদি নিজের গভীরে বা আত্মবোধে সমাবিষ্ট হয়। কিন্তু সমাধিস্থ থাকাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। একাগ্র ও নিরোধ ভূমির সমাধিজ প্রত্যয়কে আবার নামিয়ে আনতে হবে এবং সঞ্চারিত করতে হবে নীচের তিনটি ভূমিতে—মনে, প্রাণে ও দেহে। তবেই বিজ্ঞানানন্দময় পুরুষের জাগ্রত সমাধি নিয়ে সহজভাবে বিচরণ করতে কোন বাধা হবে না। এবম্বিধতর সম্যক্ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে পর বুঝতে পারব,—All life is yoga কথাটির ব্যঞ্জনা কত গভীর!

৩

পূর্ণযোগ

ঈশোপনিষদ বলছেন, "জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ", এবং তা 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি'—কর্ম করতে-করতেই একশ বছর বেঁচে থাকবার সঙ্কল্প করবে। এই হচ্ছে প্রাণের তাগিদ। জিজীবিষা হল will to live বা শতায়ু হয়ে 'দেবহিত আয়ু'কে সম্ভোগ করা। কিন্তু এই অনুশাসনের মধ্যে শুনতে পাই বিজর বিমৃত্যু আদিত্যরূপী প্রাণের প্রচোদনা; নিজের ভিতর থেকে এক প্রচণ্ড সঙ্কল্পের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের বাঁচার মত বাঁচতে হবে একশ বছর: দেহের জরা ও প্রাণের অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের মনোজ্যোতি যেন প্রজ্বল থাকে শেষ পর্যন্ত। এবং এরই জন্য প্রাণকে হতে হবে প্রজ্ঞাশাসিত। সমস্ত জীবনকে যোগ করে তুলতে হলে ওই প্রবল জিজীবিষাকে সার্থক করতে হবে ঈশের ঈশনায় ও প্রসাদে তাকে প্রবুদ্ধ করে। কেননা, অপ্রবুদ্ধ জিজীবিষার অপরিহার্য অঙ্গ কামাহত চিত্তের জ্বালা। তাইতে যোগজীবনের প্রগতিতে একদিকে যেমন থাকবে প্রাণের তাগিদে এগিয়ে চলার প্রবল প্রবেগ, অপরদিকে তেমনিই থাকবে প্রজ্ঞার প্রেরণায় অপ্রতিবোধের অপসারণ। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণের যুগ্ম যোগশক্তিই আত্মবোধের উল্লাসে বীর্যবত্তর হয়ে উঠবে সাধকের আধারে, দেহে প্রাণে মনে, এবং সব ছাপিয়ে বিজ্ঞানে ও আনন্দে।

*

সংসারে মানুষের সাধারণ জীবন পশুজীবনেরই উচ্ছিষ্ট গতানুগতিক এক জড় জীবন। বাইরে থেকে প্রকৃতিকে দেখতে গেলে মনে হয় তার সমস্তটাই যেন এক জড়পিণ্ড। কিন্তু তাতেই আবার প্রাণ জাগলে সে-ই জড়কে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার মন জেগে প্রাণকে সমৃদ্ধ করে এবং মন-প্রাণ মিলে আনে

অভ্যুদয়। কিন্তু এতেও প্রগতির তো শেষ হয় না। এরও পরে মনের ওপার থেকে ডাক আসে নিঃশ্রেয়সের। অন্নদামঙ্গলের কবি দেবীকে ঈশ্বরী পাটনীর নায়ে বসিয়ে তাকে তাঁর স্বরূপ দেখিয়েও তার চাওয়াকে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এর বেশী উজিয়ে নিতে পারেন নি। এই দুধে-ভাতে তুষ্ট থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃত জীবনের অপরিহার্য প্রথম পর্ব। কিন্তু মানুষ পশুই তো নয়, প্রাণের পরেও তার মন আছে, আছে বুদ্ধি। তাই নিয়ে সে চিন্তা করে, আর এগিয়ে চলতে চায়। এই প্রগতির আকাঙ্ক্ষা হতেই মনোময় জীবনের শুরু। মন উজ্জ্বল ও সমর্থ হলে অন্নগত প্রাণের পরিতর্পণেই মানুষ তুষ্ট হয় না। অজানার ডাক শুনে সে আরও এগিয়ে চলতে চায়; তার প্রাণ বলে—'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে'। এই স্বোত্তরণের তাগিদেই অধ্যাত্মজীবনের সূচনা। আত্মবোধের গভীরে তলিয়ে সে নিজেকে বুঝতে চায় বলে জিজ্ঞাসু হয়, আর উর্ধ্বতন রহস্যের হাতছানিতে আলোর আভাস পেয়ে নিজের আত্মপরতার গণ্ডি কেটে বেরিয়ে পড়তে চায়। এই অধ্যাত্ম-পিপাসা মানুষের মধ্যে যে কবে থেকে জেগেছে, কালের হিসাবে তা নির্ণয় করা যায় না। তাই চলার পথে ভুক্ত জীবনকে পরিপাক করে করে সে কেবলই পথে ভাসে আর বলে "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এমনি করে দেখতে পাই জড়াশ্রিত জীবন আর মনোময় জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের এক ওতপ্রোত সম্পর্ক। সমস্ত মানুষের মধ্যেই ধর্মবোধের একটা উন্মেষ গোড়ায় দেখা দেয়। ধর্মবোধ ও তা থেকে একটা নীতিবোধ—কোন না কোন রকমে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে। এটা তাকে মন্দির মসজিদ, গির্জা পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রাণের একটা গতানুগতিক এবং দায়সারা গোছের ভাব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দেখি দ্বিজের সাবিত্রী দীক্ষাও এখন একটা সমাজগত অনুষ্ঠানমাত্র হয়ে পড়েছে। তাইতে

বেদমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েও সেটাকে সমর্থ আর জীবনে কার্যকরী করার দায়িত্ব যেন কেউ বোধও করে না। সমাজের অনুশাসনে বৈদিক দীক্ষার পর তাই আবার তান্ত্রিক দীক্ষার প্রয়োজন হয়। সাবিত্রী দীক্ষায় যদি আধারের সবটাই উত্তম অধিকারীর মত প্রাণের আগুনে জলে উঠত, তাহলে আবার নতুন করে দীক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু সমাজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সায় দিয়ে চলতে হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমষ্টির ধর্মবোধকে স্বীকৃতি দিতে হয়। এতে প্রাণের পিপাসা মিটল না, অথচ প্রবুদ্ধ অগ্নি স্তিমিত হয়ে পড়ল, এমন একটা নির্বেদ কারও কারও মধ্যে আবার দেখা দেয় অধ্যাত্মপিপাসা জাগলে পর। তখন মহাপুরুষ সংশ্রবের প্রয়োজন হয়। দীক্ষা নিয়ে সাধক আবার তার সঙ্কল্পকে পরিশুদ্ধ করে নতুন করে। প্রাণের আগুনে বীর্য সঞ্চারিত হয়, আলোর দিগন্ত আবার উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে সামনে।

কিন্তু সবার মধ্যে এ-বোধ তো জাগে না। দীক্ষার প্রেষণায় যোগ জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হল, সমাজে সর্বজনীন কর্মরূপে তা স্বীকৃতিও পেল। কিন্তু মন বুদ্ধির সায় না পেলে প্রাণ এতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অধ্যাত্মবিদ্যার যা রহস্য বা উপনিষদ, তাকে অধিগত করতে শ্রদ্ধার উন্মেষ যেমন প্রয়োজন, জীবনে তার প্রয়োগবিধিতে কুশল হওয়াও ঠিক তেমনিই প্রয়োজন। এ যুগে মনের যে শিক্ষা তাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত হয়ে মনোময় জীবনে বিদ্যার বহুমুখী চর্চা ও প্রসার হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা ও দার্শনিক অন্বীক্ষা দিয়ে এক আঁটসাঁট যুক্তিবাদকে সহায় করে মানুষ জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছে। অন্তরে, বাইরে তাকে ব্যবহারে ফলিতও করছে বিচিত্র উপায়ে। নানা দিক দিয়ে নব-নব আবিষ্করণ সম্ভোগের উপকরণ জড় করে ঐহিক জীবনকে ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছে। তাতে জীবন যথেষ্ট কৃত্রিম ও জটিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আত্মা না জাগলে প্রাণ তো ভরতে পারে না জড়ের এই উপকরণ বাহুল্যে। শতরূপা মনঃশক্তির এই মোহিনী মায়াকে সামলানোও

মনের এক বিরাট ঝামেলা হয়ে পড়েছে। বর্তমান সভ্যতার এই ভয়াবহ দিকটি মনস্বীদেরও ভাবিত করে তুলেছে। এদের সাধনা যে অভ্যুদয়ের, তাতে সন্দেহ নাই। জগতের এই যজ্ঞসভায় বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী, কবি, মনীষী সকলেই আমন্ত্রিত, কেবল যোগী আজও অনাহূত। তাঁদের কোনও আসন নেই, যজ্ঞভাগ নেই। বর্তমান মনীষা আজ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা অনুভব করে না। কিন্তু এই অভ্যুদয়কে পূর্ণাঙ্গ করবে যে নিঃশ্রেয়স—যার বাড়া শ্রেয় আর নেই,—তাকে বাদ দিলে কোনও শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রাচীন ভারতের আর্যবিদ্যায় কিন্তু অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্রেয়সও ভালভাবেই অনুশীলিত। ঔপনিষদ বিজ্ঞানের সাধনায় দেহ প্রাণ মনের প্রতি উপেক্ষার ভাব আসতে পারে ভেবে আমরা আবার এ যুগে নিঃশ্রেয়সের আকর্ষণকে ভয় করতে শিখেছি। ধারণা করে বসে আছি অধ্যাত্মসাধনা বুঝি এক রিক্ততার, শূন্যতার সাধনা। তা কিন্তু সত্য নয়। আজ বিজ্ঞানের যুগে অভ্যুদয়ের সাধনা প্রবল ও উদ্দাম। একে শাসনে আনতে মনের চাইতে উন্নততর একটা তত্ত্বের একান্ত প্রয়োজন। সে হল বিজ্ঞান ও আনন্দের তত্ত্ব। জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সাধনাকে যুক্ত না করলে অযোগী চিত্তের ব্যভিচার জীবনের সব কিছু শ্রেয়কে নষ্ট করে দেয়। নিঃশ্রেয়স জীবনকে পঙ্গু না করে সমৃদ্ধতর করতে পারে, এটাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের একটি মূল তত্ত্ব।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই দুইকেই একটি বৃহৎ সত্যে উত্তীর্ণ করতে হবে। পাশ্চাত্য ভাবনার সজ্ঞাতে আমাদের যেমন মন জেগেছে, তেমনি তাতে নানা বিক্ষোভও দেখা দিয়েছে। ফলে আমরা জীবনের সব সমস্যাকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাই। একে কিন্তু মন্দ বলতে পারি না। জীবন থেকে সরে যাওয়াই অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ, আমাদের জীবনদর্শনের এই গলদকে দূর করতে হবে। সব দেশে সব ধর্মেই এই

ধরণের ইহবিমুখীনতা আছে, এবং তা থেকেই অধ্যাত্মসাধনায় সন্ন্যাসবাদের প্রসার। সব ছেড়েই সবকে একান্ত করে পেতে হয়, একথা সত্য। কিন্তু সেই লোকোত্তরকে জীবনধর্মে অনুস্যূত করতে আবার এখানে ফিরেও আসতে হয়, তা না হলে সিদ্ধি পূর্ণ হয় না। আমাদের সাধনশাস্ত্রগুলিতে এ দিকটা যেন তত ভাল করে চিন্তা করা হয় নি। ইহ ও পরব্রহ্মকে নিয়ে অপক্ষপাতী মননের দ্বারা অখণ্ড জীবন দর্শনের একটা আদর্শ সবারই সামনে রাখা দরকার। এই অখণ্ড জীবনের নায়ক হবে মনের উর্ধ্বতন সত্য। নিম্নতত্ত্বকে থাকতে হবে লোকোত্তরের প্রশাসনে, তবেই এইখানে তার সার্থকতা—সমষ্টির কল্যাণে এবং ইহজীবনেই।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিত্তে পূর্ণ সমস্ত পৃথিবী পেলে আমি কি অমৃত হব?' বস্তুত অমৃতপিপাসাই মানুষকে আকর্ষণ করে নিঃশ্রেয়সের দিকে। সব কিছু চাওয়া ও পাওয়ার পরিপূর্ণতাও এইখানে। মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—বিত্তের দ্বারা অমৃত লাভের আশা নেই। জীবনে যারা উপকরণ জড় করে, তাদের জীবন যেমন তোমার জীবনও তাই হবে, তুমি অমৃতা হবে না।' তাই শুনে মৈত্রেয়ীর সেই প্রসিদ্ধ উক্তি যাতে ভারতাত্মার চিরন্তন ঘোষণা শুনতে পাই—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম?' যা দ্বারা আমি অমৃত হব না তা নিয়ে আমি কি করব? এই উদাত্ত জিজ্ঞাসা যখন জীবনকে মথিত করে ব্যাকুলভাবে বেরিয়ে আসে, তখনই উর্ধ্বলোকের অভীপ্সায় শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। এটাই যথার্থ দ্বিজত্ব—যেমন দেখেছি কঠোপনিষদে নচিকেতার বেলায়। উপনিষদ বলছেন শ্রেয় ও প্রেয় দুইই মানুষের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু যিনি প্রেয় হতে শ্রেয়কে বেছে নিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান ও ধীর। তিনি সম্যক আলোচনা করে দুটিকে পৃথক করে দেখতে পারেন। কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি প্রেয়কেই শুধু বরণ করেন যোগক্ষেমের টানে। নচিকেতা

একেবারেই শ্রেয়কে বরণ করেছিলেন ; তাই তিনি যমের কাছে বর পেয়েও শ্রেয়কে অপিহিত করে যে প্রেয়ের সুখ, তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'ন বিত্তেন তপণীয়ো মনুষ্যঃ' শুধু বিত্তের দ্বারা মানুষের কামনার তর্পণ হতে পারে না। এই অতৃপ্তির বোধ মানুষের মধ্যে জাগলে পর তার আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে যায় ; উর্ধ্বলোকের এষণার যেন একটি রশ্মিপাত হয়। তখন নিজের লুব্ধতার ক্ষুদ্রতার গণ্ডির বাইরে আসার জন্ত তার মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বৃহতের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এটাই অধ্যাত্মজীবনের মূল সুর। অনশ্চক্ষু না খুললে একে ঠিক বোঝা যায় না। কেননা প্রকৃতিপরিণামের নিয়মে এটা ধরা দেয় না। বস্তুত এ যেন এক আবির্ভাব—উষার আলোর মত। অভ্যুদয়কে যদি বলি প্রকৃতির ধারা, এই আবির্ভাবকে বলতে পারি পুরুষের প্রতিবোধ, যার পরিণাম হল স্বারাজ্যসিদ্ধি।

পাশ্চাত্যদেশে দু'হাজার বছর আগে খৃষ্টের অমৃতবাণী শোনা গিয়েছিল,—'My father in heaven and I are one'—তমসার পরপারে সেই যে পরমপিতা, তিনি আর আমি এক। কিন্তু তারপর এতদিনে ওদেশে আর একটি পুরুষের কণ্ঠে এ ঘোষণা শোনা গেল না। অথচ আজ ওরা সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করে সবদিকে অভ্যুদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবী সে-অভ্যুদয়কে গ্রহণও করেছে। কিন্তু কোথায় সেই মহান্ত পুরুষ—নিঃশ্রেয়সকে যিনি জীবনে সত্য করে তুলবেন ? অথচ এদেশে আমরা কখনও তাঁর অভাব অনুভব করি নি। এই আমাদের মহনীয় উত্তরাধিকার ও পরম সুকৃতি। মহাপুরুষের আবির্ভাবে মহাপ্রাণের ডাক এসে আঘাত করেছে প্রাণসাগরের কূলে। তাতে অকূলের টান প্রবল হওয়ায় আমরা কুলধর্ম খুইয়েও ফেলেছি অনেক সময়। তার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ জীবনে অবক্ষয় এসেছে,—এখন যেমন অবস্থা। এতে অমৃতপিপাসাও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবুও অমৃতের সেই পরম লগ্নটি ঘুরে ফিরে দ্বারে এসে আঘাত করে—কখনও

মধুর মিনতি ভরা পঞ্চম স্বরে, কখনও বা ঋষভের বজ্রনির্ঘোষে—'এই যে, প্রস্তুত!'

আত্মজাগরণের পথে বাধা অনেক। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনায় লোকোত্তরকে জানতে ও পেতে জীবনের সব কিছু ছাপিয়ে যেতে হয়, কিন্তু সেই সত্যকে লোকাতত ও লোকায়ত জেনে ও বুঝে তা সার্থক করে না তোলা পর্যন্ত সে বিজ্ঞানের সাধনাও হয় বন্ধ্যা। ব্যষ্টির অনুভবকে সমষ্টির প্রত্যয়ে আনতে হবে। প্রাকৃত জীবনের মূলেও কাজ করছে যোগশক্তিই। সে-শক্তিই জীবনের মূল্য ছাপিয়ে মৃত্যুবিজ্ঞানের রহস্যদ্বারে এনে সাধককে উপনীত করে। কিন্তু সেখানেও হারিয়ে গেলে চলবে না। মৃত্যুকে জেনে তার আঁধারকে যেমন পার হতে হবে, তেমনই ভাঙতে হবে তার আলোর আড়ালকে। কঠোপনিষদে নচিকেতা বৈবস্বত যমের কাছে চেয়েছিল, সে যেন ওপার হতে আবার এপারে ফিরে আসতে পারে। নচিকেতার প্রশ্ন ছিল যে 'প্রেতি'র পর কি কিছু থাকে, কি থাকে না। যা না থাকল তা ফুরিয়ে গেল, আর যা থাকল তা জীবনেই আবার সঞ্চারিত হল। এই নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই ইঙ্গিতই জীবনের সিদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে পোষণ করে। নির্বাণের অনুভব হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের দেহে, তাঁর জীবৎকালেই। তিনি তাঁর জীবন দিয়েই তা প্রচার করেছেন পরম করুণায় মহানির্বাণের মরণরভস ছাড়িয়ে ফিরে এসে। সমষ্টি-জীবন যে তাতে আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আজও বর্তমান। যোগের যে কোনও সিদ্ধি জীবনে বা জীবন দিয়েই লাভ করতে হয়। তাই জীবনের দাবী প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাকে স্পষ্ট করে তুলতেই হবে অনুভূতির শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর মৃত্যুঞ্জয় প্রেম সাধনার ভাস্বর মহিমায়। তবেই সেই সত্য শিব সুন্দর ঘটে-ঘটে দিব্যজীবনের মহিমায় স্বভাবে প্রতিষ্ঠা পাবেন, মানুষ অমৃত হবে।

পূর্ণযোগ জীবনের যোগ। সাধনার ফলে এতকাল ধরে যুগে-যুগে যে

বিত্ত সঞ্চয় করেছি, তার সমস্ত কিছুর সমাহরণ করে এগিয়ে যাবার দায় আমাদের। তা করতে হলে আগে কি পেয়েছি তা দেখতে হবে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সচেতনভাবে এদেশে যেমন হয়েছে, অন্যত্র কোথাও সেভাবে হতে পারে নি। জগতে যত ধর্মমত ও পথ প্রচলিত তাতে মহাসত্য রয়েছে। কিন্তু সে-সত্যকে প্রজ্ঞামণ্ডিত করে মনের ঐশ্বর্যে রূপ দেওয়া ভারতে ছাড়া আর কোথাও সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ওদেশে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের মাঝে সজ্ঘাতের ফলে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে দার্শনিক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু সে দর্শন মনের বা বুদ্ধির পরাক্ বৃত্তিতে। আত্মদর্শনের আভাস তাতে মেলে না বললেই হয়। এদেশের দর্শন শুধু যে প্রতিবোধবিদিত অনুভবই শ্রুতিগোচর করানো হয়েছে মাত্র এমন নয়, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও বিচারণা দিয়ে বোধির অনুগত বিশ্লেষণও করা হয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে। এই অধ্যাত্মমনীষার ধারা সম্প্রদায়ক্রমে আজও জীবন্ত। বেদ উপনিষদ তন্ত্রের পরে বৌদ্ধ যুগের অধ্যাত্মদর্শনও আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। অতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে তুলিত করা যায় এমন যোগপন্থাগুলির আবিষ্করণ হয়েছিল এদেশে ; যেমন পতঞ্জলির যোগে। এই কারণেই প্রচলিত সাধনসম্প্রদায়গুলির স্বরূপ সম্বন্ধে মোহশূন্য এক আলোচনের বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, পূর্ণযোগের সাধনায় তাদের উপযোগিতা কতখানি।

এ দেশে পাঁচটি মুখ্য যোগসাধনাকে যথাক্রমে হঠযোগ, রাজযোগ ও কর্ম জ্ঞান ভক্তির যোগত্রয়ী এইভাবে চিহ্নিত করা হয়। 'আর একটি এই পাঁচটির সমন্বয়যুক্ত এবং সর্বাধিক প্রচলিত, সেটি হচ্ছে তন্ত্র। তন্ত্রের মূলে সাধনার যে ঐতিহ্য, সে হল 'বেদ'। বৈদিক সাধনার মূল ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে উপনিষদে। তাকে অধুনা প্রচলিত জ্ঞানযোগে যে রূপ দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও কিন্তু তাকে আশ্রয় করে আর একটি প্রাণবন্ত সাধনধারা ছিল। সেটা

বাইরে প্রায় লুপ্ত হলেও মরমীয়া সাধনায় আজও ফল্গুধারায় বয়ে চলেছে। ঐ পাঁচটি যোগের সাধন ধারার সঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিক সমন্বয়ের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে মূল সার্বভৌম ও সনাতন তত্ত্বগুলি কি ভাবে গ্রহণীয় তা বুঝে নিতে হবে। মানুষের এই আধার নিয়েই তো সব সাধনা, তাই সবার আগে আধারকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। মানুষের আধারে দেহ প্রাণ ও মনে চিৎশক্তির যেটুকু উন্মেষ ঘটেছে, তার চালক হচ্ছে বুদ্ধি। ব্যবহারিক জীবন বুদ্ধিকে পুরোধা করেই চলে যায়। কিন্তু বুদ্ধিকে ছাপিয়ে ও তাকে ঘিরে রয়েছে বিজ্ঞান। সেটিই যোগসাধনার প্রমুখ সহায় ও লক্ষ্যও। জীবনের লক্ষ্যকে এইভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু বৈদিক যুগে সাধনার লক্ষ্য ছিল পূর্ণাঙ্গ; তা হল জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। সবকিছুকেই জ্যোতির্ময় বলে ভাবনা করা তার একটি মুখ্য সঙ্কেত। বোধি তার সহায়। সেটি হৃদয়ের গভীরের বৃত্তি, বুদ্ধি তারই প্রতিভূ—এটি বুঝে নিতে হবে। আদিত্যমণ্ডলের নীচে দাঁড়িয়ে আছি, আলোর ঝরণাধারা দেহপ্রাণমন প্লাবিত করে আমাকে ধুয়ে শুচি শুভ্র ও উজ্জ্বল করে তুলছে, এই আমি বৃহৎ হয়ে উঠছি, সব কিছু ব্যেপে ভরে আছি: এই সহজ ভাবনার যোগ প্রাচীন যুগে এদেশে সত্য হয়ে উঠেছিল। আজ আবার শ্রীঅরবিন্দের যোগে আমরা তাকে নতুন করে সমৃদ্ধভাবে ফিরে পেলাম। বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বোধির অনুগত হয়ে চললে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের সমন্বয় এনে দেবে যে-যোগ, তা গীতার ভাষায় দেবদত্ত বুদ্ধিযোগ।

৪

যোগসমন্বয়

ঐতিহাসিক ধারায় নয়, চেতনার অভিব্যক্তির দিক থেকে দেখলে যোগের ওই যে প্রথম আদর্শ ছিল জীবনকে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি খুলে মেলে দিয়ে সৌরালোকে উদ্ভাসিত করে নেওয়া—একে পূর্ণযোগেরও মূলসূত্র বলে ধরা যেতে পারে। ছান্দোগ্যোপনিষদের শান্তিপাঠে আছে—"আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি" ইত্যাদি। এ হল সর্ব অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নে সেই পরম সত্যকে অধিগত করা, জাগ্রৎ চেতনায় লোকোত্তরের সামনে দাঁড়ানো। এই আদিম দর্শন থেকে ক্রমে এল সমগ্রের বদলে একেকটি অংশকলার অনুশীলনের যুগ। প্রথমে ধরা যাক হঠযোগ। তার আলম্বন হল দেহ এবং নাড়ীতন্ত্র। তারও লক্ষ্য কিন্তু নিরোধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি নিরুদ্ধ করে মানসোত্তরকে উপলব্ধি করা। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই পরাক্ প্রবণ এবং তাতে আপ্যায়নের চাইতে মিশ্রণের' সম্ভাবনাই বেশি। কেননা আমাদের দেহ প্রাণ মন শুদ্ধ নয়, তারা অপরা প্রকৃতির অধীন। এই মিশ্রণ শুদ্ধ করা যায় দুভাবে। এক, উচ্চতর শক্তি তাতে প্রবাহিত করে, আর দুষ্ট প্রকৃতিকে দমন করে তার কণ্ঠরোধ করে। কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে গিয়ে আমরা তার শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে দিয়েছিলাম।

হঠযোগের সাধনায় শ্বাসরোধের ব্যবস্থা আছে। প্রাণ রুদ্ধ করে চিত্ত শান্ত করা। চিত্ত চিরচঞ্চল, এ চঞ্চলতা প্রাণের, প্রাণ সক্রিয় শ্বাসে প্রশ্বাসে। চঞ্চল চিত্ত স্থির করতে উল্টা পথ বেয়ে শ্বাসরোধে প্রাণকে নিরুদ্ধ করা, তাতে চিত্তের প্রশম। তার জন্য প্রথমে দেহ শুদ্ধ করতে নাড়ীশুদ্ধির ব্যবস্থা। ষট্‌কর্মের দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি ছিল হঠযোগের একটা প্রধান সাধন। নাড়ী-

বলতে সমস্ত nervous systemটাকে বোঝায়। অন্তর্মুখ হলে নাড়ীস্রোতের ভিতর দিয়ে চৈতন্যের তরঙ্গ অনুভূত হয়। প্রাণস্রোতের ধারাও স্বচ্ছন্দ হয়, তার সুস্পষ্ট গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়। বেদে ও উপনিষদে এর প্রাচীন সাধনরূপটি পাওয়া যায়। এই নাড়ীর ভিতর দিয়েই প্রাণবহ বায়ুর গতি, তাই নাড়ীর শোধন একটি প্রয়োজনীয় সাধনকর্ম। হঠযোগীরা স্থূল উপায়ে এগুলি করতেন। দেহকে দৃঢ় করতে আসন ও হাল্‌কা করতে ষট্‌কর্ম এবং প্রাণায়াম। স্থূল দেহের বিবর্তন মানুষের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিলেও নাড়ীশুদ্ধি দ্বারা প্রাণমনের শক্তি অনেক বাড়িয়ে নেওয়া যায়। হঠযোগে কুম্ভকের উপরেই জোর দেওয়া হল, যার ফলে চিত্তের প্রশম ও পরিণামে জড় সমাধি আসে। জড় সমাধিতে তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য স্পষ্ট ও ধারণা উজ্জ্বল না হলে নাও আসতে পারে। যোগভাষ্যকার সাবধান করে দিয়েছেন, বিশুদ্ধ জড় সমাধি প্রায়ই হয় না। সেজন্য সমাধিটা বড় কথা নয়। রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে এর এক সুন্দর উদাহরণ আছে। এক বাজীকরের জড় সমাধি হয়েছিল; সেটা ভেঙে গেলেই সে আবার চীৎকার করে লোক জড় করতে চাইল খেলা দেখবার জন্য। এরকম অচেতন ভাবের সমাধি বা মূঢ়তায় কোনও কাজ হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে মূঢ় ক্ষিপ্ত এমন কি বিক্ষিপ্ত ভূমির সমাধিতে ঠিক ঠিক যোগ হয় না। আবার হঠযোগের উৎকট সাধনায় জীবন থেকে সরেও আসতে হয় অনেক সময়। প্রাচীন যোগীরা বলতেন রাজযোগে যাদের অধিকার নেই, তাঁদের জন্যই হঠযোগ। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'এটা কোরো না, তাতে দেহের উপর মন পড়ে'। কিন্তু নাড়ীতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে একেও আমাদের প্রয়োজন মত গ্রহণ করতে হবে। কুণ্ডলিনী যোগ হঠযোগীদেরই দান। তাতে সুষুম্নার পথ স্বচ্ছন্দ হয়। মেরুদণ্ডের ভিতর সুষুম্নাকাণ্ডে নাড়ীতন্ত্রের মূল। তার মধ্যে দিয়ে প্রাণস্রোত চলে গেছে

মস্তিষ্কে; তা থেকে শাখা প্রশাখা হয়ে সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছে। যোগের দ্বারা এই নাড়ীতন্ত্র পুষ্ট ও দৃঢ় করতে হবে। সুষুম্নাকে উদ্বুদ্ধ করে মেরুদণ্ডে তার সূক্ষ্ম প্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন থাকা,—হঠযোগের এই সিদ্ধি পূর্ণযোগে

হঠযোগে দেহ ও প্রাণের প্রতি পিছুটান আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বুদ্ধি সহকারে করলে হয় রাজযোগ। তাতে প্রাণ ও মনের ক্রিয়া। রাজযোগের আটটি অঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যম ও নিয়ম চরিত্রের বিশুদ্ধির লক্ষণ। চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ় না হলে যোগ হয় না। এটি যোগের প্রয়োজনীয় প্রথম অংশ। এর পর আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। হঠযোগের এই অংশটি গ্রহণ করেও রাজযোগ একে সহজ করে নিয়েছে। প্রত্যাহার থেকেই রাজযোগের অন্তরঙ্গ সাধন শুরু হয়। মনের গতিকে অন্তর্মুখ করা হল প্রত্যাহার। বাহিরের অনুভব ভিতরে এসে ভাবে রূপান্তরিত হয়, ভাব থেকে সুখ আসে। বস্তুকে ছেড়ে সেই অনুকূল সংবেদনে চিত্ত নিবিষ্ট হলে প্রসন্নতা লাভ হয়। তা থেকে চেতনার ব্যাপ্তি, এরই নাম প্রত্যাহার। এরকম চেতনার ব্যাপ্তি ও প্রসাদ এলে চিত্ত তাতে নিবদ্ধ হয় ও তন্ময়তা আসে। তারপর থেকে আরও অন্তরঙ্গ সাধন হচ্ছে ধারণা, ধ্যান, সমাধি। চিত্ত প্রসন্ন হলে ধ্যান হবে। যাতে আমাদের ঔৎসুক্য (interest) তাতেই আমাদের একাগ্রতা (attention) আসে। প্রত্যাহারে ধ্যানচিত্ত প্রবাহিত করতে গেলে, আধারকে হাল্কা করতে হয়, তাই ধারণা 'দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা'। দেশ এখানে দেহ। ব্যাপ্ত দেহচেতনার তন্ময়তা, একতানতা, পরিব্যাপ্ত প্রসন্নতা, এগুলির পর্যবসান সমাধিতে। তখন লোকোত্তর বিজ্ঞানের দ্বার খুলে যায়, এটি প্রসাদগুণ।

রাজযোগের সাধনা সুন্দর, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করাই মূল মন্ত্র হওয়ায় অনেক সময় সমাধি প্রবর্তিত করতে জোর করে

মনের চাঞ্চল্যকে নিরুদ্ধ করার দিকে রাজযোগী ঝোঁক দেন, তাতে আবার ন্যূনতা (defect) এসে পড়ে। মানসোত্তর বিজ্ঞান ও আনন্দের জ্যোতির্ময় ভাবলোকের দর্শন ও তাতে অনুপ্রবেশ আর হল না এমনও হয়। মন অনিরুদ্ধ, তাতে ঐ উর্ধ্বলোকের তত্ত্ব স্ফুরিত হলে সে সহজে ধ্যানমগ্ন হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহায়ে তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনা ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধি পেলে সে আর নীচের টানে নিগৃহীত হবে না, চঞ্চলতা আপনিই শান্ত হয়ে আসবে। তার ওপরে তখন পরমের প্রসাদ গুণে প্রসন্নতা ঝরে ঝরে পড়বে। তাতে নিবিষ্ট হতে পারলে জোর করে নিরুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। এ অনুভবের ছবি পাই রবীন্দ্রনাথের ভোরবেলার গানে। উষার আবির্ভাবে চিত্ত আপনিই প্রাত্যহিক তুচ্ছতার জগৎ থেকে পরাবৃত্ত হয়ে পরমের অনুগত হয়ে গেল। এই ভূমিই দেখা দিল জ্যোতির্ময় হয়ে, আকাশ আলো করে সূর্যের উদয় হচ্ছে সহস্র কিরণ মেলে; চিত্ত প্রসন্ন উদার। একে যদি যোগের ভিত্তি করে নিতে পারি তখন সবই মধুর হয়ে যায়। যাই দেখি, শুনি, ভাবনা করি, কর্ম করি সমস্তেই এই পরম মিলনের মাধুর্য ক্ষরিত হতে থাকে। কবিচিত্তে এ ভাবটি সহজে ধরা পড়ে। এই সহজ সুন্দর সরল ভাবটি হৃদয়ের নিজস্ব সম্পদ, তাকে উদ্ধার করে সেখানে পূর্ণযোগের বেদী প্রতিষ্ঠা করতে পারি। বেদের সাধনায় যাকে পেয়েছিলাম, গীতা ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সোনার আলোর রাজপথ আমাদের সামনে খুলে যাবে। মন বলবে—এ তো পৃথিবীর মায়েরই আলো, তাঁরই শিশু আমি, তিনি আমার সম্মুখে—'আবিরাবীর্ম এধি'।

*

ভাবনা, বেদনা, সংকল্প এ তিনটি মনের ধর্ম। যোগশক্তিতে অবরুদ্ধ মনঃশক্তি সমৃদ্ধ হবে। ভাবনার শুদ্ধি ও মুক্তি হয় জ্ঞানযোগে, বেদনা হিল্লোলিত ও রূপান্তরিত হয় ভক্তিযোগে আর সংকল্প শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয় কর্মযোগে।

জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এই তিনকে যোগত্রয়ী বলে একসঙ্গে লক্ষিত করা যায়। এ তিনের সমষ্টিতে জাগ্রতের ব্যবহার; তিনটি ওতপ্রোত, আলাদা করা যায় না। জানা ও ভাবা জ্ঞানের দিক, আস্বাদন বা রস ভাবের দিক আর কর্ম ইচ্ছার দিক। যথাক্রমে thinking feeling willing, এদের না হলে মানুষের কারবার চলে না। জানা বিশুদ্ধ হলে ব্রহ্মের চিৎসত্তার সঙ্গে যোগে জ্ঞান। রস আস্বাদনে ব্রহ্মের আনন্দস্বভাবের স্ফুরণ আর কর্মে ব্রহ্মের শক্তির বিচিত্র উল্লাস। তন্ত্রে এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী। চিৎশক্তিকে লীলায়িত করে রূপ ধরছে তাঁর সংকল্প—যিনি জ্ঞানস্বরূপ। তন্ত্রমতে শক্তি শুধু মায়া নয়, জগৎ মিথ্যা নয়।

বৈদিক সাধনায় যোগ ছিল সমগ্রকে নিয়ে, পুরুষ বলতে ঋষিরা গোটা সচেতন মানুষকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে আংশিক অনুশীলনের ফলে বিশুদ্ধ চৈতন্যকেই পুরুষ আর সব কিছু প্রকৃতি, পুরুষ থেকে অবর একটা কিছু এবং সেই ভেদাত্মক মায়া থেকে মুক্তি পাবার সাধনায় ঝোঁক পড়ায় যোগপথগুলি যেন ইহবিমুখ হয়ে পড়েছিল। তখনই তন্ত্রসাধনায় যোগের মহাসমন্বয়ী এক আবির্ভাব। তন্ত্র সমস্ত সাধনপথগুলি হঠ, রাজ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি আত্মসাৎ করেও পূর্ণযোগের অনুকূলে এক বিশিষ্ট যোগের সাধন-সঙ্কেতও দিয়েছেন। সেখানে জীবন ও জগৎকে প্রত্যাখ্যানের ভাব নেই। চৈতন্যকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করছে যে বাধাগুলি, তাদের জীবন থেকে কেটে ফেলার আগে যতদূর সম্ভব শোধিত ও মার্জিত করে চেতনাকে ঊর্ধ্বগামী করার প্রয়াস তন্ত্রের সাধনায় আছে। যেগুলি প্রাকৃত হেয় ও সাধনের বাধারূপে উপস্থিত হয়, সেগুলির মধ্যেও শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার ব্যূহিত হয়ে আছে। বাঁধনমুক্ত হলে সেই শক্তিসমূহ সাধনের অনুকূল হলে, পরিশেষে রূপান্তরিত হবে চৈতন্যের নিজস্ব ঐ একশক্তিতেই—এটি সাধকের অনুভবে আসে।

বর্তমানে তন্ত্রকেই ভারতবর্ষের লোকাতত ধর্ম বলা যেতে পারে। মুষ্টিমেয় বৈদান্তিক ছাড়া সাধনা এখনও যেটা আছে, তন্ত্র ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই। বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মত তন্ত্রেও জ্ঞান ও কর্মের দুটি দিকই নিপুণভাবে অনুশীলিত হয়েছিল বৈদিক ধারারই সার দোহন করে। কিন্তু তন্ত্রের সে বিশাল জ্ঞানকাণ্ডের কথাও আমরা লোকজীবনে বিস্মৃত হয়ে শুধু পদ্ধতি গ্রন্থ দিয়ে কাজ চালিয়ে যাই। শক্তিসাধনায় আবার বামাচার ইত্যাদির বিকৃতি দেখে ও রহস্য না বুঝে তন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত মনে এক প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল। অধুনা এই বিশশতকের প্রথমার্ধেই তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে ও পুনরুভ্যুত্থানে এক নতুন আলোয় দিগন্ত খুলে গেছে। দেখা যায় সে বিশাল গম্ভীর জ্ঞানরাশি—আগম-নিগমের থৈ পাওয়া কঠিন। জ্ঞানের এত গভীর অনুশীলন বেদান্তেও হয় নি।

তন্ত্রে পঞ্চদেবতার উপাসনার বিধি এখনও প্রচলিত। পাঁচটি দেবতা হলেন শিব, বিষ্ণু, শক্তি গণপতি এবং সূর্য। তার মধ্যে সূর্যোপাসনা মূলত বৈদিক এবং তার নিষ্কর্ষ রূপ বিশ্বামিত্রের সাবিত্রমন্ত্র আজ পর্যন্ত এদেশের দ্বিজাতি মাত্রের নিত্যজপ্য স্বাধ্যায় হয়ে আছে। মনে পড়ে সুদাসের যজ্ঞসভায় বিশ্বামিত্রের ঘোষণা, "বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাশক্তিই ভারতজনকে রক্ষা করছে।" তাঁর সে উদাত্ত ঘোষণা সত্য হয়েছে। গণপতির উপাসনা দক্ষিণদেশেই বিশেষ করে প্রচলিত। তাঁর নামে একখানি উপনিষদও পাওয়া যায়। তন্ত্রসম্মত যে কোন বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানেও গণেশকে ঋদ্ধি ও সিদ্ধিদাতা বলে সর্বাগ্রে স্মরণ করা হয়। তিনি প্রসন্ন না হলে সাধকের অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। বস্তুত শিব, বিষ্ণু আর শক্তির উপাসনাই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। এদের অবলম্বন করে এক বিরাট অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও সৃষ্টি হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের স্থান খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ইতিহাস পুরাণের একটা বড় অংশ তাঁরা জুড়ে আছেন। তাঁদের নিয়ে দার্শনিক ভাবনাও হয়েছে সুপ্রচুর। তন্ত্রের শৈবদর্শন

কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে কিছু পাওয়া যায়, না হলে তা প্রায় লুপ্ত। বৈষ্ণব ও শাক্তধারার প্রচলন আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। এখন দেখে মনে হয়, বৈষ্ণব সাধনার ধারা পরে যেন আলাদা হয়ে গেছে। সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তি ও শক্তিকে যেন প্রকৃতি ও পুরুষের মত দুধারায় বইয়ে দেয়া হয়েছে পৃথক ভাবে। কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের মিথুনকে তো ভাঙা যায় না। যদি তন্ত্রের সার শক্তি উপাসনাকে ধরা যায় আর বেদের ও তান্ত্রিক দর্শনপ্রস্থান মিলিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসনা এক অখণ্ডদর্শনে জুড়ে নেওয়া যায়। একটি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও অপরটি সাধন শাস্ত্র। বেদান্তে পুরুষ প্রধান এবং তন্ত্রে শক্তি প্রধান স্থান নিয়েছে। আধুনিক যুগে বেদান্ত সাংখ্যপ্রভাবিত হয়ে শক্তিকে ছেঁটে দিয়েছে। তাই আধুনিক যুগে পূর্ণযোগ-সমন্বয়ে বেদান্তদর্শন সমহারের অনুকূলে আসে না। অপর পক্ষে মহাশক্তিকে তন্ত্র জগতের মূলে গ্রহণ করেছে, তাই তন্ত্রের সমন্বয়ী দর্শন যোগসমন্বয়ে অধিক কার্যকরী। শক্তিকে পরমতত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাই সেটা পূর্ণযোগসাধনের সবিশেষ অনুকূল ও প্রস্তুতির পথে এক অপরিহার্য আশ্রয় এবং ভিত্তি। অন্য যোগপন্থাগুলিতে শেষ পর্যন্ত জীবনমুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যোগেশ্বর পুরুষকে চাওয়ার পথে ভুক্তি ও মুক্তি দুইকেই তন্ত্র সমানভাবে গ্রহণ করেছে শক্তির প্রাধান্য দিয়ে, এটাই তার বৈশিষ্ট্য।

যোগসমন্বয়ের আর একটি প্রধান ভিত্তি ও আশ্রয় ভগবদ্গীতা। তন্ত্র-দর্শনকে ভিত্তি করে গীতার দর্শন গ্রহণ করলে এক প্রাচীন যোগসমন্বয়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন গীতা থেকেই শুরু। তাঁর দর্শন বুঝতে হলে Essays on the Gita গোড়ায় ভাল করে বুঝে নিতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণচেতনাকে জগতে নামিয়ে আনার প্রয়াস করছেন; সেই দৃষ্টিতে গীতার দর্শন অধিগত করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের গীতোক্ত কর্মযোগের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অতুলনীয়

ও অভূতপূর্ব। আমাদের দেশে বহুযুগ ধরে কর্ম উপেক্ষিত হয়েছিল। গীতা-ব্যাখ্যায় এক সম্প্রদায় জ্ঞানে ঝোঁক দেন, অন্য সম্প্রদায় ভক্তিতে। গীতার রহস্য কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। জ্ঞানযোগের সাধ্য ব্রহ্ম বা আত্মা; তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ। ভক্তের ভগবান বিশ্বাত্মক হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ; তাই কর্মযোগী কর্ম করেন কর্মক্ষয়ের জন্য, সৃষ্টির উল্লাসে নয়। এতে সাধন জীবনে কর্মের স্থান গৌণ হয়ে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gitaতে চোখে আঙুল দিয়ে প্রথম দেখিয়ে দিলেন যে সব কর্মই ভগবানের। তাঁকে ভিত্তি না করে কর্ম করলে কর্ম দিব্য হবে না। এমন কথা আগে শোনা যায় নি। গীতার কর্ম ভাগবত কর্ম; ভক্তি আর জ্ঞান যদি তার আশ্রয় না হয় তা হলে দিব্যকর্ম সম্ভাবিত হতে পারে না—এ কথা শ্রীঅরবিন্দের আগে এভাবে কেউ বোঝান নি। গীতার প্রবচনের স্থান কুরুক্ষেত্রে; তার প্রত্যেক অধ্যায়ে যুদ্ধের প্রেরণা। এটা ধরতে পারলে জীবনযুদ্ধের প্রেরণায় কর্মের মর্যাদা বাড়ে, শক্তি লাভ হয়। কর্ম ছাড়া জীবনে পূর্ণতা আসতে পারে না। প্রাচীন কালে গীতার ভাষ্যে কুরুক্ষেত্র যে ধর্মক্ষেত্র, এই আধারতত্ত্বটি প্রায় বাদই পড়ে গেছে। অর্জুনের চেতনা প্রাকৃত বলেই ঘোরকর্মের উপদেশ—এটুকু মাত্র বুঝলে গীতার উপদেশ নিরালম্ব হয়ে পড়ে। জীবনে আর যোগে বিচ্ছেদ ঘটে, যোগেশ্বরের প্রসাদবঞ্চিত সংসার দুঃখময় মাত্র হয়েই দেখা দেয়। ধর্মযুদ্ধ এবং পুণ্যভূমি এই কুরুক্ষেত্র, এটা যেন শুধু কথার কথাই হয়ে দাঁড়ায়। শাঙ্করমতে গীতা মোক্ষশাস্ত্র, ভক্তি ও কর্ম সেখানে গৌণ। অপরপক্ষে শ্রীধরের মতে ভক্তির স্থানই মুখ্য। আবার আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও লোকমান্য তিলক যুগপ্রভাবিত হয়ে কর্মে এত জোর দিয়েছেন যে সেখানে জ্ঞান ও ভক্তির স্থান গৌণ হয়ে পড়েছে। আমরা যে মন দিয়ে বুঝি তার স্বভাবই হল খণ্ড করে দেখা বোঝা। তাতে একটা দিকে বেশি জোর পড়ে; অন্য দিকটা না দেখতে পেলেই গোঁড়ামি এসে যায়। মন জাগলে টর্চের মত কাজ করে এবং দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সৃষ্টি করে, কারবারী

বুদ্ধির সহায়ে তা বোঝাও যায়। কিন্তু এ মন দিয়ে অন্তরকে বোঝা যাবে না আর তা না হলে যোগও হবে না। এর জন্য চাই আত্মসমর্পণে এক সমগ্রের বোধ বা বোধিকে জাগানো। আত্মসমর্পণ এলে বুদ্ধি তিনিই দেবেন—'দদামি বুদ্ধিযোগং'। তখনই সমন্বয়ের দৃষ্টি খুলে যাবে, জ্ঞানের দীপ জ্বলে উঠবে। ব্যক্তিগত ভাবে, সিদ্ধজীবনে পুরুষের স্বভাবতই এক উদার সমন্বয়ী দৃষ্টি দীপ উন্মীলিত হয়। তিনি কারও নিন্দা বা স্তুতি করেন না। মধ্যযুগের অনেক সন্তদের মধ্যে এমন এক সমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করে কোনও শাস্ত্র রচিত হয় নি বলে সেটা সমাজজীবনে সমষ্টির বোধে সমন্বয়ী দৃষ্টি খুলে দিতে সমর্থ হয় নি। এরই জন্য প্রয়োজন আচার্যের, তাঁরা তত্ত্বকে সমাজগত করেন। সেই শক্তিপাতের প্রসাদে ও প্রভাবে সমাজের প্রতি স্তরেই চাওয়া পাওয়া দেওয়া এবং পরিশেষে হওয়া—এই সব ভাবেই যোগ এবং ক্ষেম এক মহাসমন্বয়ে গ্রথিত হয়। বহু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাও করেছেন, গীতা ও ভাগবত সেই পরিচয় বহন করে। তারপর সেই সমন্বয়ী দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় 'মহতা কালেন নষ্টঃ' হয়ে যায়। তাকে আবার শ্রীঅরবিন্দ এসে তাঁর যোগে সবভাবেই নতুন করে সমন্বিত করে গেঁথে তুলেছেন। প্রাচীনের সমাহার এগিয়ে চলায় নবীনের সংযোজন—এতে নূতন দিগন্ত খুলে উষার পুনরাবির্ভাব হয়েছে। তার মধ্যে প্রত্যেকের দর্শনের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।

যোগের লক্ষ্য কি ? ক্ষুদ্রজীবনকে বৃহৎ করা—ব্রহ্মস্বভাবে যুক্ত হওয়া। ব্রহ্ম বৃহৎ চেতনা কিন্তু জীবন অল্প, তাকে ভূমা করতে হবে। তাতেই জীবের স্বাতন্ত্র্য। 'আমি' ক্ষুদ্র সাধক আর আমার সাধ্য হলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ শ্রীঅরবিন্দ যোগসমন্বয়ের জ্ঞানযোগের পর্বে দিয়েছেন পাঁচটি। ব্রহ্মের সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপের কথা আমরা জানি। কিন্তু তাতেই তিনি নিঃশেষিত হয়ে যান না। আরও দুটি তত্ত্ব তাঁর স্বরূপস্বভাবেই, তিনি অসৎস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ। এ দুটিকে যথাক্রমে ওপরে ও নীচে কল্পনা করে

নিতে পারি। বিশ্বাতীত ব্রহ্ম মন বুদ্ধির অগোচর, তখন তিনি সত্তেরও ঊর্ধ্বে অসৎ—utter transcendence ; এটিও প্রাচীন ভাবনা। আবার ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হতে পারেন না, জগতের দিক থেকে দেখলে তিনিই শক্তিস্বরূপ, তাঁরই প্রকাশ এই জগৎ। তখন তাঁকে সগুণও বলতে পারি, নির্গুণও বলতে পারি। কাজেই তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ আবার নির্গুণ থেকেও সগুণ। ব্রহ্মচৈতন্যকে আমরা দ্বিধাবিভক্ত ভাবে দেখি, পুরুষের বা চৈতন্যের দিক থেকে এবং প্রকৃতি বা শক্তির দিক থেকে। দেখার জন্য দুটি মেরু স্বীকার করে নিতেই হবে। না হলে বস্তুত পুরুষপ্রকৃতি এক অবিভাজ্য তত্ত্ব। একদিকে যদি দেখি অসৎ সৎ ও চিৎ, তবে এ তিনের প্রতিষ্ঠায় পুরুষের ভাব। আবার তারই মধ্যে আনন্দের উল্লাসে শক্তির বিচিত্র প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতির ভাবরূপ। এগুলি আমাদের বোধে কি ভাবে প্রতিভাত হয়। অসৎএ সব হারিয়ে যায়, থৈ পাওয়া যায় না। তাকে আমরা জীবনের কোন কাজে লাগাই না। শুধু এক অস্পষ্ট বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ার সময় যদি সচেতন থাকি। যোগসাধনায় সমাধি আসার পূর্বেও এক অসৎ বা প্রবল নাস্তির বোধ আসে। জীবনের আর একটি ভিত্তি ব্রহ্মের সদ্‌ভাব। তাকেও আমরা জীবনের কাজে লাগাই না, এর প্রকাশ শান্তিতে ও বিশ্রামে। প্রশান্তি ও বিশ্রান্তি জীবনের সঙ্গে গ্রথিত, অঙ্গীভূত। কর্ম বা গতি একটা আছে আর ধ্রুবাস্থিতি বা স্থিরতা একটা নেই, তা তো হতে পারে না। এই ভাবে সৎ ও অসৎ জীবনের পশ্চাতে বা অধিষ্ঠানে আছেই। চৈতন্যের প্রকাশ হয় তাতে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে ও বিলাসে, সেটাই জীবন—প্রাণ। তখন যে সচেতন অবস্থা সেটাকেই জাগ্রত বলে ধরা হয়। সেই অবস্থায় থেকে চিন্তা, সংবেদন, কর্ম সবই আস্বাদিত হয় জীবের মাধ্যমে। এসবই শক্তির প্রকাশ—লীলাবৈচিত্র্য ও প্রেমবৈচিত্র্য।

তাহলে ব্রহ্মকে যখন চাই, দুভাবেই চাওয়া যেতে পারে। তার প্রতিষ্ঠার দিক—ঐ সৎভাবকে আশ্রয় করে সৎসমাপত্তি বা বিশুদ্ধস্থিতি, এই হল

একভাব। অন্য দিকে আর সমস্ত থাকল উপাধিরূপে। এতে সাধনার ধারায় জীবনবিমুখীনতা এসে পড়ে এবং জগৎব্যাপার বা নামরূপ বর্জনই লক্ষ্য হয়ে পড়ার দিকে ঝোঁক আসে। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যই একমাত্র, তদতিরিক্ত বস্তু কিছু থাকতে পারে না, এই অদ্বৈতবোধে যদি ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে কিছুই বাদ পড়তে পারে না। চৈতন্য জ্ঞান কর্ম আস্বাদন, এ সবই আনন্দ ও শক্তিরই চিদ্‌বিলাস। রসো বৈ সঃ—তিনি রসস্বরূপ। আপন আনন্দলীলায় আপনি বিভোর, সেই ভূমার বোধে যদি প্রতিষ্ঠা পাই সৎ ও অসৎকে রেখে, তাহলেই যথার্থ বৃহৎ হতে পারি। তাঁর লীলায় যোগ দিয়ে ব্রহ্মস্বভাবই লাভ করতে পারি। এই ভাবই যোগসমন্বয়ের মূলে। ব্রহ্মের সৎ ও অসৎ বাদ দিতে নেই, দেওয়া যায় না। তাতেই আশ্রয় ও স্থিতি লাভ এটা চাই। কিন্তু ব্রহ্মের ইতি করতে নেই, কোন ক্রমেই তা করা সম্ভব নয়। ঐ পশ্চাৎপট থেকেই শক্তির নির্ঝর আর তাতেই আনন্দের উল্লাস। মূল শক্তির যোগান ঐ কৈবল্য বা নৈঃশব্দ্য থেকেই। এই অসৎ ও সৎকে পুরোপুরি জীবনে অধিগত করা বা তাতে সমাপত্তিতেই বৌদ্ধ নির্বাণ বলা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যেখানে বৌদ্ধ সাধনা শেষ, সেখানে তাঁর সাধনা শুরু। এর অর্থ অসৎ বা নির্বাণকে অস্বীকার করা নয়। অসীমে অনন্তপ্রসারিত সত্তার অনির্বাণ অধিষ্ঠানেই আধাররূপে থাকবে চৈতন্য ও আনন্দের শক্তির নির্ঝর। জীবনে এটি ঘটিয়ে তোলাই পূর্ণযোগ বা যোগসমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপন—অতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা।

এই দৃষ্টিতে পূর্ণযোগ যথার্থ ব্রহ্মযোগ ব্রহ্মকে জীবনে মূর্ত করে তোলা। এর সার্থকতা শুধু তত্ত্বদৃষ্টিতে পেলেই হবে না; জীবনের জাগ্রতে তাকে মুখ্যস্থান দিতে হবে। সুষুপ্তিস্থান ও স্বপ্নস্থান জাগ্রতের শক্তির উৎস; তাকে জাগ্রতে প্রতিফলিত করাই যোগকর্ম। ব্রহ্মসংকল্পকে রূপ দিতে হবে, তাকে সম্পদ্যমান্‌ করতে হবে জীবনকাব্যে, তা না করতে পারলে যোগ পূর্ণাঙ্গ হয় না। সেজন্য পূর্ণযোগে আত্মসচেতনতার সঙ্গে আর একটি মূলসূত্র ধরতে

হবে, সেটি হল ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপজ্ঞান ও স্বভাব সম্বন্ধে এক সমগ্র প্রত্যয়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, এই যোগত্রয়ীর সাধনে বিশেষ জোর দিতে হবে এবং আধার প্রস্তুত করতে হবে হঠযোগ ও রাজযোগের সহায়ে। কিন্তু প্রাকৃত স্বভাবে যোগত্রয়ীর সম্যক সাধনের দ্বারা ব্রহ্মস্বভাবের প্রকাশ ঘটাতে শুধু মনের শক্তি ও সহায়ে চললে হবে না। কেননা মন একসঙ্গে সমগ্রকে ধরতে পারে না, তাই বুদ্ধির শুদ্ধি ও বোধির সঙ্গে বুদ্ধির মিলিত আনুগত্য বুদ্ধি পাশাপাশি সাজিয়ে সমস্ত অখণ্ডকে দর্শন করে। সবগুলি পৃথকভাবে স্বীকার করেও স্বভাবানুযায়ী একটার পরে তাকে জোর দিতে হয় এবং তাতেই সে রস পায়, অন্যগুলিতে পায় না। এই হল overmind বা অধিমানসের মায়া। সেখানে মনের সব ধারাগুলি পৃথকভাবে গিয়ে মিলেছে কিন্তু সাধকের প্রাকৃত স্বভাব মত ঝোঁক পড়ছে বিশেষ একটির পরে। কিন্তু সবকিছুকে মিলিয়ে নিয়েও সমগ্রকে একসঙ্গে দর্শন সম্ভব হয় বোধিবৃত্তিতে (Intuition)। উপনিষদে যিনি প্রাণ, ব্রহ্মের গতিরূপ তিনিই বোধির আশ্রয়। হৃদয় দিয়ে জানা বা পাওয়া সেখানকার ধর্ম। চিন্তা, কর্ম আনন্দ সবই বোধিবৃত্তিতে একরসপ্রত্যয়ে বিজ্ঞাত। মন বিষয়কে জানে বিষয়রূপে আলাদা করে যেন কেটে নিয়ে। এই প্রাণের ধর্ম দিয়ে বোধি বিষয়কে জানে একাকার হয়ে, তাদাত্ম্যজ্ঞানে। এটাই সমগ্রের দর্শন (Total vision)। তাই হৃদয় দিয়ে জানা হলে পরে আর বিরোধ থাকে না। এই বোধি (Intuition) যোগসমন্বয়ের সাধনায় এক অপরিহার্য সহায় সাধনার শুরু থেকেই। তাই যোগসাধনার গোড়া থেকেই বোধির প্রয়োগকৌশল শিখতে হবে সবরকম কর্মে বা ব্যবহারে। তাহলেই যোগ সহজ হবে।

বলা হয়েছে প্রাণ বোধির অবলম্বন। এই মুখ্য প্রাণ জাগলে জ্ঞানের দ্বারগুলি খুলে যায়। বোধি তখন জাগে যার মূলে আছে আত্মসমর্পণ। ভগবানকে সব দিতে হবে। যখন দেবার সময় আসে শুধু মন দিলেই তো

আর চলে না। ভক্ত বলেন তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। তাঁকে আমার মাঝে আহ্বান করি 'সর্বভাবেন'—সব ভাব সিদ্ধ করে আমার মধ্যে আবির্ভূত হও। তোমার আলোর আমার সব কিছু আলোময় করে তোলো। আমি শুধু হৃদয় মেলে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেব। আমার জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, তপস্যা সবই তুমি। এইই দেবাবিষ্ট জীবন! আমার সব দিয়ে তাঁকে চাই, তাঁরই আলোয় প্রতিনিয়ত স্নান করে করে নিত্যনবীন হয়ে উঠছি, এই ভাবের আত্মসমর্পণে জোর ধরলে প্রাণভূমিতে বোধির আবির্ভাব সক্রিয় হয়। তখন বুদ্ধি বোধির অনুগত হলে মন প্রোজ্জ্বল হয় এবং দেহবোধ পর্যন্ত সজাগ হয়ে সাড়া দেয়। যোগের পরবর্তী সব নিগূঢ় ভূমিতেও বোধির কাজ চলে সন্ধানী এক আলো ফেলে ফেলে শিকারী সারমেয়ের ক্ষিপ্র গতিতে অনুসন্ধানের মত। তাতে ভাবসমাধি, নির্বীজ সমাধি ইত্যাদি অপ্রাকৃত আবরণগুলিও নিরাকৃত হয় এবং যোগ-সাধনার মূলতত্ত্বে যোগী সহজে পৌঁছে যেতে পারেন।

সব চেয়ে বড় কথা যোগেশ্বরের কাছে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়া। সে দেওয়াও তো তিলে তিলে বেড়ে চলে। বৈদিক ঋষিরা যেমন সৌরালোকে অভিষিক্ত হয়ে ওঠার এক চিন্ময় প্রত্যক্ষ সাধনা দেখিয়ে গেছেন, সেই বৃহতের ও সমগ্রের সহজবোধও সমর্পিত হয়ে চলার ফল। এই বোধ বা বোধিকে সম্যক লাভ করতে পারলে আত্মসচেতনতাও স্বস্থ থাকে। শুধু বুদ্ধির কারবারে মন পঙ্গু হয়ে পড়ে যদি না তাতে বোধির আলো এসে পড়ে। পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতে এগিয়ে যায়, মূক হতে চায় বাচাল আর অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভের আশ্বাস সবই এই বোধির জাগরণে সম্ভব হয়। দেবতার এই সাক্ষাৎ বোধকে আশ্রয় করে চলা পূর্ণযোগের আদর্শ।

যোগের সহায়

৫

শাস্ত্র ও উৎসাহ

পূর্ণযোগের সাধন ও সিদ্ধির পথে চলতে পারা যায় কেমন করে, এই প্রশ্ন আমাদের এখন তুলতে হবে। অধ্যাত্মপথের সহায় ও সম্বল কি আছে, যাতে যোগেশ্বরের কাছে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে সম্যক সমৃদ্ধ হওয়া আমাদের জীবনে সহজ হবে? এখানে শ্রীঅরবিন্দ যোগের চারটি সহায়ের কথা বলেছেন—শাস্ত্র, উৎসাহ, গুরু ও কাল। এগুলিই হবে পথের অবলম্বন ও সাধকের সাধনসম্পদ। কিন্তু বোধির জাগরণ বা শ্রদ্ধার আবির্ভাব না হলে এ সাধনচতুষ্টয়ের আলম্বনও কার্যকরী হয় না বা সাফল্য এনে দেয় না। মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সমন্বয়ের দৃষ্টির সাহায্যে পথ চলতে হবে। কিন্তু বোধির আলোয় তাদের যাচাই হয়ে যাবে, এটা বুঝে চলা দরকার।

উৎসাহ হল যোগের মূল কথা। গীতার ভাষায় ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত না হলে যোগ হওয়া অসম্ভব। কোন কিছুতেই হার না মেনে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকার যে-নিষ্ঠা তাকে বলে ধৃতি, তার সঙ্গে থাকবে উৎসাহ। শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহ বলতে গীতার এই লক্ষণই দিয়েছেন, "নিশ্চয়েন হি যোক্তব্য অনির্বিণ্নেন চেতসা"। যোগ করতে হবে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে, নির্বিণ্ন হওয়া চলবে না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এই হল দৃঢ়সঙ্কল্পের গোড়ার কথা। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—সাধনা ভ্যাতভ্যাতে চিঁড়ের ফলার যেন না হয়, ভক্তি হবে ডাকাত পড়ার মত। উৎসাহ হল ওই রকমের এক জোরালো ধৃতিযুক্ত শক্তি। এরই অপর নাম অভীপ্সা (aspiration), যা মানুষকে ঊর্ধ্বলোকের অভিসারী করে, নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার এক প্রবল তাগিদ আনে তার মধ্যে। বেদে তার বাহনকে বলা হয়েছে অগ্নি 'অগ্নে ত্বায়েন জাগৃবে সহসঃ সূনো'—উৎসাহের

পুত্র তিনি, জেগে আছেন মনোদ্যুতি নিয়ে। শ্রদ্ধার আবেশে মানুষের হৃদয়ে যে আকুতি জাগে, সেটিই তার চিদগ্নির স্ফুরণ বা উৎসাহ। আধারে অগ্নির নিত্যজাগৃতি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সমনস্কতা ও সদাশুচিত্ব। কিন্তু এই উৎসাহ আসবে কখন, এ এক মরমী প্রশ্ন। আধারে গুহাহিত এই জাতবেদা অগ্নির জাগৃতি তো সবার হয় না। অথচ এ অগ্নি বৈশ্বানর, বিশ্বের প্রতিটি নরই তার অধিষ্ঠান। এখানে কালের এক অপেক্ষা আছে। মূল লক্ষ্যের দিকে সকলেই চলেছে মন্থর গতিতে কিন্তু সবাই সে বিষয়ে সমনস্ক নয়। লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এলে গতি তীব্র হয়, মনোযোগে উৎসাহ জাগে। এ ভাবে এক তীব্র সংবেগ না এলে যোগ করা আদৌ চলে না—ধর্মকর্ম করা চলে, কিন্তু যোগ হয় না। মনে উৎসাহ নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হলাম ধৃতিও এল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে চলে দোটানা, চিত্তে এক ওঠা-নামার দ্বন্দ্ব। এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে হয়। বারবার অন্তরে আলো জ্বালাতে যাই, আর বারবার তা নিভে যায়। আবার মাঝেমাঝে জ্বলেও ওঠে কিন্তু তবুও ধোঁয়া আর গাঁজলার যেন শেষ নেই। মনে হয় সুদীর্ঘ, অন্তহীন এই পথ পেরিয়ে যাব কি করে? এ থেকে প্রথম দিকে একটা আচ্ছন্ন ভাব আসে, তাতে সাবধান হতে হয়।

উৎসাহের আর এক নাম ব্যাকুলতা। রামকৃষ্ণদেব বলতেন "ব্যাকুলতা না এলে ঈশ্বরদর্শন হয় না"। এ কথাটাও কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ব্যাকুলতার ভিত্তি হবে প্রশান্তি। ব্যাকুলতা আসে কিন্তু অস্থিরতায় ও ছটফটানিতে সাধারণত সাধনশক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। প্রশান্তি ব্রহ্মের সদ্ভাব, তাকে ভিত্তি করে নিতেই হবে। এ প্রশান্তিকে ধরতে পারি কখন? প্রাচীন আচার্যেরা অতি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অধ্যাত্মসাধনার মূলে আছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাকুলতা এলে অন্তঃকরণের গভীরে প্রশান্তি ধরা পড়ে, মন ধীর হয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, একাগ্র হয়ে আসে। শ্রদ্ধা হল গোত্রান্তর। বৈষ্ণব-শাস্ত্রও বলেন 'আদৌ শ্রদ্ধা ততো রতিঃ'।

আভাসে যতক্ষণ তাঁকে অনুভব করেছি, রতি আসেনি। কিন্তু যখন ব্যাকুল হই, তাঁরই জন্য সব কিছু ত্যাগ করে অজানার বুকে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হই সেই সম্যক ব্যাকুলতাই শ্রদ্ধা। এটি বিচারে বা হিসাবে আসে না। শ্রদ্ধা প্রসাদ গুণ বা কালের দান। সত্যি সত্যি তাঁকে পাবার জন্য যোগ হলে তিনিই মনকে ঘুরিয়ে দেন। তখন দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না এও যেমন সত্য, তিনি স্বয়ং ছাড়া দরদীও সে সময় কেউ হতে পারে না, এও তেমন সত্য। শ্রদ্ধাই বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা। যা চাই, তা পাবই এটা আমার হক্—এই ভাব থাকা চাই। এই জোর শ্রদ্ধার অঙ্গ। এটা না থাকলে শ্রদ্ধা তামস হয়, এলিয়ে যায়। হাল ছেড়ে দেয়ার মত হতাশা ও নিরুদ্যম থেকে এক নির্বেদ উপস্থিত হয়। তা থেকে আর এক বিপদ এসে পড়ে। না যায় আগেকার জীবনে ফেরা, অথচ এক ছটফটানির রাজস ভাব নিয়ে ব্যাকুলতার আত্মপ্রসাদে এই অস্থিরতার মধ্যেই তাঁকে পাবার জন্য টেনে নামাতে গিয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী করা হয়। সে লোভ সামলাতে হবে। শ্রদ্ধার উন্মেষে ব্যাকুলতা প্রবল হয় অথচ ধৃতিশক্তিতে সেটা যুক্ত থাকে। তাতে জাগে সমনস্কতার শুচি দহন; এক মুহূর্তও তাঁকে ভুলতে পারি। ঐ সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাকুলতায় এক ঊর্ধ্বমুখী হোমবহ্নিশিখা। হৃদয়ের আকাশে আগুন ধরিয়ে দেয়। শ্রদ্ধার আবেশে পথে নেমেছি, তীরের মত ধনুকের ছিলা থেকে বেরিয়ে পড়েছি, কোন বাধাই আর কূলে ফেরাতে পারবে না। পথের হদিশ পাওয়া যায় বোধির আলোতে। নিমেষে নিমেষে আভাসে পথ দেখা যায় বিদ্যুৎ ঝলকের মত, যেন নিকষে-স্বর্ণরেখা। ক্রমে সংকল্প দৃঢ় হয়, ভাব গাঢ় হয়। ব্যাকুলতাও সংহত হয়ে আসে। মনের মায়া মোহিনী ও শতরূপা। তারা সব দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে অপরাজেয় অনিরুদ্ধ এক তীব্র সংবেগে পরিণত হয় শ্রদ্ধার শক্তিতে। তখন আর দেরী নাই। পতঞ্জলি যেমন বলেছেন—"তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ"।

দেখতে পেলাম ব্যাকুলতারও তিন রকমের অবস্থা। প্রথম একটা আনচান ভাব। তাতে যদি জোর না ধরে সেটা তামসিক। তারপর এক ছটফটানির ভাব আসে, সে চঞ্চলতা রাজসিক। এই দুই অবস্থার মিশ্রণ বহুদিন ধরে চলে। শাস্ত্র ও গুরু লাভ করে এই ব্যাকুলতা যেমন অনুকূলে যেতে পারে, তেমনি আবার ক্ষুদ্র অহংএর স্ফীতিতে প্রতিকূল হয়ে সাধন সম্পদ নষ্টও করে দিতে পারে। তৃতীয় অবস্থাকে সাত্ত্বিক ব্যাকুলতা বলতে পারি যখন আভাসে তাঁকে পাবার ধারণা দৃঢ় হয়। রজ ও তম গুণ অভিভূত হয়ে ব্যাকুলতার রূপান্তর হয় তখন ওই সংবেগে; সেটাই সত্যকার aspiration বা উৎসাহ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Psychic aspiration। চৈত্যসত্তার (Psychic Being) সিদ্ধ দৃষ্টি আছে, পরমের সঙ্গে আছে তার নিবিড় যোগ। প্রকৃতিতে প্রবল সংবেগ নিয়ে যে উর্ধ্বতন অভীপ্সা (aspiration), সেটা চৈত্যসত্তার (Psychic Being) ধর্ম। এইখানে তাকে পাবই এই দৃঢ় বিশ্বাস তার। তাই নিমেষে নিমেষে ওই যে পেয়ে হারানো আর অন্তর মথিত করে বিরহের আকুল রোদন এই তার ব্যাকুলতা। তাঁকে ভাল না বেসেও পারি না, এমনই তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ। তিনি কতভাবেই আসেন, ডাকেন—ধরেও তাঁকে ধরতে পারি না। চৈত্যপুরুষকে আধারে জাগানো শ্রীঅরবিন্দ-যোগের বড় কথা। চৈত্তসত্ত্ব জাগলে ব্যাকুলতা তখন পরিবর্তিত হবে তীব্র সংবেগে।

এইবার শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র হল সনাতন সেই সর্বশ্রুতিশিরোরত্ন বেদ যা প্রতিটি জীবের বুদ্ধিরূপ গুহায় গুহাহিত হয়ে আছে। সাধকের অন্তরে হৃৎকমলের দল যেন নিমীলিত। পূর্ণযোগের যোগসাধন শুরু হলে ওই কমলদল বোধির আলোয় ধীরে ধীরে যেন উন্মীলিত হতে থাকে। আর হার্দজ্যোতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওই সরোজকর্ণিকার অভ্যন্তরে সুপ্ত বেদজ্ঞান প্রতিভাত হয় সাধকের চিদাকাশে সূর্যোদয়ের মতই। সেজন্য শাস্ত্র কখনও সাধনা-বিচ্ছিন্ন হয় না। পূর্বেকার সিদ্ধ গুরুবর্গের সাধনার বাণীরূপের ধারক ও বাহক হল

শাস্ত্র। শাস্ত্রের একদিকে অনুশাসন আর অপরদিকে বাক্ বা মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দ যোগসমন্বয়ে বিশেষ করে অনুশাসনের দিক ও সাবিত্রী কাব্যে মন্ত্রের দিকটি বিশদভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

শাস্ত্রের অনুশাসন থেকে আমরা সাধনের পথ ও লক্ষ্যে পৌছানোর একটা ছক গড়ে নিতে পারি। তাতে সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে ধারণা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয় আর ব্যাকুলতার ছটফটানি শান্ত হয়ে আসে। পথ চলতে চলতে সত্য মিথ্যা বাছাই করে নিতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন কার্যকরী হয়, অনর্থক হয়রাণি ও হাতড়ে বেড়ানর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান, লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান—ওই সঙ্গে ওপারের জ্ঞান সমস্তটাই ধ্যানে ধরতে পারা প্রয়োজন। শাস্ত্রের আর এক কাজ হল যোগবিঘ্নগুলির সঙ্গে সাধকের পরিচয় করে দেওয়া। পথের বাঁকে-বাঁকে সমর ঘাঁটিগুলির উত্তরণের সঙ্কেত শাস্ত্র থেকেই পাওয়া যায় যখন সঙ্কট মুহূর্তগুলি এসে পড়ে। এ থেকেই আসে আত্ম-বিশ্লেষণের বা নিজকে দেখা ও যাচাই করে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা। পূর্বেকার শাস্ত্রাদিতে আত্মবিশ্লেষণ এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ও নিপুণভাবে করা হত না। শ্রীঅরবিন্দ অবচেতনার স্তরপরম্পরার একেবারে তল পর্যন্ত নেমে গিয়ে সমগ্র চেতনাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সব কিছুই প্রতি-ফলিত হচ্ছে আত্মার দর্পণে। যোগশাস্ত্রে বিশেষ করে আত্মবিশ্লেষণের পথকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ওপারের আলো আত্মদর্পণে যা কিছু দেখা প্রয়োজন তা দেখিয়ে দেবে। এই আত্মজ্ঞান বিশ্বেরই জ্ঞান—তা থেকে পথের হদিস ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা ক্রমে শুদ্ধ ও মার্জিত হবে। ধৃতিশক্তি যখন দৃঢ় হবে ও সব আড়াল খসিয়ে আত্মদর্শন হবে তখনই বলা যাবে, যা ওখানে তাই এখানে। শাস্ত্র সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে পূর্ণযোগের সাধক সর্বদা মুক্ত মন নিয়ে শাস্ত্রকে গ্রহণ করবে ব্যবহার করবে, কিন্তু বাঁধা পড়বে না কিছুতেই। আত্ম-বিশ্লেষণ ঠিকমত হলে তবেই পূর্ণযোগের

সাধক মুক্তচিত্ত হতে পারে। কেন না বহু শাস্ত্র আছে। তা থেকে রুচি ও প্রয়োজনমত বেছে ও বুঝে নিতে হবে। শাস্ত্র সম্বন্ধে পাটোয়ারী বুদ্ধি পেয়ে বসলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতায় আটকে গেলে শাস্ত্রীয় অনুশাসনও একটা ভারের মত চেপে বসে। এ যে নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে চলা। কোন বিধি নিষেধ তাতে নেই, কিন্তু তাবলে অধিকার সব সাধকের সমান নয়। সন্ন্যাস দেবার সময় যেমন আদেশ আছে 'শাস্ত্রযন্ত্রে যোজিত ছিলে, যোজনা ভেঙ্গে দিলাম। এবার মুক্ত হয়ে বিচরণ কর।'

কিন্তু এই মুক্তিরও প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে হয়। সবার অধিকার সমান নয়। পূর্ণযোগের উত্তম অধিকারী যে খুব কম তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম অধিকারী বোধিবৃত্তিতে আলোকিত পথের সবটাই একসঙ্গে দেখে নিতে পারেন এবং সত্যে অপ্রমত্ত থেকে নিজের মধ্যে পথের নিশানাও ঠিক মত ধরতে পারেন। মধ্যম অধিকারীও আছেন যাঁরা সব বুঝে এবং মেনে নিয়েও রুচিমত একটা সাধনপথ বেছে নেন। তাঁরা যুগপৎ সবটা দেখতে ও বুঝতে না পারলেও সবকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। অন্য সব অধিকারীরা তাদেরও নীচে,—বিক্ষিপ্ত প্রমত্ত ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। বেশীরভাগ সাধকই এই ভাব নিয়েই যোগ আরম্ভ করতে যায়। কিন্তু একদৃষ্টির ঝলকে সবটা দেখা সম্ভব না হলেও এ ব্যাপারে মনটা যেন মুক্ত থাকে। কেননা অধিকারও ক্রমশ বেড়ে যায় এও সত্য। অন্তর্মুখ হয়ে চলে চৈত্যপুরুষকে চিনে নিতে হবে, তখনই অন্দরের দ্বারগুলি খুলতে থাকবে। কোন শাস্ত্রেরই বহিরঙ্গগুলি যেন পেয়ে না বসে। আসল শাস্ত্র তো হৃদয়ের সনাতন বেদ, সে যে একান্তই প্রাণের বস্তু।

শাস্ত্রপাঠের নিশ্চিত প্রয়োজন আছে এবং সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে সেটা প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু এমন সময় আসে যখন সেই শাস্ত্রপাঠ মর্মে গ্রহণ করতে হয়। তারপর মরমীয়ার ভাব নিয়ে তাতে ধ্যানের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট

হতে হয় গভীরে, আরও গভীরে এক অনিবাধতায় বিপুল হয়ে যেতে-যেতে। এভাবে বহুশাস্ত্রপাঠ গুটিয়ে আসে স্বাধ্যায়ে, নিত্য অধ্যেয় স্বল্পাক্ষর শাস্ত্রে। তা মহাপুরুষের বাণীও হতে পারে, মন্ত্রজপও হতে পারে। যা-ই হোক্ না কেন, যে যা পেয়েছে তাতেই চিত্ত একাগ্র করতে হবে। অন্য সব শাস্ত্রও থাকবে তার বিভূতির মত। তখন বিভিন্নমতের শাস্ত্রবাক্য ও তার অনুশাসন শুনলেও তা থেকে সমন্বয়ের পথই দৃঢ় হবে, বিরুদ্ধ ভাব আসবে না। এইভাবে শাস্ত্র সংক্ষেপ হতে হতে শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় সব কিছু শ্রুতি ও স্মৃতি পর্যবসিত হয় দিব্যবাক্ রূপে। আর তখনই সাধকের গুহাগ্রন্থি বিদীর্ণ করে সমর্থ মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্র (Word) বা পরাবাক্ (Great Word) সম্বন্ধে 'যোগসমন্বয়ের' শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ Revelatory Speech বলে বাক্এর প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং সাবিত্রী মহাকাব্যে তার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মধ্যে তাঁর যে আবেশ তা প্রথম উৎসারিত হয় প্রথম স্পন্দরূপে। তাই মন্ত্রের স্ফুরণ (স্ফোট)। স্বরূপত তা একটা শক্তি মাত্র। সে শক্তি ঝলসে ওঠে মনোজ্যোতিতে। সে-জ্যোতি ভাবনায় গাঢ় এবং অবশেষে বাকে স্ফুরিত হয়। জপের সাধনা করলে এটি বুঝতে পারা যায়। এই মন্ত্রই তখন গুরু হয়ে দিশারী হয়ে আমার নিজেরই কোন নিভৃত কন্দর থেকে যেন অন্তরের সব কিছু আলো করে বেরিয়ে আসে। বাইরের শাস্ত্রের বন্ধন তখন খসে যায়।

যোগের সহায়

৬

গুরু ও কাল

এবার গুরুর কথা। গুরু সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে তিনি আমাদের মনের মানুষ। আমাদের প্রাণের মধ্যেই তাঁর আসল পরিচয়। তাই বাইরে যখন গুরু আসেন অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে, তখন তাঁকে দেখি আমারই অন্তরতম নেদিষ্ট যে ভাবরূপ, তারই মহান বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব কবির ভাষায় তখন বলি—"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির"। গুরুর সঙ্গে এই প্রাণের ও প্রেমের সম্পর্কটি প্রায়ই প্রথম দর্শনে ধরা পড়ে।

গুরুবাদ আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। উপনিষৎ আমাদের যে আচার্যের কথা শুনিয়েছেন, তিনি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। অন্তেবাসী শিষ্যের কাছে তিনি গূঢ়তম রহস্য ব্যক্ত করে দিচ্ছেন যেন এক লোকাত্তর আবেশে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শিষ্যকে সমিৎপাণি হয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। গুরুশিষ্যের এই অপূর্ব মিলনটি সংঘটিত না হলে তত্ত্বজ্ঞান ঠিকভাবে স্ফুরিত হবে না। এর পরিচয় উপনিষদের বহু আখ্যানে আমরা পাই। অধ্যাত্ম-সাধনার পথে গুরু যে অপরিহার্য এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল।

কিন্তু আধুনিক যুগে গুরুর আবশ্যকতা নিয়ে অনেক কারণে প্রশ্নও জেগেছে। এই নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা রবীন্দ্রনাথ নিজেই আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তাঁকেও আমরা "গুরুদেব" বানিয়ে ছেড়েছি। 'চতুরঙ্গে' খোলাখুলিভাবেই গুরুবাদ নিয়ে অনেক বিতর্ক তিনি তুলেছেন এই বলে,—যে গুরুর নয়, দেবতার পথই মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন "কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু, শুধাব না কোন পথিকে"। এইভাবে গুরু ও ইষ্টের মধ্যে এক বিরোধ রবীন্দ্রনাথ নিজেই সৃষ্টি

করেছেন। মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত মনে এ দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক নিয়মেই আসে যে ভগবানকে চাই, কিন্তু তার জন্য গুরুর দরকার আছে কিনা এবং নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করা ও মেনে চলা আদৌ সম্ভব কিনা। বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের দেশে নানা কারণে গুরুবাদ এক বিরাগ ও বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা ভিত্তিহীন কিনা সে সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু সমাধান বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তা করতে হলে গুরুর স্বরূপ শিষ্যের অধিকার এবং গুরুবাদই বা কি—এগুলি বিশ্লেষণ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ গুরু ও শিষ্য দুয়েরই বিচার করেছেন।

গুরুবাদের মত অধিকারবাদও প্রাচীন বিধি। প্রত্যেকের অধিকার ও সম্বন্ধ ভিন্ন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন "যার পেটে যেমন সয়"। ধর্মাচারণ সকলের সমান হতে পারে না। অধিকারভেদে অতি উত্তম অধিকারীর পক্ষে মানুষ-গুরুর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সত্য তার কাছে স্বপ্রকাশ। সে সব কিছু তার নিজের বা আত্মার ভিতর হতেই লাভ করে। বাহিরের কোন আলম্বনের প্রয়োজন তার নাও হতে পারে। মধ্যম অধিকারীর থাকে এক তীব্র ব্যাকুলতা। ছুঁই ছুঁই করেও যেন অন্তরের সত্যকে ঠিক ধরতে না পেরে সে খুঁজে বেড়ায় কিন্তু পথ ধরিয়ে দিলেই দেখতে ও বুঝতে শেখে। আর—অধমের পথ সুদীর্ঘ। তার আশ্রয় বা আলম্বন না হলে চলে না। তাকে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ সাধকই এই পর্যায়ের। কাজেই অধিকারভেদে গুরুর স্বরূপও তিন ভাবে বুঝে নিতে পারি। উত্তমের তত্ত্বরূপ গুরু, মাধ্যমের গুরু ভাবরূপ আর অধমের চাই বিগ্রহরূপ গুরু, এটা হল গোড়ার কথা। কিন্তু অধ্যাত্মজগতে এ ক্রমগুলির অদলবদল হয়। বিগ্রহের মধ্যেই তত্ত্ব ও ভাবের প্রকাশ ঘটে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রথম তত্ত্বরূপী জগদ্গুরুর কথাই বলছেন, পতঞ্জলি যাকে বলেছেন ঈশ্বরগুরু। গুরুবাদের দার্শনিক ভিত্তিও এতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরই

সকলের গুরু, যাঁকে কোনকালেই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক বা আশয় স্পর্শ করতে পারে না। কোন কালের দ্বারা ঈশ্বরগুরুকে পরিচ্ছন্ন করা যায় না—"স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"। কাজেই তাঁর গুরুগিরিতে কোন কালেই ছেদ পড়ে নি। আমরা ক্লেশ কর্ম বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে আছি। এ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাতে পৌছাব সেই তত্ত্বই গুরু। সেই লক্ষ্য, সেই আদর্শই ঈশ্বর—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।

ঈশ্বরই গুরু এই যখন বলা হয়, তখন সে যেন জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখা। আবার ভক্তির অঞ্জনে দেখে এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলা হয় যে, গুরুই তো ঈশ্বর। সেটা ভাবের কথা। ঈশ্বরগুরু বা জগদ্‌গুরুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। সেটা বুঝতে পারলে সেটাই হয় সত্যকার গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। পূর্ণযোগের সাধকের প্রাণের মধ্যে এই প্রজ্ঞার ও প্রেমের সম্পর্কটি অপরিহার্য-ভাবে গড়ে তুলতে হয়। গুরুশক্তি কোথা থেকে কি ভাবে উৎসারিত হয়, এ সম্বন্ধে এক স্পষ্ট উদার বোধ থাকা দরকার। পতঞ্জলি বলেন গুরু জীবকে উদ্ধার করেন, শিষ্যের স্বরূপ প্রাপ্তির সহায়ক তিনিই। এইভাবে গুরুতত্ত্ব যদি বুঝি তাহলে আমার সর্বাঙ্গীণ যে আদর্শবোধ সেই গুরু। ঠিক ঠিক এই বোধ হলে আমরা আর বিগ্রহে বাঁধা পড়ব না। বিগ্রহে গুরুকে পেলে তার মধ্যে তত্ত্বভাবটি যদি না দেখতে পারি, তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। বাহিরে যে গুরুকে বিগ্রহে পেলাম, তিনিই তো তাঁর ভাব দিয়ে বাণী দিয়ে শক্তি দিয়ে আমাকে পরম সত্যের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছেন। ঈশ্বর তো প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট হয়ে তাই করে চলেন। তাই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর তা-ই হল গুরুশক্তির কাছে পরিপূর্ণভাবে, নিঃশেষে নিজকে দিতে-দিতে একেবারে সব সঁপে দেওয়া।

কিন্তু এই জগদ্‌গুরু ঈশ্বর আমাকে কি ভাবে পরিচালিত করেন? প্রথমে

মনে হয় তাঁর রীতি-নীতি আমার কাছে অদৃষ্ট। তবুও নেপথ্যে তাঁর শক্তি কিন্তু কাজ করেই চলেছে। আমার মধ্যে পূর্ণ শরণাগতির ভাব থাকা চাই, সেইজন্য প্রয়াস ও প্রপত্তির তখন প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রপত্তির পথে আবার বাধা হয় আমাদেরই অহমিকা। আমার ভাব তখনও সীমিত, তাঁর মত করে তাঁকে না চেয়ে আমি যেন চাই আমার ঈশ্বরকে নির্বাচিত করতে। তাতে সাধ্য ও সাধনকে আনন্ত্যের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে খর্ব করে ফেলে নিজেকে ব্যাপ্ত না করে আবার পাকে-পাকে বেঁধে ফেলি—"আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।" তাই গোড়াতেই অহং-এর শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন, না হলে গুরু ঈশ্বরই হন আর মানুষই হন, তাঁর অনুশাসন বা দেশনা কিছুই তো বুঝতে পারব না। গীতা স্পষ্ট ভাষায় গুরুর নিকট হতে জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট উপায়টি সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন—

"তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

"যাঁরা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী তোমাকে তাঁর জ্ঞান উপদেশ করবেন। তার জন্য তোমার মধ্যে থাকবে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা।" নিজকে পুরোপুরি লুটিয়ে দিতে হবে সেখানে। যাই আসুক তোমাকে চাই, চাই-ই। এই ভাব নিয়ে যে শুরু করেছি, আর কিছু দিয়ে তো সে চাওয়া পূর্ণ হবে না। ওই ভাবে গুরুর কাছে পরিপূর্ণ আত্মদানে বাস্তবিকই জীবনে অঘটন ঘটে। গুরুশিষ্যের এ ভাব সর্বজনীন। কেননা মানুষে মানুষে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই গুরুর সমীপে যখনই জিজ্ঞাসা নিয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে যাই তখন নীরব হয়ে নম্র হয়ে যাব, চিত্ত উদার ও সরল করেই যাব। কেননা জাগ্রত চিত্তের যথাযথ প্রশ্নও থাকবে, সদ্‌গুরু তার মীমাংসা করে দেবেন। তারপর সেবা-বুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত এক মধুর সম্পর্কও গড়ে উঠবে। এই প্রপত্তির ভাব না থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই বড় কিছু পাওয়া যায় না।

এখন আমরা গুরুবাদ তর্কের দ্বারা সম্পাৎ করে দিলেও দলের গুরু, রাষ্ট্রগুরু এদের কাছে কিন্তু নতজানু হয়েই থাকি। তা থেকেই গোলামীর ভাব মনে আসে। কিন্তু ধর্মগুরুর সমীপে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা শিষ্যত্ব গোলামি নয়, এবং এতে লজ্জা বা অগৌরবের কিছু থাকতেই পারে না।

এইভাবে জগদ্‌গুরুর কাছে সবটাই সমর্পণ করে দিতে পারলে তিনি যখন আধারে আবিষ্ট হন, তখনই গুরুশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়। তখন তিনি চৈত্যগুরু বা অন্তর্যামী। রামকৃষ্ণদেব এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন যে, 'শুদ্ধ মনই গুরু। খানিকটা সাধন করলে কেউ এসে বলে দেবে কি করতে হবে।' অন্তরে থেকে যিনি নির্দেশ দেন তিনিই জগদ্‌গুরু। তত্ত্বরূপ হল তাঁর ভাবনার স্বরূপ আর সাধকের উপলব্ধি পরম ভাবভূমি। গুরুপ্রণামের সুন্দর একটি মন্ত্রে এর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

সদ্‌গুরু ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ। তিনি পরমসুখদ, কেবল জ্ঞানমূর্তিতে বিরাজিত। তিনি আকাশবৎ দ্বন্দ্বাতীত, নিত্য একল বিমল অচল থেকেও সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীপুরুষ। সমস্ত ভাবকে ছাপিয়ে ও তার ঊর্ধ্বে গুণাতীত তাঁর স্বভাব। সেই তাঁকেই আমি নমস্কার করি।" এই মন্ত্রটি বিগ্রহবান মানুষীতনুধারা জগদ্‌গুরু সম্বন্ধেও প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে যদি মানুষগুরুর মধ্যে ঠিক ঠিক জগদ্‌গুরুকে দেখে বন্দনা করতে পারি, তবেই না গুরুকরণ সিদ্ধ হবে। উত্তম যার অধিকার তার এই পথে গুরু আর ঈশ্বরে তো কোনও ভেদ থাকে না। তার কাছে গুরুই যেমন ঈশ্বর, তেমন ঈশ্বরই গুরু স্বয়ং।

আবার যে মধ্যম অধিকারীরা ভাবকে আশ্রয় করে চলেন, তাঁদের ভাবরূপই

হল ইষ্ট এবং সেটাই সেখানে প্রধান। গুরুকে তাঁরা আশ্রয় করেন ইষ্টলাভের জন্য। কিন্তু ইষ্ট গুরু ঈশ্বর তিনকে সমভাবে নিয়ে যে খাঁটি মূলভাব, সেই নিয়ে চলতে পারলে ওই উত্তম ভাবগুলি সবই ঠিক ঠিক মিলে যাবে। আর একটি কথা। যেমন বিগ্রহবান্ মানুষীতনুধারী গুরু লাভ হয়, তেমনি ভাবের বিগ্রহধারী গুরুও লাভ হতে পারে। এঁদের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দুই ধারায় চিহ্নিত করতে পারা যায়। এদেশে রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই তিনটি নামই ঐতিহাসিক গুরুবর্গের ধারায় প্রধান স্থান গ্রহণ করে। পৌরাণিক ধারায় কালী, দুর্গা, শিব গুরু। এঁরা সবাই যেমন বিশ্বতত্ত্ব এবং শুদ্ধভাবাশ্রিত, তেমনি ভাবময় বিগ্রহও ধারণ করেন। ধ্যানে ভাব জমাট বেঁধে রূপ ধরে। এদেশের দেববিগ্রহগুলি সব তত্ত্বমূর্তি। ঐতিহাসিক গুরু বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, তাঁদেরও ভাবরূপ ইষ্টদেবতারূপে বিগ্রহে ভজনা করা হয়ে থাকে। যে-ভাববিগ্রহ বাইরে আমার সম্মুখে, তা-ই আমার হৃদয়ের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব শুদ্ধ হলে তা থেকে তত্ত্ব স্ফুরিত হয়।

কিন্তু তত্ত্বই হোক আর ভাবই হোক, এসবই লোকস্তরের আবেশজনিত এক অতীন্দ্রিয় বস্তু। মাটির মানুষ আমরা, তাই ইন্দ্রিয় দিয়েও তো তাঁকে পেতে চাই মানুষের মত করে। মানুষের মধ্যে মাটিতেও তাঁর আশ্রয় চাই। শৈশবে মায়ের ভালবাসা আর পিতার মহিমা আমার কাছে ছিল বিগ্রহবান গুরুই মতই। তেমনি করে ভাব ও তত্ত্বকে পুরুষবিগ্রহে বা মানুষী তনুতে চাইলে সেটা তো অযৌক্তিক বলতে পারি না। এটাই বর্তমান যুগে গুরুবাদের মূল কথা। মানুষের অন্তরে যেমন এই চাহিদা আছে, এর ফলিত দিকের এক গভীর সার্থকতাও তেমন আছে মানুষের জীবনে। তাই যখন মাটির মানুষের গুরুকে দর্শন করি সে ভাবের তো কোন তুলনা হয় না। জীবনে সে এক শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব। তাঁর সঙ্গে শুদ্ধ এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, জীবন উজ্জ্বল ও মধুর হয়। ভাবে ও রূপে আর দ্বন্দ্ব থাকে না। পরম প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে প্রাণ ভরে

ওঠে। কিন্তু ভাবে ও রূপে ভারসাম্যটা সকলে ঠিক মত রাখতে পারে না। প্রাণের উত্তালতায় শুদ্ধ অশুদ্ধ দুই ভাবের সংমিশ্রণে সাধনপথের অনেকদূর পর্যন্ত একদিকে ঝোঁক পড়ে গোলমাল পাকিয়ে গেল এমনও হয়। গীতা ও ভাগবত এজন্য বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতম্—, মানবীয় তনুধারী আমাকে না জেনে যারা অবজ্ঞা করে তারা মূঢ়। তারা সর্বভূতের মহেশ্বর পরম সত্তাকে জানতে পারে না, দেখতেও পায় না।" গুরুবিগ্রহ সম্বন্ধে এটাই সার কথা। এই সর্বভূত মহেশ্বর বা ঈশ্বরের তিনটি ভাব—অব্যক্ত পরমভাব, বিশ্বাত্মক ভূতমহেশ্বর ভাব আর মানুষী তনুতে বিগ্রহভাব। কাজেই যারা মানুষী তনুটিকেই শুধু আঁকড়ে ধরে, তাদের পথ কখনও পূর্ণতায় নিয়ে যায় না। পরম পুরুষের বিগ্রহের পিছনে universal (বিশ্বাত্মক) ও transcendent (লোকত্তর)-কে জানতে হবে। গুরুতে এটি দেখে বুঝে নিতে না পারলেই দ্বৈতের সৃষ্টি হয়, দ্বিধা ও সংশয় এসে দেখা দেয়। আবার ভাগবত অপরূপ সেই পরমপুরুষের রূপ দেখিয়েও আমাদের বারবার নিয়ে গেছেন অরূপের ব্যঞ্জনায়, যেন তাঁকে আমরা কখনও না ভুলি। কিন্তু শুধু দুর্দর্শ অরূপকে নিয়ে কঠিন পথে যেন চলতে না চাই। কেননা অরূপেরই তো রূপ।

শ্রীঅরবিন্দ গুরু ও শিষ্য উভয় সম্পর্ককেই সাবধান করে দিয়ে বলছেন, পূর্ণযোগের সাধককে মন মুক্ত রাখতে হবে। গুরুগীতায় পেয়েছি—"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ—আমার ইষ্ট সবারই ইষ্ট, আমার গুরুই সবার গুরু।" একথাটা আওড়ানো সহজ। কিন্তু তারপরেই আছে, "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"। একথাটিরও গুরুত্ব ওইসঙ্গে না বুঝলেই সর্বনাশ। ইষ্ট বা গুরুকে অহংএর গণ্ডিতে ছোট করে পুরে রাখতে চাই ; তাও কি হয় ? আমার এই ক্ষুদ্র, অহংবা কাঁচা আমির দ্বৈতবুদ্ধি গলে গিয়ে আত্মচৈতন্যে সবার মধ্যে একত্ব অনুভব করলে পর বোঝা যাবে আমার প্রভুই জগতের নাথ, আমার

গুরুই সবার গুরু। এটা গভীরের অনুভূতির বাণী, বাহিরের প্রচারের বিষয় নয়। জোর করে প্রচার করতে গেলে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেটা তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় হতে পারে না।

শিষ্যকে এ বিষয়ে যেমন সর্বদা সচেতন থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি গুরুসম্পর্কেও কয়েকটি লক্ষণ শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন—অনুশাসন, আচরণ ও সবচেয়ে বড় কথা আবেশ বা শক্তিসঞ্চার। আচরণ ও অনুশাসন অপেক্ষাও শেষেরটি গভীর স্তরের কার্যকরী শক্তি।

গুরুর বাণীই তার অনুশাসন। কিন্তু সম্প্রদায় পরম্পরায় ওই বাণী গ্রহণ করার মত প্রস্তুত না হয়েই আমরা পেয়ে যাই। তা থেকেও অনেক বিরোধ ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। মহাপুরুষের বাণী নিয়ে আমাদের মতুয়ার বুদ্ধি সাম্প্রদায়িক গোড়ামিতে আটকে গিয়ে কত যে ঝামেলায় পড়ে তা আর বলার নয়। আসল কথা, যে ভাবেই চলি না কেন, আমাদের লক্ষ্য যে ওই বৃহৎ অসীম অনন্তের দিকে, সেটা ভুললে চলবে না। তাই অনুশাসন দিয়ে গুরুশক্তিতেই নিজেকে যখন বাঁধব মনে করি, তখন মন যেন মুক্ত থাকে, কেন না সে শক্তিও যে সমুদ্রগামী। এই প্রসঙ্গে পুষ্পদন্তের বহুপ্রচলিত শ্লোকটি স্মরণীয়—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। সব মানুষই নিজের রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী, সরল ও বাঁকা নানা রকম পথ ধরে চলে। তবুও নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, 'তুমি'ই সেই সকলের একমাত্র গন্তব্য।" এসব শাস্ত্রীয় কথা খুবই গভীর এবং বোঝেনও অনেকেই, তবুও কার্যত এটা যেন ঠিকমত সবসময় করা হয় না।

আমাদের দেশে বহু সম্প্রদায়। কিন্তু সব সম্প্রদায়ের আচার্যই প্রস্থানত্রয়ীর দার্শনিক রূপে এক ব্রহ্মের কথাই বলেছেন। যেমন শাক্ত বৈষ্ণব ও শৈব যথাক্রমে শক্তি, নারায়ণ ও শিবকেই পরমদেবতা মনে করেন। কিন্তু

সেখানেও ইষ্টদেবতা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই। ইষ্টের নানারূপ যাই থাকুক, তাকে ধরে যেতে হবে সেই একদেবে বা একতত্ত্বে—অসীম অনন্ত সমুদ্রের মতই যা অতল গভীর প্রশান্ত এক অনির্বচনীয় একরস প্রত্যয়ের বোধ। এ-বুদ্ধিযোগ গুরুর অনুশাসন থেকেই পেতে হবে।

আবার শাস্ত্রের যান্ত্রিকতায় বাঁধা না পড়তে হয়, সেদিকে বুদ্ধিকে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য এও সত্য যে একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রবাণীকে স্বাধ্যায় করে না চললেও তো হবে না। সব কিছুর মধ্যে নাক গলাতে গেলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। সেজন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথমে একটাকেই দৃঢ় করে ধরতে হয়। এ দেশের উদার শাস্ত্র গীতা, ভাগবত ও উপনিষৎগুলি আশ্রয় করে চললে শাশ্বত সনাতন পথের সন্ধান মেলে এবং অন্য পক্ষের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিরোধ থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনও তাঁর গীতাভাষ্য এবং বেদউপনিষদের মন্ত্রবাণী থেকেই আরম্ভ করতে হয়। সম্প্রদায়-প্রবর্তকেরা সকলেই শ্রুতি ও গীতা অনুসরণ করে চলেছেন। তাই অতীতের সঙ্গে সংযোগ রেখে সর্বকালীন ও সর্বজনীন দর্শন আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই লাভ করব, যা আমাদের ধারণাকে সেই মূলে নিয়ে যেতে পারবে "যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী—" যেখান থেকে চিরন্তনী প্রবৃত্তিসমূহ প্রসৃত হয়ে আসছে। এমন করে প্রয়োজন বুঝে রুচিমত স্বাধ্যায় নির্বাচন করে তাতে নিবিষ্ট হতে পারলে চিত্তের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য লাভ হয়। সব শাস্ত্র ও সম্প্রদায় যে মূলতঃ এক কথাই বলছেন, সেটা তখন বুঝতে পারা যায়। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য বেড়া বাঁধার কাজে প্রথমে লেগে থাকতে হয়। কিন্তু চিত্ত মুক্ত থাকলে ফসল ফললে বেড়ার বাঁধন আপনিই খসে যায়। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র তখন একাকার হয়ে যায়। সেই ইষ্টই সাক্ষাৎ জগদ্‌গুরু ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই শিষ্যের অন্তরে আবির্ভূত, তার সকল কর্ম, জ্ঞান, সংবেদন ওই বোধেই অনুভূত। এই শক্তি ও বীর্য শিষ্য লাভ করে গুরুর অনুশাসন থেকেই।

তারপর গুরুর আচরণ। গুরুর এই এক দায়িত্ব। শুধু বাণী নয়, তাঁর জীবনই তাঁর চরম অনুশাসন। চৈতন্যদেব যেমন রাধাপ্রেমের ফলিত রূপটি তাঁর জীবন কাব্যে অপরূপ করে ঢেলে দিয়ে দেখিয়ে গেলেন—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" গুরুকে শুধু বিচারে নয় আচারেও শিষ্যের সমভূমিতে নেমে আসতে হয়। সাধারণত গুরু এটা সহজে করেন না, শিষ্যেরাও সেটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বিবেকানন্দকে দেখেছি অমরনাথ যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরই সমভূমিতে নেমে ধর্মাচরণ করছেন, একাত্ম হয়ে গেছেন সর্বভূতের সঙ্গে। গীতায় এই কথাটাই অন্য ভাবে আছে, 'জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান, যুক্ত সমাচরণ'—যিনি বিদ্বান, পরম তত্ত্বকে যিনি জেনেছেন, তিনি যুক্ত থেকেও অবিদ্বানের সঙ্গে মিলে তাঁর আচরণ দিয়ে তাদের কর্মে রস যোগাবেন। গুরু শিষ্যের মধ্যে এ ভাবেই নেমে আসেন, তাদের অবিদ্যাশ্রিত ভাবে ও কর্মে তাঁর বিদ্যার আলো এসে পড়ে তাকে পরিশোধিত ও মার্জিত করে। এটার শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

এর পরের কথাটাই আসল—শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন Influence বা শক্তিসঞ্চার। গুরুর মাঝে আছে এক দিব্য প্রেরণা, তিনি যা পেয়েছেন তা জগৎকে দিয়ে দিতে হবে। রামকৃষ্ণদেব চাপরাশ পাবার কথা বলেছে, সেই অধিকারটি চাই। নাহলে সামান্য শক্তি লাভ করে দেবার জন্য ছট্ ফটি, সে এক সিদ্ধাই। তা হল গুরুতত্ত্বের অপব্যবহার। কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেখি জগৎকে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে নির্বাণের সত্য অধিকার করেও করুণায় অভিভূত! তাঁর যেন দ্বিধা—এ বস্তু কি দেব, না দেব না? অবিদ্যাচ্ছন্ন জগতের মূঢ়তা ও ঘোরস্বভাব তাঁর জানা ছিল; জগৎ কি তাঁর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করতে পারবে? Mother-এর ধ্যানবাণীতে আমরা এই রকম এক গভীর উচ্ছল শুদ্ধতার পরিচয় ও ওই প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের বাণী শুনেছি। সেই রকম পরম করুণায় নির্গলিত অনন্ত সুধাঝরি উজাড় করে

ঢেলে দেওয়া, স্তব্ধ থেকে নৈঃশব্দ্যের ঘনীভূত শক্তিকে নামিয়ে এনে আবার মৌনী শান্ত থেকেই ওই শক্তিকে নিঃশেষে বিচ্ছুরিত করা, এর প্রভাব অমোঘ। কোন কালে এর ক্ষয় নেই। প্রাচীনকালের দক্ষিণামূর্তি গুরুস্তোত্রে এই গুরুশক্তির আবেশের এক অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য বলছেন—

'চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধা শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ।।'

এ এক আশ্চর্য যে বটতরুমূলে যুবা গুরু বৃদ্ধ শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে সমাসীন, তিনি মৌনী। কিন্তু শিষ্যগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসার সব কিছুর উত্তর লাভ করে সংশয়মুক্ত। মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিত পরব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দক্ষিণামূর্তি গুরুর পরমশক্তিবিকিরণের এক শ্রেষ্ঠ উপায়—এই তত্ত্ব আমরা এই চিত্র থেকে পেয়েছি। নীরব ও শান্ত থেকে শুধু অস্তিত্বের দ্বারা এক পরম দিব্য আবেশকে সঞ্চারিত করা, তা থেকে শিষ্যের বীর্যলাভ ঠিকমত হলে প্রচার ও প্রসার আপনা থেকেই হবে। কোন বিরোধী শক্তির সাধ্য নেই তাকে রুদ্ধ করে রাখতে পারে। শিবশক্তি তখন একাকার। দেবীসূক্তে দেবী যেমন বলেছেন 'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা'—সেই অবস্থা। ঝঞ্ঝাবর্তের প্রবল বেগে বয়ে চলেছে সেই শক্তিকূট, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র। সে শক্তি বিধৃত এক পরম বিরাট ভাবের মহিমায়। গুরুর গুরুত্ব ক্ষীণ হয়ে যায় সেই বিরাট ভাবে—এই গুরুশক্তি, উচ্ছ্বসিত বেগবান তার গতি। গুরুশক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সাধকের জীবনে এমনও দেখা যায় যে মনে হয় সব কিছু পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু এমনও বলা যায় যে অনেক জীবনের অসিদ্ধি, পরাভব, দুর্গতির ভিতর দিয়েই তিনি সাধককে অগ্রসর করে নেন। আমরা প্রথমে সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না কিন্তু সদ্গুরু সেটা জানেন। গুরুর সঙ্গে অন্তরের যোগটি নিবিড় হলে তবে তাঁর এই মহিমা বোঝা যায়। এই গুরুর ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে গুরুর করণীয় কিছু বলতে হয়। গুরু হলেন প্রতিভূ, বালকস্বভাব, সখা। তিনি পরম সত্যকে কখনই আড়াল করবেন না। তাঁর স্বচ্ছতায় ঈশ্বরের প্রকাশ, এই ভাবটি খাঁটি থাকা চাই। তিনিও ঈশ্বরের কাছে প্রপন্ন মানুষ ভাবে এবং তা থেকেই পূর্ণ প্রজ্ঞা বিচ্ছুরিত—এই তাঁর ভাব। রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু হয়েও বলতেন—'এ তিনে আমি নেই, কর্তা, বাবা, গুরু'। এই ভাব ধরে যিনি থাকেন তিনিই পূর্ণ, তিনিই গুরু।

এইবার সর্বশেষে আসে কালের কথা। আমাদের যত ঝামেলা বাধে এই কাল বা সময়কে না বুঝতে পেরে। সাধনা আরম্ভ করে সিদ্ধির জন্য সময়ের অপেক্ষা করার ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্বেই বলা আছে যে সমগ্র প্রকৃতিতে যোগ চলেছে। কাজেই কিছু করতে পার আর না পার—স্রোতে যখন ভেসেছ, সমুদ্রে পড়বেই। এ তো জানা কথা। কিন্তু সচেতন সমনস্ক থাকলে তো যোগ। আকৃতির সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাভ করলে কালকে আমরা সংক্ষিপ্ত করতে প্রয়াসী হতে পারি। আত্মসমর্পণের সঙ্গে এই প্রয়াসও থাকা চাই—now and here; আবার কালের প্রতীক্ষা করতে জানা চাই। সমর্পণ করা বলা যত সহজ করা তত নয়। তাঁর প্রসাদ আর আমার প্রয়াস—তিনি যত এগিয়ে আসেন—আমার দেওয়াও তত সহজ হয়ে আসে। এ এক সদাজাগ্রত প্রচেষ্টা। তোমারই আকর্ষণে চলেছি, সময় হলেই তুমি আমায় একেবারে নিয়ে নেবে, তবেই না তোমাকে পাব। সেই পরমলগ্নটি কবে আসবে, যখন তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যাবে। এই ব্যাকুলতা নিয়ে জেগে আছি। কাল যে কখন দ্রুত আর কখন বিলম্বিত—তা বোঝবার উপায় নেই। কখনও দীর্ঘকাল সাধনার পরে চকিতে যেন পরমলগ্নটি দেখা দেয়। আবার কখনও না চাইতেই তার আবির্ভাব আমার সব কিছু ভাসিয়ে রিক্ত করে নিয়ে আবার যেন হারিয়ে যায়। সাধনার একাগ্রতায় চেতনা স্বচ্ছ হয়ে আসে এবং তাতে বাধার গুরুত্ব লঘু হয়ে যায়। তিনি বরণ করেছেন

বলেই যে আমার ব্যাকুলতা—এইটা বুঝলেই কালের যাত্রা শুরু হল প্রথম পর্বে। তারপরই বাধার সৃষ্টি হতে থাকে। বাধা যত প্রবল হবে, ততই তার সঙ্গে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—এই দৃঢ়সংকল্প চাই। মনমরা ভাব থাকলে বা হতাশ হলে চলবে না। বাধাকে যখন কিছুতেই হটাতে না পারি তখন দোষ দিই কালের; ভাবি ও বলি, কালই আমার বাদী। সামনে এক দুস্তর সমুদ্র, ঝিনুক দিয়ে জল ছেঁচে সেই সমুদ্র পার হতে হবে। এমন অবস্থায় চাই অসীম ধৈর্য। কিছুতেই হার না মেনে, পিছু হটে না গিয়ে, নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থেকে পার হবার চেষ্টা করা, সেটাই বীর্যের পরিচয়। কালের সঙ্গে এই সংগ্রামে তাকে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি আহ্বান জানাতে হবে, যতই সেটা দীর্ঘ হক না কেন। তাতেই কাল সংক্ষিপ্ত হয়, প্রকৃতির এই নিয়ম। পতঞ্জলির সেই যোগসূত্র "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ"—তীব্র সংবেগেই বাধা ক্ষীণ হতে থাকে। অনেকদিন হয়তো সংগ্রাম চালাতে হয়, কেননা বাধার অধিকাংশই যে কুণ্ডলীপাকানো অহংএর সৃষ্টি, এটা সহজে বোধগম্য হয় না। বাধাকে আরও জটিল করি নিজেরই রচিত এক মিথ্যা অহঙ্কারের পাকে-পাকে তাকে জড়িয়ে রেখে—এই এক বিড়ম্বনা। তিনি যে সঙ্গে রয়েছেন, ওই মিথ্যা প্রাচীরটা ভেঙে দেবেন তাঁরই শক্তিতে, এটা কার্যত বুঝতে চাই না, সে প্রার্থনা নেই। গুরুশক্তিকে যেন ভিতরে প্রবেশ করতেই দিতে চাই না। এর জন্য চাই একাগ্রতায় শ্রদ্ধার আবেশ। শ্রদ্ধাই ওই তীব্র সংবেগ এনে দেবে। তখন তো আর কিছু করার নেই, তাঁরই নাম নিয়ে দুস্তর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, হাতের ঝিনুক ফেলে দিয়ে। এতেই কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে, ওদিকের বেগও বেড়ে যায়। কখন যে অকূলের টানে বাধার মূলও উৎপাটিত হয়ে যায়, সহসা বোঝাও যায় না। Christian Mystic-রা একটা উদাহরণ দিয়ে থাকেন—সমস্ত সাধনা দিয়ে যেন এক বিরাট জগদ্দল পাথরকে খাড়া করে উল্টে দিতে হবে, এই হল কাল যখন আমার বাদী

তখনকার প্রচেষ্টা। তাতে হার না মেনে সমস্ত শক্তি একাগ্র করে ওই পাথরকেই তুলতে চেষ্টা করতে হবে। শক্তির এই সাধনায় প্রবল বাধাই শেষ পর্যন্ত পরম সহায় হয়ে দাঁড়ায় কালের প্রসাদে। কালের যাত্রা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে দুরকম ভক্তের সাক্ষাৎকারের সুপ্রচলিত গল্পটি মনে রাখা ভালো। জ্ঞানী ও তপস্বী হয়েও ভগবৎপ্রাপ্তি হতে আরও তিন জন্ম লাগবে, নারদের মুখে এই কথা শুনে ভক্তটির ধৈর্য ও আশা ভগ্ন হয়ে গেল। অপরদিকে এক পাগলা ভক্ত নারদের মুখে শুনল যে তার ভগবৎসাক্ষাৎকারের সময় হবে এক তেঁতুলগাছের যত পাতা তত জন্ম হবার পরে। তাতেই তার উল্লাস ও নৃত্য, কেননা সে নিশ্চিন্ত হল যে একদিন দুস্তর কাল পেরিয়ে তাঁকে সে পাবেই। এই ভাবে খুসী হয়ে কালকে নিতে হবে। চাই বিশ্বাস আর তাঁকে ভালবাসার জোর—সেটাই হিম্মৎ। আমি দাঁড় বেয়ে চলেছি কিন্তু হাল ধরে আছেন যে তিনিই স্বয়ং—পুরোভাগে তিনিই কর্ণধার। তাহলে আর ভাবনা কি? এই মনোবৃত্তির অনুশীলনটি চাই।

তাহলে আমরা সাধনসম্পদের মধ্যে পেলাম যে প্রথমেই থাকা চাই উৎসাহ। তারপর পথের খবর ভাল করে জানতে হবে; সেই শক্তি ও জ্ঞান দেবেন শাস্ত্র। আর পথের দিশারী-গুরু লাভ করে চাই কালের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিজয়ী হবার বীর্য।

আত্মোৎসর্গ

পূর্ণযোগের সাধন তো সহায়চতুষ্টয় নিয়ে শুরু করা গেল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার শুনলাম নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে দেওয়ার কথা। সেই আত্মোৎসর্গ বলতে কি বুঝব তা আলোচনা করে দেখা এখন আবশ্যক।

আত্মোৎসর্গ (Self-consecration) হল সমর্পণের দীক্ষা। এতে দুটি ভাবের সমন্বয় আছে; আত্মবলি বা ত্যাগের কথা এক্ষেত্রে যেমন আসে তেমনই তাঁর প্রসাদের অমোঘ শক্তি বা তাঁকে পাওয়ার কথাও এসে পড়ে। আমি একান্তভাবে তাঁতেই উৎসৃষ্ট, তাঁরই হয়ে গেলাম—এটা যখন হল, তখন দেখি তাঁর দিক থেকে বিচ্ছুরিত প্রসাদ আমাকে ভরিয়ে উপচে পড়ছে। এই পরম প্রাপ্তিকে স্বীকার করতেই হবে। এক কথায় এই অবস্থার পরিচয় হল দীক্ষা।

বৈদিক যুগ থেকেই দীক্ষা প্রচলিত। যজ্ঞে দীক্ষা নিতে হত। দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে সমস্ত জীবনকালব্যাপী সেই পথ ধরে চলা, একেই বলা যায় যোগ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার অর্থ হল অতীতের সব সংস্কার দহন করে এক নবজন্মে ভূমিষ্ঠ হওয়া। প্রাকৃত চেতনার শেষ পর্যন্ত রূপান্তর ঘটে দীক্ষালাভের ফলে। তাই দীক্ষা হল দ্বিজত্ব বা গোত্রান্তর। প্রাকৃত জীবন তো পশুজীবনেরই এক উন্নততর আবর্তন মাত্র। পরম সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েও তার চলার বেগ নীচের দিকে বা একান্তভাবেই বহির্মুখ। আর যোগজীবনের দীক্ষা এই মানুষকেই এক নবজীবনের প্রবেশদ্বারে এনে উপস্থিত করে। তখন চারিদিক খুলে গিয়ে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই নব-জীবনের দীক্ষায় মানুষের গোত্রান্তর হয়, প্রাকৃত জীবনে সে আর ফিরে যেতে পারে না—মেয়েরা যেমন বিবাহের ফলে স্বামীর গোত্র হয়ে যায় আর পিতার

গোত্রে তাদের স্থান থাকে না। তাই বৌদ্ধেরা দীক্ষাকে বলতেন "গোত্রভূ" হওয়া। দীক্ষার পর তুমি হলে 'বুদ্ধগোত্র', তোমার 'পৃথক গোত্র' আর থাকল না।

এখন আমরা দীক্ষা বলতে সাধারণতঃ মান্ত্রী দীক্ষাই বুঝে থাকি। সাধারণের মধ্যে এ বিশ্বাস আজও প্রচলিত যে, কোন একটি বীজমন্ত্র গুরুমুখে শ্রবণ করলে পরে দীক্ষা হয়। কিন্তু এ ছাড়াও দীক্ষা আছে। কেননা যে পর্যন্ত না শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, দীক্ষাও ঠিকমত হয় না, গোত্রান্তরও হতে পারে না। তাহলে শ্রদ্ধাকে কি উৎপন্ন করা যায়? আমরা আগে বৈদিক ধারণার কথা আলোচনা করেছি যে ঠিক সময় এলে শ্রদ্ধার আবেশ হয়। এ হল গভীরের ভাব, প্রাণের কথা। হৃদয়ের ব্যাকুলতায় তাঁর প্রসাদ লাভ হয় কালের আহ্বানে। সেটা কখন আসে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। দীক্ষারও তাহলে একটা সময় আছে, সেই বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এমন বিশ্বাসও ছিল যে প্রচেষ্টা দিয়ে শ্রদ্ধাকে আধারে জাগানো সম্ভব হয়। এ তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য। অশ্বঘোষের 'শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্রে' এর পরিচয় আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক সময় দেখা যায় যে ভোগজীবনে মানুষের বিতৃষ্ণা আসে, মন ঘুরে যায়। একে বলে ভুক্তবৈরাগ্য। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে ছোট ছেলে চুষিকাঠি নিয়ে খেলায় ভুলে থাকে। হঠাৎ সব ফেলে দিয়ে বলে "মা যাব"। এরকম ভাবে আপনা থেকে সময় এসে গেল এও হয়। কিন্তু তা ছাড়াও নিজের চেষ্টার প্রয়োজন আছে। যখন দেখা যায় অন্তরে অস্ফুট আকুলতা ও অস্থির-ভাব, যা নিয়েছিলাম তাই দিয়ে আর বাঁচতে পারি না তখন জিজ্ঞাসা জাগে। বুদ্ধিকে সজাগ রেখে তারই সাহায্যে অগ্রসর হতে হয়। সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ এসব ভাল লাগে আর সেই নিয়ে চলা শুরু করে খানিকটা প্রস্তুতি এল, তখনই হঠাৎ সব আলো করে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই বিস্ময়কর পরম আবির্ভাবে সমস্ত সত্তা জারিত হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথাটি—হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটি মাত্র দেশলাইএর কাঠি দিয়ে কে যেন আলো জ্বেলে দিল। এই শক্তিপাত তাঁরই অনুগ্রহ শক্তি বা প্রসাদ (Grace)। দীক্ষার উৎকৃষ্ট লক্ষণ হল এই। যে তাঁকে চেয়েছে, তাকে তিনি স্বয়ং এসে বরণ করে নিলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

তন্ত্রে তিন রকম দীক্ষার কথা আছে, মান্ত্রী শাক্তী ও শাম্ভবী। অনেক সময় কোন মহাপুরুষ দর্শন করে বা তাঁর কথা শুনেই খানিকটা গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে মান্ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু শাক্তীদীক্ষা আবার এমনও হয় যে যাঁর কাছে দীক্ষিত তাঁর সঙ্গে চোখের দেখাও হল না। শুধু তাঁর কথা কানে শুনেই সমগ্র চিত্ত উন্মত হয়ে উঠল, আর তখনই তাঁর দিক থেকে এক শুচি শুভ্র শক্তিকিরণ এসে আমাকে বিদ্ধ করে দিল। আমি তাঁর নাম শুনেই তাঁর হয়ে গেলাম। এরকম শক্তিসম্পাতকেও দীক্ষা বলা যায়। সর্বোৎকৃষ্ট দীক্ষার নাম শাম্ভবী দীক্ষা। বলা হয় যে স্বয়ং শিব গুরু হয়ে এসে দীক্ষা দেন আর সাধকের মধ্যে এক অঘটন সংঘটিত হয়, তার আমূল রূপান্তর শুরু হয়। দিগন্তব্যাপী আলোর প্লাবনে সব ভেসে গেল। দর্শন, স্পর্শ, মন্ত্র বা মহাকাব্য-শ্রবণ ইত্যাদির যে কোন একটি উপলক্ষ্য হয়ে সাধকের একেবারেই গ্রন্থিভেদ হয়ে গেল। গোত্রান্তর হতে আর সময় লাগল না। বলা বাহুল্য এরকম অধিকারীর সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প—তাঁরা নির্বাচিত হয়েই আসেন। কিন্তু মান্ত্রী শাক্তী যাই হক না কেন, তা শাম্ভবী দীক্ষার পরিণাম শেষ পর্যন্ত সাধককে নিয়ে যাবে, না হলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হল না। উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে "বিদ্যুতো ব্যদ্যুতৎ আ ; ন্যমীমিষৎ আ।" সেই রকম এই আদেশ বা দীক্ষা একেবারে বিদ্যুৎ চমকের মত চোখের নিমেষে অতিক্ষিপ্রবেগ সঞ্চারী আলোয় সবটা যেন উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেল। বোধিদীপ্ত এই আধারে নিষণ্ণ চৈত্যগুরু তখন উন্মেষিত হতে থাকেন। এই চৈত্যগুরুর পূর্ণরূপই জগদ্‌গুরু।

তাই এই পর্যন্ত হলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তখন মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুর অভ্রান্ত নির্দেশে মদাত্মা সর্বভূতাত্মা হয়ে বিচরণ করার আর কোন বাধা থাকে না।

দীক্ষালাভের জন্য সাধারণ মানুষকে অনেক সময় যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। বাহির থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে ঠিকমত শক্তিলাভের চেষ্টায় তিলকে তাল করার মত অসীম ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকলে শাক্তীদীক্ষা হয় এবং পরে সেটা শাম্ভবীতে পৌঁছেও দেয়। তখন তো শুধু তাঁতে উৎসৃষ্ট হয়েই চলা—তাই তাঁর সঙ্গে নিত্যযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে সাধককে তাঁর দিকে নিয়ে চলে। বীজমন্ত্র না নিলে দীক্ষা হয় না, এ এক লোকাতত সর্বজনীন মনোভাব। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে। মান্ত্রীদীক্ষাও তিনরকম ভাবে দেখা যায়—তন্ত্রের বীজমন্ত্র, বৈষ্ণবদের নাম আর জ্ঞানীর মহাবাক্য। এ সকলেরই সাধারণ সাধনা জপ। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সব মহাবাক্যের মনন করতে হয়। ওঙ্কার জপের মতই এগুলির জপ ও অর্থভাবনের নির্দেশ আছে এবং জীবনও ওই সুরে বেঁধে চলতে হয়। আবার ভগবানের নাম জপ ও বীজমন্ত্রের জপও সেই রকম সাধন করে করেই সাধক সিদ্ধিলাভ করে। বাইরে থেকে গুরুমুখে বীজমন্ত্র না পেলেও দীক্ষা হয়। আসল কথা হল, অভীপ্সার আগুনটি ঠিক পরশমণির মত প্রাণে জ্বলতে শুরু করলেই দীক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ শক্তিসম্পাত ও মন্ত্রের আবির্ভাব ইত্যাদি সবই সমাহৃত হতে বিঘ্ন হবে না।

এই বিশ শতকে আমরা যে কয়জন জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছি তাঁরা কেউ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নন। তাঁরা স্বয়ম্ভূ, সম্প্রদায় তাঁদেরই ধরে চলে। দীক্ষাজগতেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আমরা বুঝতে শিখেছি আত্মদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধি প্রথমে চাই, সেটাই প্রধান। আমি নিঃশেষে তোমারই হয়ে চলেছি, তোমাকেই শুধু চাই। আমি জানি আমার আত্মা তোমাতেই উৎসৃষ্ট। পরাঙ্মুখ আমার এই দেহ প্রাণ মনের ক্ষুদ্র ভোগায়তনের

যা কিছু দাবি সবই তোমাকে উৎসর্গ করে তোমার পথে নেমেছি। এই ভাব নিয়ে আত্মোৎসর্গের পথে চলার সময় কার পক্ষে ঠিক কোনটা অপরিহার্য সে কথা জোর করে বলা যায় না। দ্বিজাতির সাবিত্রী-দীক্ষায় শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটে আত্মাহুতির আগুনটি জ্বলে গেলে তো সবই হয়ে গেল। তা না হলে আবার সেই কালের অপেক্ষা করে তান্ত্রিক গুরুর কাছে বীজমন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, এও আমরা দেখেছি। তাহলে বুঝতে পারছি যে অধ্যাত্ম পিপাসা না জাগলে দীক্ষা গ্রহণে কাজ হয় না, আত্মদীক্ষাও হয় না। তাঁর দিকে আমাদের অভিযান ও তাঁকে পাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি, এর দুটা দিক আছে—তিনি আর আমি। আমরা নিজের দিকটা প্রথমে ভাল করে যেন দেখতে চাই না, আত্মবিচার করতে চাই না। অস্ফুট এক ব্যাকুলতা নিয়ে যাত্রা শুরু করে শেষে নিজের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়ি নয়তো খাবি খাই। সেজন্য আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিচার যোগের পথে একান্তই প্রয়োজনীয়। অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিজের সব কিছু জানতে হবে, হৃদিস্থিত গুহাহিত অধূমক জ্যোতির শিখাটিকে দর্শন করতে হবে। এই আত্মপরিচয় যেমন দরকার তেমন ব্রহ্মের লক্ষণও ভাল করে বুঝে নিতে হবে। বেদান্ত বলেছেন তৎ ও ত্বং পদার্থেরও শোধন করে নিতে হয়।

আত্মবিশ্লেষণ করে করে চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরগুলি শ্রীঅরবিন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কেমন করে আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে। আত্মাকে বা নিজেকে জানতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। ধ্যানে বসে এত আজে-বাজে চিন্তার আক্রমণ হয় যে তাতে ভয় পেয়ে যেতে হয়। কিন্তু নিজেকে জানার শুরুতেই ভয় পেলে চলবে না। এরকম আক্রমণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে পারে। আমাদের কারবার তো শুধু জাগ্রত মনটুকু নিয়ে। নির্জনতার ফাঁকা পেলেই অবচেতনার গুহায় গুহায় (ante chamber) যা সঞ্চিত ছিল সে সব কিছু সংস্কার বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে যে

এরকম হবে এটা জেনে নিয়ে এটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রথমে Sulphur দিয়ে পূর্বেকার দীর্ঘকালসেবিত ঔষধের প্রতিক্রিয়া সারিয়ে নিতে হয়। তখন রোগটা খুব বেড়ে সঙ্গীন (aggravated) হতে পারে। চিকিৎসকের মতে এটা ভাল লক্ষণ, ভিতরের জমানো কোনঠাসা সব রোগের আক্রমণগুলি বেরিয়ে পড়েছে; তাদের সম্মুখ সমরে শেষ করতে হবে। এরপর high potency-র ওষুধ পড়লে রোগের মূল পর্যন্ত উপড়ে বেরিয়ে যাবে এবং তাহলেই রোগী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করবে। ঠিক এইরকম ভাবে আত্মনিরীক্ষায় নিজের ভিতরের সব কিছু বৃত্তিকে বেরিয়ে আসতে দিতে হয়। একান্তে নির্জন স্থানে আসন করলে নিজের বহু জটিলতা ও complexগুলি সব অন্তর্মুখীনতার পথ থেকে যে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিয়ে যায় এটা দেখা যায়। ভিজে কাঠে আগুন লাগালে গ্যাঁজলা বেরোতে থাকে আর ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু তখন হাল ছেড়ে দিলে চলে না। পূর্ণযোগে সব কিছুই এক সূত্রে গাঁথা, কাজেই আত্মপরিচয়ের মুখ্য ও ইতর সব বিবৃতিই চাই। আমাদের চিত্ত বহুসংস্কারে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে। তারপরে আবার তাতে ভাবনা (thought), অনুভব, উদ্বেলতা (emotion) এবং সংকল্প বা সংবেগ (Will) এই তিনে ধস্তাধস্তি লেগে আছে। ভাবাবেগ আছে তো সংকল্পের দৃঢ়তা নেই, ভাবনা স্বচ্ছ নয়; আবার সংকল্পের দৃঢ়তা আছে কিন্তু ভাবনা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন—এরকম ব্যাপার লেগেই আছে। তাই দেহ প্রাণ মনের সমন্বয় করে নিতে হবে, সে এক প্রধান দায়। দেহ চায় তো প্রাণ চায়না আবার প্রাণ চায় তো মন চায় না; এইসব ঘরের ঝামেলাগুলি ভাল করে চিনে নিয়ে সবটাই খুলে মেলে তাঁর কাছে ধরে দিতে হবে। সেজন্য প্রথম নিজের ঘরেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যত বেশী গ্লানি ও আবর্জনা বেরিয়ে আসে সেটা ভাল হওয়ার লক্ষণ বুঝে উৎসাহে ভাটা পড়তে দিতে নেই। বহুদিনের বদ্ধ ধূলিমলিন একটি ঘর

ঝাঁটা দিয়ে মার্জিত করতে গেলে ধূলার ঝড়ে নাক চোখ মুখ বুঝি বা বন্ধই হয়ে আসে। এরকম হলেও এর পরেই ধীরে ধীরে গৃহ মার্জিত হবার মতই অন্তরটি নির্মল হয়ে আসে। ভাবনা, বেদনা এবং সংকল্পেও সামঞ্জস্য এসে যায়। ভাবনাটা সর্বদা তাঁকে নিয়ে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই কম্পাসের কাঁটার মত ঘুরে থাকে। তাই তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই এবং জ্ঞান, কর্ম, সংবেদন সবই তাঁর দেওয়া এবং তাঁকেই সব দিতে হবে এই বোধ আসে।

কিন্তু এরপর বাহিরের বাধাগুলি আবার আসতে থাকে। সিদ্ধযোগীদের আসন ঘিরেই যেন ভয়ঙ্কর বাধার এক পরিমণ্ডল দেখা দেয়। সত্যশিব সুন্দরকে ঘিরে যেমন ভূত ও প্রেতরূপী অপশক্তিগুলিকে দেখা যায় এও তেমনই ব্যাপার। কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা নিয়ে এগুলি গুছিয়ে নিয়ে বসতে হবে। একমাত্র তাঁকেই মন দেওয়া হয়েছে, কাজেই এসব বহুর অপচ্ছায়া থেকে মন তুলে নিয়ে এগুলি কাটাতে হবে। সাধারণ জীবনে দেশাচার লোকাচার ইত্যাদির কাছে আপনাকে বড় অসহায় লাগে এবং বাহিরের চাপে চরিত্রবলও পিষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই যখন মন দেওয়া হয়েছে তখন দেশের ও দশের কাছে যে মন দেব সেটা তাঁতে নিবেদিত ও তাঁর প্রসাদী মন। এ অবস্থায় বাকসংযম একটা বড় কথা। উত্তেজিত হয়ে কথা বলে আমরা মূল্যবান অনেক সম্পদ খুইয়ে ফেলি। বাকসংযমে ছোট খাট বাধাগুলি সরে যায়। কারণ বাধাগুলি আমরাই অনেক সময় অসতর্ক ও অসংযত হয়ে ঘটিয়ে তুলি। বন্ধু বলে যাদের মনে করেছি তারাই আবার জোরালো বন্ধনের কারণ হয়ে পড়ে। তাই সবসময় সেই দিকে মনটিকে ওই কম্পাসের কাঁটার মত ফিরে থাকতে দিতে হবে, কিছুতেই যেন স্থানচ্যুত না হয়। এ পর্যন্ত প্রচেষ্টা দিয়ে নিজেকেই সামলাতে হয়।

এর পরেও চেতনার সূক্ষ্মস্তর থেকে প্রবল বাধা সব এসে উপস্থিত হতে পারে (environmental consciousness)। কিন্তু তখন খুঁটি মিলে গেছে,

শুধু সেটিকেই ধরে বসে থাকা। অন্ধ আসুরীশক্তি যজ্ঞ পণ্ড করে দিতে চায়, ভরাঘট যেন উল্টে দেয়। তাই এসময় চাই এক জোরালো ধৃতিশক্তি। বানরছানা যেমন মায়ের বুকটি জাপটে ধরে থাকে, তেমনি করে তাঁকে আত্মসমর্পণ করে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই খুঁটি ধরে থাকার মত বীর্য তখনই চাই। সমস্ত জগৎব্যাপী অন্ধশক্তির প্রতিরোধকেও সিদ্ধ মহাযোগী হঠিয়ে দূর করে দিয়ে দেবতার আসন মুক্ত করেন; সেটা উচ্চস্তরের কথা। সে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের শেষ নেই। সিদ্ধযোগী যাঁরা এটা করেন তাঁরা বীর। শুদ্ধ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সে হৃদয়—তাকে ঘিরে বাহিরে ইষ্টগোষ্ঠীর বন্ধনী বা পুণ্য-পরিবেশ। কিন্তু তার বাহিরেই থাকে বিরাটের বাধা এবং তার সঙ্গে প্রবল শক্তি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। এই অন্ধতমিস্রার বাধাগুলিও অনাদি। এ সম্বন্ধে পূর্ণযোগের সাধকের ধারণা ও ভাবনা গোড়া থেকেই যথাসম্ভব স্বচ্ছ থাকা দরকার।

এর জন্য কি করতে হবে? বৌদ্ধদের যে মৈত্রীভাবনার কথা আছে, ব্রহ্ম বিহারের অঙ্গীভূত সেই মৈত্রীভাবনার সাধন করাটা এ ক্ষেত্রে এক অনুকূল ব্যবস্থা। ধ্যানে বসে চিত্ত যখন জমতে চায় না, তখন শান্ত হয়ে মৈত্রী বা সম্প্রীতির ভাবে আপ্লুত হয়ে যেতে হবে। তখন দেহবোধ পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ভালবাসার এক dynamo-র মত কাজ করে, তার ধর্মই হল আলোর মত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ভাব বিচ্ছুরিত করা। আমারই চতুর্দিকে আমাকে ভাসিয়ে ও ডুবিয়ে দিয়ে সেই প্রীতি সকলের মধ্যে বিচ্ছুরিত—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঊর্ধ্ব অধ সবদিকে ব্যাপ্ত সেই ভাব সবার মধ্যে আবার মিশে যাচ্ছে। এতে সব বিরোধ গলে যায় এবং চিত্তে নামে তাঁর করুণা বা ভগবৎপ্রসাদ। এই ভাবনা পূর্ণযোগের অঙ্গ করে নিয়ে প্রবর্ত সাধকেরা (beginner) গোড়া থেকেই সাধন করলে সুফল লাভ করেন। কেননা পূর্ণযোগ সবার যোগ, সকলের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ। সুখ দুঃখ আরাম ক্লেশ এ সবই কারও

একার নয়, সকলের ভোগের বস্তু। তাই ধ্যানচিত্ত যাতে ব্যাপ্তিবোধে আবিষ্ট হয় এমন সাধন পেতে হবে। এই মন্ত্র-ভাবনও তাতে বড় সহায় হতে পারে—

সর্বেবৈ সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

সকলেই সুখী হোক আর নিরাময় থাকুক। সকলে কল্যাণদর্শী হোক; একজনও কেউ যেন দুঃখ না পায়। এই ভাবে এক সমদৃষ্টি লাভ করলে আপনাকে জেনে জগৎকে জানা যাবে। তারপর তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানার কথা আসে।

শ্রীঅরবিন্দ নামরূপের মোহটি যথাসম্ভব বর্জন করতে বলেছেন, কিন্তু চিন্ময় বিশুদ্ধ রূপের ব্যঞ্জনায় ও ভিত্তিতেই যে নামরূপের সার্থকতা তা ধরিয়ে দিয়েছেন। এ যুগে অধ্যাত্মসাধনার গতি আমাদের কাছে সহস্রধারায় বহুমুখে স্যন্দমান এক বিরাট সিন্ধুর পরিচয় এনে দিয়েছে। এখন শুধু নাম-রূপের কথা বলে বা শুনে চিত্তের পিপাসা মিটানো যায় না, তাকে বৃহৎ বিশ্বরূপ ও লোকোত্তর ভাবে না পেলে চিত্ত ঠিক আশ্রয় পায় না। তাই কালী, কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা যাঁকেই ইষ্টরূপে গ্রহণ করি ভাবরূপকে এক বলে মিলিয়ে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রতীক বা আবরণটি যদি সাধককে বেঁধে ফেলে তাহলেই বিপদ। অন্তরের ভাবটি বিশুদ্ধ হলে কথাই নেই, নাম রূপ প্রতীক যজ্ঞ সবই ভাবগ্রাহী যোগেশ্বর স্বয়ং গ্রহণ করে বৃহতের আবরণ খসিয়ে দেন এবং সাধক তমসার পরপারে অভীষ্ট অমৃতজ্যোতির দর্শন লাভ করে। সাধকের অগ্রগতি জ্যোতি থেকে উত্তর জ্যোতিতে অব্যাহত ভাবে চলে। এদেশে সবই ব্রহ্মের সাধনা বা ঈশ্বরের সাধনা—তাই কালী ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ব্রহ্ম, শিব ব্রহ্ম। সব একাকার করে বুঝতে হয়। মূর্ত ও অমূর্তের রহস্য না বুঝলে সম্যক দৃষ্টিলাভ হয় না, পূর্ণ রসাস্বাদনও হয় না। ব্রহ্মই অদ্বিতীয়

তাঁর লক্ষণ সৎ চিৎ আনন্দ। সত্তা চৈতন্য ও রসস্বরূপেরবোধ বোধ হয়। ব্রহ্মের সদ্‌ভাবই হল চিত্ত শান্ত হওয়ার ফল। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে যোগের এই ভূমি লাভ হয়। ভিতরটা সম্পূর্ণ শান্ত হলে পর, এক অস্মিতা বা অস্তিতার বোধ—শুধু 'আছি' এই রকম একটা বোধ মাত্র থাকে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় চিত্ত প্রশান্ত, কোন তরঙ্গ নেই ; শান্ত আকাশের মত সেই শুদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যেই আলোর বিন্দুগুলি ঝিকমিক করছে। জগৎ ভাসছে বুদ্‌বুদের মত তবুও সবই শান্ত। কূটস্থ সত্তা সাক্ষী রয়েছেন, তিনিই চৈতন্যস্বরূপ। তাঁরই দৃষ্টির বিপরীতে যেন এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে চলেছে সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ ক্ষতি এই সব দ্বৈত বোধ, আর সমগ্র বিশ্ব এই দুই মেরুর মাঝে দুলছে ; আমরা তাতেই আছি। কিন্তু এই দোলার উর্ধ্বে উঠে ওই কূটস্থ চৈতন্যের মত সাক্ষী হয়ে আত্মস্থ হতে হবে। গীতায় যেমন ভগবান বলেছেন 'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান' হতে। তা হতে গেলে আঘাতে অচল ও অটল থাকার সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে কামারের নেহাইএর মত হতে হবে। যতই ধাক্কা আসুক ততই অটল অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকার শক্তি চাই। যোগের পথে প্রবল বাধা হল আমাদের অসহিষ্ণুতা। আমরা বড় রগচটা, তুচ্ছ কারণেই টালমাটাল খেয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে বসি। মাথা গরম থাকলে আপনাকেও বুঝি না, জগৎকেও বুঝতে পারি না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভিতরে শান্ত থাকলে বাহিরটাকেও বুঝতে পারা যায়। তাই বুদ্ধির শুদ্ধি চাই, অবুঝের মত প্রমত্তের মত চলা ফেরা করতে নাই। শান্তি থেকে ধাক্কাগুলিকে সামাল দেবার চেষ্টা করতে হবে। এটা করা বা পারা খুব বড় কথা। সেজন্য এক শান্ত অবস্থার বা অন্তরে শান্তির এক ভিত্তি চাই যাতে চিৎ ও আনন্দ এসেই যাবে, এ এক সাধারণ সরল নিয়ম। শান্ত হলে আন্তরদৃষ্টিও খুলে যায়, সকলকে বুঝতে পারা যায়। এই ভাবের পরিপাকে আন্তর জ্যোতির আবির্ভাবে চিত্তের সব

সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। সমস্যা না থাকলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। আনন্দের কথা আমরা ঠিক বুঝি না, সুখকেই আনন্দ মনে করি। কিন্তু চিত্ত স্বভাবে স্থিত হলে যে প্রসন্নতা লাভ হয় তাতেই দুঃখ নাশ হয় আর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে স্থিত হয়। এই আত্মতুষ্টিই ব্রহ্মের আনন্দঘনতা। এ যত বৃদ্ধি পাবে ততই ব্রাহ্মীস্থিতি সহজ হবে। ব্রহ্মের লক্ষণে বলা হয়—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম। শ্রীঅরবিন্দ এই আনন্ত্যকে ভাল করে বুঝতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনন্তের সঙ্গে যে কোনও সংখ্যা গুণিত করলে অনন্তই হয়। কাজেই এই শান্তি বুদ্ধির শুদ্ধি ও তজ্জনিত যে চিত্তের প্রসন্নতা এ সব অনন্তগুণিত হলে ব্রহ্মভাবে নিয়ে যাবে।

শান্ত ও প্রসন্ন থেকে বুঝে চললেই আত্মোৎসর্গের ভাব এসে পড়ে। সব দান তোমারই, আমি মাথায় তুলে নিই—এই ভাব। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে এ ভাব এলে আত্মসমর্পণও সহজ হয়ে যায়। ধস্তাধস্তি করাটা আমাদের মধ্যে নিতান্তই কুশ্রী দিক, সেটা সম্পূর্ণভাবে বর্জন (rejection) করা চাই। প্রতি-মুহূর্তেই সেটাকে সরিয়ে শান্ত, প্রসন্ন ভাবের প্রলেপে আলোর শিশুটিকেই সত্য ও সহজ হতে দিতে হয়। এই আলোর শিশুটি (Psychic being) যতই বর্ধিত হবে ততই কুশ্রী আমিটা ক্ষয়ে যাবে ও শেষে পালাবে। শ্রীঅরবিন্দ এই মিথ্যা বিকৃতির উচ্ছেদকে বলেছেন katharsis। সাধনার শুরুতে এটা হল ভিত্তি সাধনের কর্ম। এ থেকেই দীক্ষার প্রস্তুতি ও আত্মপরিচয় লাভ হয়। সচেতন থেকে মিথ্যা আমিকে অন্তরে প্রবিষ্ট হতে না দিলে সমনস্ক সদাশুচি থাকায় বাধা হবে না। 'নির্মেঘ নীল আকাশের ভাবনায় স্বচ্ছ হৃদয়টি মেলে দিলে সেটা ধ্যানচিত্তের সহায়ক হয়। তখন যেমন আমি তেমন তুমি, তেমনই আবার জগৎব্যাপিনী মা। নীলাকাশে সূর্য, চন্দ্র, অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ সব রয়েছে ; কোথাও তো ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। সেইরকম ইষ্টভাবনায় নামরূপের পিছনে নির্নাম ও অরূপের ভাবনাকে মিলিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া

আছে। নারদ সাবধান করে দিয়েছেন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বোধ থেকে নামরূপ যেন কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। আমার মা আমার ইষ্ট, যে নামই তিনি গ্রহণ করুন আর যে রূপই তিনি ধারণ করুন একমাত্র তিনিই তো সব হয়েছেন। তিনি অদ্বিতীয়া, সতী, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি। এই রকম করে ইষ্টধ্যানে চিত্ত লাগাতে হয়। বাহিরের রূপ তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; ধ্যানের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হলে হৃদয়ে হৃদয় মেলে, মনে মন গলে যায়, ধীশক্তি প্রচোদিত হয়। তখন শুরুচিত্তের ধ্যানে সম্যক দৃষ্টি খুলে যায়, দেখা যায় দেহ প্রাণ মন সবই ওই দিব্য আনন্দময়ীর চৈত্যসত্তা থেকেই বিচ্ছুরিত। এ রকম হলে আর নামরূপের আড়ালে পরমেশ্বরী হারিয়ে যেতে পারবেন না। রাধাকৃষ্ণ, শিব, কালী সমস্ত ইষ্ট নামরূপ সম্বন্ধেই এই একই কথা। বিগ্রহ-বত্তার সার্থকতাও এইভাবে হয়।

উপনিষৎ শিখিয়েছেন—দেখ বাহিরের এই ভূতাকাশ, সেই বহিরাকাশই অন্তরের অবকাশ ভরে রেখেছে। অন্তরাকাশ আবর্তিত হয় হার্দাকাশে। নির্মেঘ নীলাকাশের স্বচ্ছ হৃদয়দ্যুতিতে সারা দুনিয়াটাই যে ছায়াতপে ভরে রেখেছে। এই কল্পরূপই তো আমি। কিন্তু এতে যখন চিড় ধরে নিজের ও বাহিরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সব ছেড়ে পালাতে চাই। মনে হয়, তা না হলে ওই স্বচ্ছ ছায়াতপ হৃদয়টি বুঝি রাখতে পারব না। কিন্তু প্রাত্যহিক তুচ্ছ অভিমানগুলিকেও সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে, তার মধ্যে থেকেই। এর কোন short cut বা made easy-এর উপায় নেই। অবাঞ্ছিত পরিণামগুলি চিনে নিয়ে প্রতিমুহূর্তেই তাদের তিরস্কৃত করতে হবে। জীবনের পথ থেকে এগুলি কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ নয় কিন্তু যোগপথে এই সম্যক পরিবর্জনও এক মূল তত্ত্ব, এই কর্মে কুশলী হতে হবে তবেই আত্মদান সহজ হবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—'অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'। পুত্রদারা নিয়ে গৃহেই থাকতে হবে, কিন্তু অনভিষ্বঙ্গ ও অনাসক্ত হতে হবে।

এই হল কৌশল। স্ত্রী পুত্র পরিবার ও সকল সম্পর্কের কোনটাতেই জড়িয়ে যেতে নেই। কামপুরুষের (Desire Soul) ভাব বর্জন করে চৈত্য-পুরুষের নির্দেশে চললে দেখা যাবে সংসারের সব কিছু এই নিজের মধ্যেই লয় পেয়ে যাচ্ছে, আমি কিছু ঘটিয়ে তুলছি না বা আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে থাকতে যাচ্ছি না। সেই আপূর্যমান অচল প্রতিষ্ঠা তখন অধিগত হয়। সমুদ্রের মতই শ্রীকৃষ্ণের গভীর ভালবাসার আকর্ষণ, তিনি যখন আমার হৃদয়ে তখন তো সেসবই সেই আমার মধ্যে। সব কিছুরই গ্রহীতা হল তাঁরই সমুদ্রহৃদয়; তার মধ্যে সব কিছু প্রবেশ করে একেবারে তলিয়ে যাবে আর তাতেই শান্তি। এই হল শ্রেষ্ঠ পৌরুষ। বাসনা কামনার জগতে ধস্তাধস্তি লেগেই থাকে, সেটা চাওয়ার জগৎ। বাহিরের এই কুরুক্ষেত্রেই আমার অন্তরে যোগ দিয়ে বিজয়ী হতে হবে। পূর্ণযোগ যে সবার জন্য তাই এই বিজয় দেবতার, পরম-পুরুষের শৌর্য নিয়েই এই ধর্মযুদ্ধ চালাতে হয়। বলা হয়েছে—Win the world for Him।

প্রাচীনকালে ঋষিদেরও সংসার ছিল। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁর দুটি পত্নী ছিল। অন্য ঋষিদেরও পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁরা শ্রোত্রিয় এবং মহাশাল। সংসারের সমস্তটাকেই তাঁরা গোড়াতে স্বীকার করে নিতেন। কাজেই সকলের সঙ্গে গৃহে থেকে অনভিষ্বঙ্গ হয়ে যোগ করা সম্ভব। যোগের গোড়ার কথাই হল চিত্তের একাগ্রতা। বৃত্তির একাগ্রতার সঙ্গে ভূমির একাগ্রতা অর্থাৎ অখণ্ড ব্যাপ্তির এক বোধ চাই। সেটা সহজে হতে চায় না। খাপছাড়া বৃত্তিগুলি সব পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তরঙ্গদোলার মত। হাওয়া জোর ধরলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়, সেখানে সংহতি আনতে হবে। সব বৃত্তিগুলি একমুখী করার জন্যই চিত্তবৃত্তিনিরোধের ব্যবস্থা। সেটা হল ঐকান্তিক একাগ্রতা (exclusive concentration)। তা থেকে ধীবৃত্তি অগ্র্যা হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গেই চিত্তের ব্যাপ্তি বা এক অখণ্ডভূমারসে চিত্ত

ভাবিত হওয়ার (pervasive concentration) প্রয়োজন। তবেই যোগভূমি পূর্ণ ও সমগ্র হয়। এই অখণ্ড অদ্বৈত বোধই বেদের ও উপনিষদের ধারা; শ্রীঅরবিন্দ এটা ধরিয়ে দিয়ে এর দিকে জোর দিয়েছেন। চিত্তের ভূমি (mood) লক্ষ্য করতে হয়। যেমন রাগ হলে সমগ্র চিত্তভূমি রাগে ঢেকে যায়, তা থেকে প্রতিপক্ষের অনিষ্ট চিন্তায় চিত্ত কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তা করা অপেক্ষা সংবেদনে ভূমির একাগ্রতা প্রদীপ্ত হয়। কাজেই সেই দিকটা পেতে হবে। অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ হয়ে তিনিই সত্তাকে তাঁর পরম জ্যোতিতে আবিষ্ট করে রেখেছেন। রামকৃষ্ণদেবের সেই কথা—সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে মীন হয়ে সাঁতার কেটে চলার মত শুধু মন প্রাণ নয় সমগ্র দেহব্যাপী এক শান্ত উদ্দীপ্ত বোধ। এই স্মৃতিকে বহন করে চলতে হবে। দেহবোধ শিথিল করে দিয়ে প্রশান্তির অনুভব সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হলে সেটা ক্রমশঃ আধারে সহনীয় হয়ে হয়ে চিত্তে ধ্যানে আবিষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত সবই তিনি —তুহঁ তুহঁ। এই হল সহজ পথ, যদি সহজ বলে কিছু থাকে।

সেজন্য শুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দেহ শুদ্ধি প্রথমেই চাই, তারপর প্রাণের ও মনের শুদ্ধি। ঈশ্বর সম্বন্ধে শুদ্ধ মনের চিন্তাভাবনায় (to feel god) আবেশ আসা চাই। অনেক উপদেশ শ্রবণ অপেক্ষা এই আবেশের শক্তি অনেক বেশী কার্যকরী হয় তা আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। প্রাণের ধর্মই হল অখণ্ডতার বোধে ব্যাপ্ত হওয়া। কাজেই দেহবোধ যত স্বচ্ছ হবে সর্বব্যাপী ওই প্রাণের আবেশে মন সংযুক্ত হলে তাঁর সঙ্গে যোগও সহজ হবে। আত্মোৎসর্গের ভাবনায় এই অখণ্ড সমগ্রতায় তন্ময়তা (pervasive concentration) সেজন্য প্রধান কথা। শেষ পর্যন্ত তৎ (ব্রহ্ম) ও আত্মার সমীকরণ হয়ে যায় এই শরবৎ তন্ময়তা থেকেই।

৮

কর্মযোগে আত্মসমর্পণ—গীতার সাধনা

পূর্ণযোগের সহায়চতুষ্টয় ও যোগদীক্ষার বিষয় আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এবার যোগসাধনার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কি নির্দেশ দিয়েছেন তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের সাধনাকে প্রাচীন যোগ-পন্থাগুলির সমন্বয়ে নবীন করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সমন্বয়ের অর্থ এ নয় যে খণ্ড খণ্ড করে সংগ্রহ করে তাই জোড়া দিয়ে দিয়ে একে নির্মাণ করা হয়েছে। যোগসাধন প্রাণের ধর্ম, তা জীবনের স্পন্দে স্পন্দিত। যোগের ক্রিয়া সর্বাঙ্গীণ অখণ্ড নিটোল। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে আলাদা আলাদা করে জুড়ে জুড়ে একটি জীবিত মানুষ গড়ে ওঠে না বা তাকে জানা যায় না। কিন্তু পূর্ণভাবে একটি মানুষকে অখণ্ডভাবে জানতে পারলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলির পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। আবার সমগ্র মানবজাতির সম্বন্ধে সামান্য ও বিশেষজ্ঞানও তা থেকে পাওয়া যায়। পূর্ণযোগের সাধন-শরীরটিও সেইরকম প্রাচীন যোগপথগুলি সমন্বিত করে সব সাধনের সার বস্তু উদ্ধার ও গ্রহণ করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ণযোগের অবয়ব সংস্থান জানতে হলে তার অখণ্ড ও সমগ্র বোধে বোধ মিলিয়ে সাধন করেই সেটা জানবার চেষ্টা করতে হবে। তাতে প্রাচীন সাধন পদ্ধতির মর্মোদ্ধার করেও এর রীতি ও নীতিতে একটি নবীন প্রাণের নক্সা পাওয়া যাবে যাতে পদে পদে পথ চলার হদিস মিলবে।

মনের ওপারে তাকে ছাপিয়ে আছে যে অধ্যাত্মশক্তি তাকে বলা হয় বোধি। এই বোধিকে অবলম্বন করে তিনটি বৃত্তি দেখা দেয়—ইচ্ছা জ্ঞান ও বেদনা (feeling)। এদের আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কর্ম, জ্ঞান ও ভাব আমাদের ভিতরে একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

জীবনের চলা ফেরা কর্ম ভোগ শান্তি স্থিতি সবের মধ্যেই তা সব মানুষে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। আবার দেখা যায় যে প্রতিটি মানুষের গড়ন ও ধরনে এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেউ কর্মঠ কেউ জিজ্ঞাসু কেউ ভাবুক—অর্থাৎ তাদের মধ্যে কর্ম, জ্ঞান ও ভাব একসঙ্গে থাকলেও কারও কর্মে কারও জ্ঞানে আবার কারও বা ভক্তিতে প্রবণতা বেশী। যার মধ্যে যেটা প্রধান সেটা অবলম্বন করে চললে অবশ্য পথ চলা সহজ হয়। কিন্তু তিনটি একেরই সমভাবে সাধ্য এবং জীবনে তিনটি কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এটা প্রথমেই বুঝে নিতে হবে। গীতা ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এই যোগত্রয়ী যে একাত্ম. সেটা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই ত্রয়ী ছাড়াও হঠযোগ ও রাজযোগ এই দুই যোগপথ ও তাদের বিধান সাধারণভাবে সব যোগের মধ্যেই আছে। পূর্বে এগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করে যোগসাধনে এগুলির অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখেছি। পূর্ণযোগের সাধককে তার নিজের সাধনে প্রত্যেকটিকেই সমন্বিত করে নিতে হবে যার যতটুকু প্রয়োজন সেটা বুঝে নিয়ে। তার অধিক নয়, কমও নয়।

শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই কর্মযোগ, তারপর জ্ঞানযোগ তারপরে ভক্তিযোগ ও শেষে চতুর্থ পাদে এসে আত্মসিদ্ধিযোগের (Yoga of Self-perfection) কথা বলেছেন। প্রথম দিকে যোগত্রয়ীর প্রাচীন মার্গ ও বিধান থাকলেও সেগুলির অনুবৃত্তি মাত্র করা হয় নি, নতুন করে সেগুলিতে প্রাণসঞ্চার করা হয়েছে। তিনি এদের নামও দিয়েছেন বিভিন্ন, তাতে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। কর্মযোগকেও তিনি বলেছেন The Yoga of Divine work (দিব্যকর্ম-যোগ)। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ যথাক্রমে The Yoga of Integral knowledge (সম্যক্‌জ্ঞানযোগ) ও The Yoga of Divine Love (দিব্যপ্রেমযোগ) নাম পেয়েছে, সমন্বয়ের দিকটি ও দিব্য সমগ্র ভাবনার ইঙ্গিতটি এই নামকরণেই পরিস্ফুট। সাধকের যে দিকেই প্রবণতা থাকুক

সে পথ ধরে সে পূর্ণভাবেই অগ্রসর হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসিদ্ধির যোগে (The Yoga of Self-perfection) উন্নীত হলে পরে পরম সমন্বয় সে লাভ করবে।

গীতাতে আমরা যেমন পেয়েছি—কর্ম দিয়েই সাধারণত যোগ শুরু করা যায়। সর্ব কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে—সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। যোগ শেষ পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করে ভক্তিতে। আমরা যে কোন যোগপথ আশ্রয় করি না কেন, আত্মাকে জেনে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা পূর্ণযোগ হবে না। সমন্বয় বোধটি গোড়া থেকেই ঘাট বেঁধে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রবর্ত সাধককে ওই যোগত্রয়ী অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে ওই সঙ্গে নিজের মূল সুরটি বুঝে নিজেকে পূর্ণ করে চলা সম্ভব হয়। এইভাবে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি একসঙ্গে স্বভাবে মিলিয়ে নিয়ে আত্মবোধের আলোতে নিজের ঘটটি ভরে নিতে নিতে চলা আরম্ভ করলে সেটা হবে যথার্থ পূর্ণযোগের সাধনা। কিন্তু গোড়াতেই শ্রীঅরবিন্দ সে কথা না বলে প্রাচীন পথগুলির বিশ্লেষণ সমীক্ষা ও অন্বীক্ষা করে করে পূর্ণযোগের সাধন নির্মাণ করার কৌশলটি ধরাতে চেয়েছেন, যাতে মালমশলা সংগ্রহ করে সাধক তার নিজস্ব পথটি চিনে নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। অথচ পূর্ণযোগের যথার্থ অধিকারী যে খুবই কম এটা আমরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন যোগপন্থাগুলিকেও পূর্ণ করে নবীন করে তুলেছেন, তাদের প্রত্যাখ্যান করেন নি।

All life is Yoga অর্থাৎ যা জীবন তাই যোগ, এই যদি সত্য হয় তাহলে এও বলতে হয় যে যা জীবন তাই কর্ম ছাড়া যোগ হতেই পারে না। যোগের প্রসঙ্গে গোড়াতেই কর্মের কথা আসে। জীবনের আদি ও অন্ত যোগ হলে কর্ম পেয়েই বসে আর তাতে রসের যোগান

পড়লে হয় ভাবসঞ্চার। পরে তাতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। সর্বজনীন যে পূর্ণযোগ তাতে কর্ম কখনও বিযুক্ত নয়। পতঞ্জলিও কর্মের কথা ভেবেছিলেন এবং রাজযোগের প্রাথমিক অংশে ক্রিয়াযোগের কথা বলেছেন। এই ক্রিয়াযোগ হল জীবনের চলা-ফেরার মধ্যে থেকেই যোগ, জীবন থেকে বিযুক্ত নয়। অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনে অনেক সময় এই চলা-ফেরার জীবন থেকে বিযুক্ত হতে হয়, সকলের মধ্যে থেকে তা করা যায় না। কিন্তু ক্রিয়াযোগের ফলে সাধকের সর্বার্থ সিদ্ধি হতে পারে, যোগশাস্ত্রকার একথা বলেছেন। এই ভাবনার উৎস গীতায়। তারও পূর্বে ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশে আমরা এই সন্ধান পেয়েছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ হঠযোগ ও রাজযোগকে জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেখানে উদ্দেশ্য ছিল মনোলয় দ্বারা মনের ওপারে যাওয়া। ধ্যানের ফলে সমাধি ও তার পরিপাকে জ্ঞান। জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গে এগুলির আলোচনা বিশদভাবে আছে। আমরা এখন কর্মযোগ দিয়েই আলোচনা আরম্ভ করব।

Self-Surrender in works—সমর্পণ-বুদ্ধি নিয়ে কর্ম করা কর্মযোগের প্রাথমিক অনুশাসন। তাঁর কাজই আমার কাজ এই ভাব আসা চাই। গীতা আগাগোড়া এই ভাবে কর্ম করার শিক্ষা দিয়েছেন। কর্ম কি? না, একটা কিছু করা। কিছু না করে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা যায় না। প্রকৃতিই কর্ম করিয়ে নেয়—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"। কিন্তু সেই কর্মের লক্ষণ কি আর লক্ষ্যই বা কি তা তো জানতে হবে। গীতাই বলেছেন—"ভূতোভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ"; পরম চৈতন্য থেকে শক্তির উৎসারণই কর্ম। সেই পরম অক্ষর থেকে যে কর্ম উথলে পড়েছে, তাঁর স্বভাব থেকেই তা উদ্ভূত। কর্মই হল তাঁর বিসৃষ্টি। একটা অব্যক্ত আশয় (Matrix) রয়েছে, তাকে

বলতে পারি মূল প্রকৃতি এবং তা হতেই ভূতসৃষ্টি। ভূতকে আশ্রয় করে যে ভাব তা চিৎপ্রকর্ষ। এই চিৎএর প্রকর্ষই হল জীবের মূল স্বরূপ বা স্বভাব যাকে অধ্যাত্ম বলা হয়েছে।

জড় থেকে চৈতন্যের অভিযানে জড়ত্বের পর উদ্ভিদের মধ্যে এসে জড়ের সুপ্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন, আবছা এক আধোজাগার অবস্থায় উন্মেষিত। মনু তাকে বলেছেন অন্তঃসংজ্ঞ অবস্থা। এর পর পশুর মধ্যে এসে সেই আচ্ছন্ন চৈতন্যশক্তিতে প্রাণের প্রবলতা বলের ভূয়ঃ প্রকাশ ক্রমে উন্মেষিত হয়েছে কিন্তু তাতে মন বা মস্তিষ্কের ছাঁচ তখনও নিরাকৃত। মানুষ জাতিতে চৈতন্যের প্রকাশে সেই মন জাগতে আরম্ভ করেছে। একটা ক্রম ধরে বিকাশের উন্মুখীনতায় জড়ের আধারেই প্রাণচৈতন্য প্রকৃষ্ট ভাবে ফলিত হয়েছে মানুষের বুদ্ধিতে। এই প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নির্মাণ করেছে তার জীবনের বহুল উপকরণ। সভ্যতার অভ্যুদয়ে বুদ্ধির বলই শ্রেষ্ঠ বল। কিন্তু এই মানুষ অন্তরাবৃত্ত হয়ে যখন যোগী হল, তখন তার অহংকেন্দ্রে সচেতন এই মনবুদ্ধিকেই সে আর এই ভাবে উন্মীলিত হতে দেখতে ও বুঝতে পারল। এ এক ঘুম ভাঙার মতই মানবচৈতন্য প্রাকৃত দশা থেকে মুক্তি পেয়ে বিজ্ঞান ও আনন্দের সন্ধান পেল। সেই যোগের অধিকার মানুষ ব্রহ্মবোধের প্রতিবোধে সব কিছু জানবার শক্তি লাভ করেছে, যা জানতে পারলে আর অজানা কিছু থাকে না। এই ভাবে মূল রসের বা প্রেমের সন্ধান পেয়ে চেতনার নিত্য নব পরিচয় ও দিগন্ত সব যোগীর কাছে খুলে যেতে আরম্ভ করেছে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের এই হল যোগকর্ম। এমন করে ভূতের মধ্যে ভাবের উৎকর্ষ হয়ে চলেছে। বিশ্বসৃষ্টিতে পরম পুরুষের এই যজ্ঞকর্মে অক্ষর থেকে ক্ষরণ ও আবার সেই চিৎপ্রকর্ষের ধারা ধরে উজিয়ে স্বধামে যাওয়া—এই যোগের ক্রিয়া আপনা হতেই প্রকৃতিতে প্রসর্পিত হয়ে চলেছে তার স্বভাব অনুযায়ী।

পরম পুরুষের তাই ইচ্ছা। জড় থেকে প্রাণে ও পরে মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগক্রিয়া, তাতে মানুষের দায় ছিল না। কিন্তু মানব মনে সচেতন বোধ এসে পড়ায় তাঁর লীলাকর্মে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ও দায় মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার পরিণতি ও লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে মানুষকেই দিব্যস্বভাবের অধিকারটি বুঝে নিতে হবে। এতে ক্রমবিকাশের পথে কালও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিলুপ্তির মত এক পুনরাবৃত্তি ও মহতী বিনষ্টি হতে এই মানব জাতিকে অন্তরাবৃত্ত যোগকর্মের পথেই রক্ষা পেতে হবে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এ দুয়েরই যেটা কাষ্ঠা বা পরাগতি তা এই অন্তরাবৃত্ত যোগকর্মের ফলে।

অন্তর্মুখীনতা ও আত্মসচেতনতা থেকেই যোগকর্মের শুরু একথা অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যখন অন্তরে রসের যোগান পেয়ে ভাবের রাজ্য খুলে যেতে থাকে, তখন সেই রসাস্বাদনের তীব্র নেশায় কিম্বা জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় ক্ষেত্রের সবটা ঢাকা পড়ে তার ঝলকানিতে যোগী সাধক আর বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করেন না, এমন অবস্থা এসে পড়তে পারে। এ অবস্থায় জগৎ-বিমুখীনতা আসে এবং কর্ম তখন গৌণ হয়ে যায়। সেটা পূর্ণযোগীর লক্ষ্য নয়। সেজন্য গীতায় উপদেশ করা হয়েছে যোগস্থ থেকে কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম ত্যাগ করা কোন মতেই চলবে না। এমন যে ঘোর কর্ম সম্মুখ সমর, তাকে পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রে যোগকর্ম বলে দেখিয়ে দিয়ে যোগস্থ থেকে যুদ্ধ করতে উপদেশ করে সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে অর্জুনকে নানা ভাবে সব দিয়ে ভগবান বুঝিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞান ও প্রেম হল ভিতরের উপলব্ধির বস্তু, কর্মে সেই বস্তু উৎসারিত হয়। তাই শুধু কর্ম দেখে সাধারণ লোকে যোগীর ভাব বুঝতে পারে না। কর্ম যদি জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত তবে কেন এই ঘোর কর্ম যুদ্ধের নির্দেশ—এই বিভ্রান্তি ও প্রমাদ অর্জুনের প্রশ্নে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কর্মকে জ্ঞানের সমান মর্যাদা দিয়েছেন

যাতে অকর্মবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। জীবনের মূল্যায়নে কর্ম ও জ্ঞানকে যথাস্থান দিয়ে তিনি বলেছেন নৈষ্কর্ম্যও চাই। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে হাত পা ছেড়ে দিয়ে নিয়ত কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকতে হবে। কোন মতলব না রেখে কর্মফলের অপেক্ষা না করে প্রশান্ত যোগস্থ হয়ে কর্ম করা চাই। "অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥" এই সব কথা বলে কর্মযোগেই শ্রীকৃষ্ণ বারবার বিভিন্ন দিক দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে অর্জুনের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করেছেন। এতে কর্মবিরতির নেশা ছুটে যায় ও অকর্মবাদের মূল পর্যন্ত সব জট খুলে যায়। কিন্তু কর্মকে নিয়ে গেলেন কোথায়? "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" অসঙ্গ হয়ে যোগস্থ থেকে যে কর্ম সে কর্মই বা কেমন সেটা তো বুঝে দেখতে হবে।

কর্তব্য কর্ম বা সহজকর্মের যে প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে তা সহসা ছেড়ে দিতে নেই। তাকেই যোগকর্মে রূপায়িত করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের যে নিয়ত বা নির্দিষ্ট কর্ম আছে, সেটা বুঝে নিতে হয়। কিন্তু সেটাই যদি তাকে পেয়ে বসে, তাহলে তা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে এক মদমত্ততার সৃষ্টি হয় এবং অশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে সেটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে। তাই কর্ম যখন এরকম বন্ধনের কারণ হয় তা বুঝতে পারলে কর্ম-ত্যাগের কথা বলা আছে। কেন না জ্ঞানেই দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা হবে, অজ্ঞানে নয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে গীতা বলছেন—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

যা তোমার স্বভাবে সহজ কর্ম তাই দিয়ে তাঁর অর্চনা করবে। সেই কর্মেই তখন চরম সিদ্ধি লাভ হবে। কিন্তু মূলের ওই কথাটা ভুললে চলবে না যে যা থেকে সর্বভূতের প্রবৃত্তি এবং যা দিয়ে এই সবই ব্যাপ্ত, স্বভাবকর্ম দ্বারা

সেই তিনিই অর্চনীয়। সেই পরম সত্তার স্বভাব হতেই আমার স্বভাব ও স্বকর্ম। আমার ভিতর থেকে তিনিই কর্ম ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। তখন "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই ভাবই পেয়ে বসবে। অর্থাৎ তুমি হৃদয়ে থেকে যেমন আমাকে যাতে নিযুক্ত কর আমিও তেমন তাই করে থাকি—এই দৃষ্টি ও অনুভব খুলে যাবে। কর্মযোগের পরমা গতি হল এই হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর কর্মে আত্মসমর্পণ। কিন্তু এই সিদ্ধি আসে সকলের শেষে, তাই এই ধারণাটি গোড়ায় একটু ধরিয়ে দিয়ে প্রাকৃত মানব কর্ম থেকে দিব্য কর্ম পর্যন্ত কর্মের এক গতি-পরম্পরা ও চলার পথটি দেখান হয়েছে। তার পাঁচটি ভূমি। প্রথমেই আসে শরীর যাত্রা নির্বাহ বা জীবন ধারণের জন্য কর্ম। দ্বিতীয় ভূমিতে লোকসংগ্রহের জন্য বা বিশ্বহিতের উদ্দেশ্যে কর্ম। তৃতীয় ভূমিতে পাই কৃৎস্নকর্ম—যোগীকে যেভাবে কর্ম করতে হবে সেই অকর্তার কর্ম। চতুর্থ ভূমিতে নিমিত্ত কর্ম এবং এসবের পরিপাকে পঞ্চম ভূমিতে দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রধানত গীতা অবলম্বন করে শ্রীঅরবিন্দ এগুলি ব্যাখ্যা করলেও তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে কর্মের যোগপথগুলিকে আলোকিত করেছেন এক চিরনবীনতা দিয়ে।

জীবন ধারণের জন্য কর্মের কথা প্রথমেই আসে। কেননা কর্মত্যাগীকেও ভিক্ষা করে শরীর রক্ষা করতে হয়। আধুনিকযুগে এই কর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে, এটা economic level-এর কর্ম। এ সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ মার্গের সম্যক্ আজীবিকাকে ধরতে পারি। মানুষকে এমন জীবিকা বেছে নিতে হবে যেটা তার স্বভাবের বা অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী না হয়। এ যুগে এই জীবিকারও বিভ্রাট ঘটেছে দেখা যায়। কর্মের জন্যই কর্ম করা হয়, ভাবের সঙ্গে যোগ নেই। অনেকে আবার জীবিকার জন্যও কর্ম পায় না। প্রত্যেকের স্বভাব অনুযায়ী স্বকর্ম যে সমাজ দিতে পারে তাকে যথার্থ ধর্মসমাজ বলা যায়। সেখানে যার যে যোগ্যতা তা কর্মে মুক্তি পেলে

সুস্থ ও সমৃদ্ধ মানব সমাজ গড়ে ওঠে। অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে কর্মের সংঘর্ষ তখন দূর হয়।

দ্বিতীয়পর্বে লোকসংগ্রহ কর্ম, বহুজনহিতায় বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর্ম। আলোচনা করতে গেলে প্রথমে এতে কল্যাণ রূপটিই দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে চেতনার ব্যাপ্তি ঘটে। এ যুগেও মানবতাবাদ (Humanism), পরোপকারবাদ (Utilitarianism) এই সব আদর্শ সামনে রেখে কর্ম করার প্রেরণা দেওয়া হয়ে থাকে। স্বভাব অনুযায়ী ব্যক্তির সেই কর্তব্য কর্মের ফলে সমষ্টি মানবজাতি উপকৃত হয় এটা দেখা গেছে। সর্বভূতের হিতৈষণা জনসেবা জীবসেবা দেশসেবা জগৎসেবা ইত্যাদি সবই লোকসংগ্রহ কর্মের মধ্যে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ও লোকমান্য তিলক গীতার ব্যাখ্যানে এ দিকটায় জোর দিয়েছেন। The greatest good of the greatest number—সর্বাপেক্ষা অধিক জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে সাধিত হয়, সেই জগৎহিতবাদই কর্মযোগের মূলে একথা তাঁরা বলতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে এর ফলিত দিকটির সারবত্তা দেখিয়ে দিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী যেন আবার চরমে না যায় সেদিকে সাবধান করেছেন। কেননা জগৎ হিতের জন্য বা পরের কারণে নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করছি, এ থেকে অহঙ্কার ও প্রমাদ এসে অনেক সময় আমাদের বিভ্রান্ত করে। মূলে যদি যোগস্থ হয়ে এ কর্ম করা যায় তবেই শেষ রক্ষা হয়, নয়তো শরীরযাত্রা নির্বাহ ও লোক সংগ্রহার্থে কর্ম কর্মযোগ না হয়ে ক্ষুদ্র অহংকে স্ফীত করে শুধু জৈবকর্মেই পর্যবসিত হতে পারে। অধ্যাত্মবোধ বাদ দিলে এ দুটি কর্মই শেষে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। প্রাকৃত মন নিয়ে যোগ হয় না। যোগে দীক্ষা চাই এবং যোগসাধনই প্রকৃত কর্ম। যোগী যখন শরীর যাত্রা নির্বাহ কর্ম ও লোক-সংগ্রহার্থে কর্ম করেন তখন তার মূল্যও বিভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই পরম্পরাটি সাংখ্যদৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কর্মের এই তৃতীয় ভূমিতেই

প্রকৃত যোগকর্ম বোঝা যায় যেখানে অকর্তা হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম হয়ে যায়, তুমি দ্রষ্টা মাত্র—এইরকম ভাব। বুদ্ধদেবও বলতেন আত্মসচেতন হয়ে কর্ম করতে হবে। 'আমি'কে বাদ দিয়ে 'আমি' থেকে আলাদা হবার অভ্যাস করলে প্রকৃতিতে কাজ হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে ও দেখতে পারা যাবে। এই হল সাংখ্যের বিবেক জ্ঞানের সাধন। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র, প্রকৃতি হতে বিবিক্ত। তখন কর্ম আর অকর্ম এক হয়ে যায়। ভাবটা এই রকম দাঁড়ায়, 'তুমিই করাও কর্ম, লোকে বলে করি আমি', নয়তো আমি কিছুই করি না অথচ আমাকে দিয়েই কর্ম করা হয়ে যায়। আমার 'আমি' তো বহুরূপী কিন্তু কেন্দ্রে একটি মাত্র যোগস্থ তার রূপ। সে কূটস্থ শান্ত সাক্ষীরূপ অকর্তা। এই বোধ ধারণায় পেতে হয়। বাহির থেকে বিচিত্র তরঙ্গমালার আঘাতে বাহিরের সব আমিগুলি টলে গেলেও ভিতরে অচল অটল সেই আসল 'অহম্'টি। এই ভাবের ধারণায় ও দেখায় অভ্যস্ত হলে তখন ভিতর হতেই শক্তি ও রস কর্মে উৎসারিত হবে এবং বাহিরের বিচলিত ভাবও আর টলাতে পারবে না। আত্মবোধ ক্রমে ক্রমে জেগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে। তখন পুরুষ বিবিক্ত থেকে আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর আবার উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। অকর্তা হয়েও কর্মের রাসটি টেনে ধরে থাকা বা অক্ষরে থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত করা তখনই সম্ভব হয়। কর্মযোগের এই. প্রতিষ্ঠার ভূমি বুঝতে স্বামী বিবেকানন্দের পওহরী বাবার দৃষ্টান্ত দেখানোর কথাটা মনে পড়ে। গুহাহিত থেকেও যোগীর পক্ষে এমন শক্তি সঞ্চার সম্ভব যে প্রতি জীবে সেই যোগশক্তির আবেশ হয়।

অকর্তার কর্ম হলে ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ আসে। তখন শুধু 'আমি' নই, সমস্ত বিশ্ব কর্ম করে চলেছে এই দৃষ্টির উন্মেষ হতে থাকে। প্রকৃতিই সকলকে কর্ম করিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তার মূলে রয়েছে এক দিব্য সংকল্প। তখনই বুঝতে পারা যাবে যে এই 'আমি' সত্যসত্যই তাঁরই মাঝে। দিব্যপুরুষের

সংকল্পই আমার স্বাধীন ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্য। কবির ভাষায় তখন বলতে ইচ্ছা করে—'মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

এইবার চতুর্থ ভূমি নিমিত্ত কর্মযোগের কথা আসে। ভগবান গীতাতে বিশ্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনকে বললেন—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। আমি পূর্বেই এদের সব বধ করেই রেখেছি। তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হয়ে শত্রু নিধন কর।" শুধু তোমাকে কর্মের আদেশ করছি না, সে কর্মও কালপ্রবাহের মধ্যে সিদ্ধ করে রেখেছি। তুমি বর্তমানে নিমিত্ত হয়ে সেটি সকলের সামনে ফলিয়ে তোল, অর্থাৎ আমার কর্মে তোমাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ কর। যুদ্ধকর্মে তোমার প্রবৃত্তি নিয়েই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার স্বভাবে ক্ষত্র বা রজোগুণের ক্রিয়া। তোমার সেই প্রকৃতিই তোমাকে ঘোর কর্ম করিয়ে নেবে। তোমার এই স্বকর্ম বা সহজ কর্মে তুমি নিমিত্ত মাত্র। আমরা ভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত এই পরম আশ্বাসের ভয়ঙ্করী বাণী শ্রবণ করলাম। এটি শুধু শোনা নয়, বোঝা নয়, যোগকর্ম করে করে হতে হয় তাঁরই হাতের যন্ত্র। কর্মযোগের এই পর্যন্ত সাধকের সাধ্য। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন 'আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা।'

এর পরে আসে দিব্যকর্মের কথা, যেখানে কর্মযোগ সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ। কর্ম-যোগের এই চরম লক্ষ্যটি শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস সিদ্ধির ফলস্বরূপ দেখিয়েছেন। গীতায় যেখানে এর ইশারা মাত্র আছে অকর্মবাদ সেখানে আর কোন মতেই টিঁকে থাকতে পারে না, বিনষ্ট হয়ে যায়। শ্রীভগবান বলছেন—"নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।" এমন কিছুই তো নেই বা থাকতে পারে না যা তাঁকে করে পেতে হবে তবুও তিনি কর্মেই ব্যাপৃত থাকেন, কর্ম ত্যাগ করেন না। এখানে অবতার সম্ভবের আভাস পাওয়া

যায়। দিব্যকর্ম বুঝতে হলে ভগবান স্বয়ং অবতরণ করে যে ভাবে কর্ম করেন সেভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এই অবতরণ সম্ভব হয় কখন? জগতের মূল অধ্যাত্মনীতির ঋতচ্ছন্দ যখন ধর্মের গ্লানিতে বিপর্যস্ত হয় তখন অধর্ম উদ্ভূত হয়ে সৃষ্টিকে রসাতলে টেনে নামিয়ে নিতে চায়। বিনাশের এক চরম মুহূর্ত উপস্থিত হলে ভগবান নিজেই পূর্ণশক্তি নিয়ে এই অপরূপ মনুষ্যরূপেই অবতীর্ণ হন। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারী যেমন বিনাশ করেন, তেমন আবার ধর্ম সংস্থাপন করে জগৎকে নবীন করে গড়ে তোলেন। এ যুগে এর অর্থ করতে পারি প্রেমধর্মের সংস্থাপন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত স্বপ্নলীলা সার্থক করতেই না জাগ্রত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবতারণা। কিন্তু আজও তো সে স্বপ্নের সমগ্র সার্থকরূপ জীবনের কোলাহলে আমরা ধরতে পারিনি বা দেখতে পাই না। শ্রীঅরবিন্দ যে তিনটি আমূল রূপান্তরের কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই Psychicisation বা চৈত্য রূপান্তর সম্ভাবিত হলে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে। সাধারণ জীবনেও কৈশোর কালে সে চেতনার আভাস পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের লীলাও সেজন্য কিশোর কিশোরীদের চিত্ত অবলম্বন করে সম্ভাবিত; বয়সের এই ইঙ্গিতটি সেখানে দেওয়া আছে। ভগবানের লীলার সাথী হওয়াই এক্ষেত্রে মানুষের পরম পুরুষার্থ। সমষ্টি মানব চেতনায় চৈত্যপুরুষ জাগ্রত হলে বৃন্দাবনের স্বপ্ন সার্থক হবে। সে হবে এক প্রেমের জগৎ। কর্ম হবে দিব্য, জ্ঞানে উজ্জ্বল ও ভক্তিরসে সমৃদ্ধ। এই চৈত্যরূপান্তর থেকেই পূর্ণশক্তির রূপান্তর ও অতিমানস শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দ Spiritualisation ও Supramentalisation নাম দিয়ে সেই ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরাট সম্ভূতিকে আমাদের সামনে দিব্যরূপে প্রতিভাত করেছেন। এখন আমরা তার আভাস পেলেও সে প্রেমসমাজ গড়ে তুলতে পারিনি। বোধি ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য আনতে

পারিনি, এক কথায় প্রাণ দিয়ে আমরা মানুষকে ভালবাসতে পারিনি। তাই এত হানাহানি, সংঘর্ষ যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে চলেছে। জীবনের কর্মক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে নিতে চাই কিন্তু হৃদয় থেকে সে বুদ্ধি উৎসারিত না হলে কোন সমাধান আসতে পারে না। ওদেশেও Christ-এর বাণী ছিল Love Thy neighbour তোমার পাশের লোককে ভালবাসো। হৃদয় পবিত্র না হলে কিছু তো হবে না। আর তা হলেই চৈত্য রূপান্তর সম্ভাবিত হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবিশ্বাস করি, সন্দেহ করি কিন্তু ভালবাসতে পারি না। এতে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা লড়াইএর যন্ত্রণার শেষ নেই। সমষ্টি মানবজাতির চৈত্যরূপান্তরের কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই বিশ্বযুদ্ধ কত বড় এক সমস্যা। তাই না অতিমানস রূপান্তরের পরমা সিদ্ধির সময়টি জানতে চাইলে Mother বলেছেন "Let us work 5000 years!" পূর্ণযোগ তো একার নয়! সবার যোগে এ যে এক বিশ্বযজ্ঞ।

এখন শুধু নিজের সাধনা ও মুক্তির কথা ভাবলে তো কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। গুহাহিত হয়ে থেকে গেলেও চলবে না, কর্মযোগে যুক্ত হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সব সাধকদের যে, একটা জীবন দে কর্মে তারপর ভগবানকে দিস। সাধারণ লোকে যাতে কর্মে আনন্দ পায়, রস পায়, যুক্ত হতে পারে সেজন্য বিদ্বান দূরে সরে থাকতে পারেন না; সকলের সঙ্গে কর্মযোগে তিনি যুক্ত থাকবেন—'জোষয়েৎ সর্ব কর্মাণি'। এই সমস্যাসঙ্কুল যুগে আজ আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সমগ্র বিশ্ব নিয়েই আমাদের কারবার। কেউ আমরা বিচ্ছিন্ন নই। বাংলায় কবিতা লিখতে বসেও কবিকে অনেক দূরে বোমায় চূর্ণ করার দৃশ্য দেখতে হয়, লিখতেও হয়। কাজেই সমস্যা ব্যাপক ও গুরুতর।

কর্মের পটভূমি আলোচনা করে আমরা দেখলাম যে, যোগীকে সর্বব্যাপী

বিশ্বচৈতন্যে সমসাময়িক সমস্যাগুলিরও কর্মে মীমাংসা ও সমাধান পর্যন্ত দেখিয়ে দিতে হয়। সম্যক আজীবের কর্ম প্রাথমিক জীবনধারণের কর্ম মাত্র। লোক সংগ্রহার্থে বা বিশ্বহিতের উদ্দেশ্যে ঐ কর্ম ব্যাপ্তি লাভ করে, পরিণত হয়, বৃহৎ হয়। কিন্তু এই দুটি ভূমিতে কর্ম যোগীর কর্ম যেমন হতে পারে আবার প্রাকৃত ভূমিতেও তেমন কর্ম থেকে যেতে পারে। যোগীর কর্ম হলে এর পরের ভূমিকার সন্ধান পাওয়া যাবে, গীতা যাকে বলেছেন কৃৎস্নকর্ম। যথার্থ যোগী অকর্তা হয়েও কর্ম করে চলেছেন, তাই এই ভূমিকেই যোগভূমি বলা যায়। বিবিক্ত তটস্থ থেকে তাই কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম, এইভাবে সিদ্ধ হয়ে চলে। তখন দেখা যায় সমস্ত দুনিয়াই কর্ম করে চলেছে এক দিব্যসংকল্পের বাহন হয়ে, এই পৃথিবীতে সেই দিব্যসংকল্প সিদ্ধ করতে। যেমন আমি তেমন প্রতিটি জীবই এক "নিমিত্তমাত্র" হয়ে কর্ম করবে—এই নির্দেশ স্বয়ং শ্রীভগবানের। এই নিমিত্ত কর্ম পূর্ণ হবে ও পরিণতি লাভ করবে দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠায়। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের বিবৃতিতে প্রধানত গীতার মহান আদর্শ অনুসরণ করে তাতে দিব্য-ভাবনার সমাবেশ ঘটিয়ে দিব্যকর্মকে সম্ভাবিত করেছেন। ভগবানের অবতার কর্মে অংশ গ্রহণ করে দেবকর্মকে মূর্ত করে তোলার আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে কর্মযোগের প্রসঙ্গ শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে। পরে এ বিষয়ে আবার বিশদ আলোচনা করা হবে। আমরা এ পর্যন্ত নিশ্চিত করে বুঝলাম যে ভগবানের অচ্যুত প্রতিষ্ঠা থেকে পূর্ণযোগের দেবকর্ম কখনই বিযুক্ত হতে পারে না। কর্তা ও কর্ম অদ্বৈত রসে সাযুজ্য লাভ করে সিদ্ধকর্ম সম্ভাবিত করে চলতে থাকেন, জ্যোতি থেকে উত্তর জ্যোতিতে তার নিত্য নবীন দিগন্তগুলি খুলে যেতে থাকে।

কর্মযোগে গীতার মহান আদর্শ দুটি মূল ভাবের উপর বিধৃত—সমত্ব ও একত্ব। ভগবানের আত্মসমর্পণ কর্মে প্রথমে একত্বের ভাবনায় যেমন জগদতীত পরমাশক্তির আবেশ, সমত্বের ভাবনায় তেমন বিশ্বব্যাপী বৃহতে পরাশক্তির

উন্মেষ সূচিত হয়। গীতায় দেখতে পাই প্রথমেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সমাধান দেখানো হল পরম একত্বে, যেখানে মৃত্যুর বা অসৎ থেকেই জীবনের উৎস সেই সর্বোচ্চ গ্রামের সুরে জীবনসঙ্গীতকে বেঁধে দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অবিনাশী তু তদ্‌বিদ্ধি…", সে এক অবিনাশী পরম সত্তাই (oneness) সমগ্র জগৎজীবন ছেয়ে আছে, তাকে জানো। তাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বোঝ যুদ্ধ করবে কি না। এই অবিনাশী এক আত্মাকে জানা, এতেই শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের ভাবনার মূল বেঁধে দিয়েছেন। সেই সর্বব্যাপী একপ্রাণই যেমন আমার মাঝে তেমনি সর্বভূতে স্পন্দিত। অস্পন্দ আধারে প্রথম স্পন্দের মত তাঁর কর্ম নিঃসৃত হয়েই চলেছে এই প্রাণস্পন্দের সাথে সাথেই। "একো দেব সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাস সাক্ষী চেতা কেরলোনির্গুণশ্চ।" সেই একমেবই সর্বভূতে একদেবই মহেশ্বর রূপ, তাঁরই কর্ম তিনি কর্ম করে চলেন। এযুগেও co-operative movement-এ সকলে মিলে কাজ করার প্রেরণায় এই মূল একত্ববোধের আভাস মেলে। এতে সঙ্ঘশক্তি দৃঢ় হয়। অহংও ক্ষীণ হয় যদি সকলেই সেই বিরাট ভূতমহেশ্বরেরই অংশ এইভাবে কর্ম করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

একত্বের পরেই সমত্বের কথা আছে "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। একত্ব বা ঈশ্বরভাবনা পিছনে রেখে চেতনাকে ব্যাপ্ত ও বৃহৎ করলে ঘটে ঘটে রামদর্শন বা সর্বাত্মভাব আসে। সে অবস্থায় সমত্ব রাখার অর্থ কর্মের স্রোত যে ধাক্কাই আনুক না কেন, তাতে অচল অটল সুমেরুবৎ দৃঢ় থেকে নিজকে বজায় রাখা। কর্মের অধিকার পেয়েছি তাই কর্ম করি। সমষ্টি চৈতন্য থেকে আমার এই অধিকারের মূলে তাঁরই প্রেরণা, এই ভাব। এতে ফলাকাঙ্ক্ষার দোষ কেটে যায় এবং কর্ম হয় নিষ্কাম। জগৎ হিতের জন্য কর্ম করি আর নিজের আদর্শ ধর্মবোধ নিয়ে কর্ম করি কাঁচা আমিটা স্ফীত হতে থাকলেই সর্বনাশ। কিন্তু

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহাপ্রাণও যে কেঁদেছিল সর্বমানবের কল্যাণ কামনায়। সবাকার কান্না তাঁর আত্মাকে অভিভূত করেছিল দিব্য প্রেমে। তাই তাঁর বিরাট কর্মপ্রেরণায় সর্বজীবের পুষ্টি ও কল্যাণ। এ ভাবে দেখতে পারলে কর্ম নিষ্কাম হয়। অকর্তা হয়ে ভগবৎ প্রেরণায় নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত হলে কর্মের ও ফলাকাঙ্ক্ষার দোষ কেটে যায়। কর্মফলে ব্যর্থতা এলেও হতাশ ভাব আসতে পারে না। জগদতীত এক পরম বিধান যে কর্মের ভার তিনি দিয়েছেন তাই আমার সহজ কর্ম। আমার সমস্ত মন বুদ্ধি অহং দিয়ে যা করবার করে যাই কিন্তু এই কর্মের প্রযোজক ও কর্মফলের হেতু তো তিনিই। এই বোধে সমতার প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু কর্মে সমতার প্রতিষ্ঠা অত সহজ নয়। মনুষ্যর বুদ্ধি লাভ-লোকসানের হিসাব করেই থাকে। কিন্তু বুদ্ধিমান জানে যে কর্ম না করে থাকা যায় না। এবং ফলাফল তাঁর হাতে রেখে নিয়ত কর্ম করে যেতে হবে। কেন না কর্ম না করে ক্ষণমাত্রও থাকা চলে না এবং কর্মের প্রেরণায় ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকে। তাই একমাত্র তাঁর কর্ম বুঝে কর্মের বিচার তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পারলে কর্মফল ত্যাগ করা যায় ও কর্মও সহজ হয়। সেজন্য এই সমতাও সাধনা করে লাভ করতে হয়। তাতে প্রথমেই তিতিক্ষার কথা আসে; যা আসে আবার চলে যায় সেই সব আগমাপায়ী ঝামেলাগুলি সহ্য করতে হবে। "আঘাত খেয়ে অচল রব" এই রকম জোরালো এক সংকল্পশক্তি চাই। এই তিতিক্ষার পরিণামে ভিতরটা যখন পাষাণের মত হয়ে যায় তখন এক শক্তি জাগে। একটা dynamoর মত অবস্থা হয় কাজেই সে শক্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং ক্রমে বেড়ে চলে। বহির্জগতের যে আঘাতগুলি আক্রমণ করে সেগুলিও তখন রূপান্তরিত হয়। তাতে ঐ শক্তির বিকিরণে অন্য কেন্দ্রগুলিতেও কাজ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেবকর্মের অবস্থা এসে পড়ে। তাঁর দিব্যসংকল্পই আধারে

আধারে বহন করে চলেছি। ঝলকে ঝলকে এই পাষাণের নিষ্প্রাণতা থেকেই যেন শক্তি উৎসারিত হয়ে চলেছে। সমতার এই চরম অবস্থায় সহস্রবার ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও সেই দিব্য সংকল্প রূপায়িত করে চলতে হয়। কাজেই দেখতে পাই যে আত্মরতির তিতিক্ষার শক্তি দিয়ে মৃত্যুও জয় করা যায়।

এইভাবে আমরা কর্মে আত্মসমর্পণকে প্রাত্যহিক জীবনের কর্মে রূপ দিতে শুরু করতে পারি। প্রথমে সমস্ত কিছুকে সহ্য করতে হবে। কর্মে অধিকার আছে কর্মফলে নয়, এই বোধ জাগ্রত থাকবে। এ থেকে অকর্তার বোধ এলে অহং ক্ষীণ হতে হতে গলে যাবে। তটস্থ উদাসীন থাকলে চিত্ত মার্জিত হবে এবং তাতে মহাপ্রকৃতির সঙ্কল্প তখন প্রতিভাত হবে। এইভাবে জীবনের চলা ফেরায় কর্মকে যোগে পরিণত করতে পারি।

৯

যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর

কর্মযোগের সাধনায় কর্মে আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গে প্রথমেই একত্বের অনুভবের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেই একত্বের বোধ যাতে তিনি বা এক চৈতন্য যে জগৎ ছেয়ে ও তাকে ছাপিয়ে আছেন সেই বোধে যুক্ত থেকে সবার সঙ্গে এক হওয়া, এই হল দিব্যকর্মযোগের প্রথম লক্ষণ। আর তাতে স্থিত থেকে সমত্ব রাখা হল একত্বে প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই সর্বব্যাপী একত্বের বোধে সমত্ব রেখে নিষ্কাম কর্ম করার মূল কথা হল, আসক্তি ত্যাগ করা—"যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" সেটা অত সহজে হয় না। আসক্তি না থাকলে যেন কর্মের প্রেরণাই থাকে না, এমনও মনে হতে পারে। অনেক সময় সবার সঙ্গে যুক্ত থেকে কর্ম করার ফলে সে-কর্মের যে-প্রভাব আমাদের প্রত্যেকের উপরে পড়ে, তাতে বিক্ষোভ উপস্থিত হতে পারে। তার মধ্যে সমত্ব রেখে জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ সব-কিছুতে অবিচলিত থেকে কর্ম চালিয়ে গেলেও নিজের বিক্ষোভ থেকে নিজের কাছ থেকে যেন মুক্তি পাওয়া যায় না। তাতে নিজেকে শান্ত রেখে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু চঞ্চল হলে, অস্থির হলে চলবে না। তাই বলা হয়েছে কর্ম করবে কিন্তু ফলের কথা ভাববে না। এ থেকেই আসক্তির কথা আসে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বা চাপে পড়ে কর্মফলের আশা ত্যাগ করলে সেটা যোগের পর্যায়ে পড়ে না। "অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে—অযোগী ফলে আসক্ত হয়ে বাসনার ক্রিয়ার দ্বারা বদ্ধ হয়।" কাজেই কর্মফলে সচেতন থাকতে হবে, অন্ধের মত চললে হবে না। উদ্দেশ্য বা কর্মফল আমার কাছে বেশ স্পষ্ট তবুও

সেটা আমার ছক অনুযায়ী না হলে বিচলিত হওয়া কিছুতেই চলবে না। এই দিক যদি জীবনে সিদ্ধ করতে চাই, তাহলে তাঁরই হাতে ফলাফলের দায়িত্ব দিয়ে সচেতন আনন্দে কর্ম করতে থাকলে যজ্ঞবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। গীতায় শ্রীভগবান যেমন বলেছেন "যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ"। যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম না করলে লোক কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। এই নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিস্তৃত আলোচনা আছে। যজ্ঞের মূল কথাই হল ত্যাগ। যেমন বলা হয়েছে সমস্ত জীবনই যোগ—All life is yoga, ঠিক তেমন ভাবেই বলতে হয় সমস্ত জীবনই যজ্ঞ All life is sacrifice। এখন আমাদের বুঝতে হবে এই যজ্ঞ বা ত্যাগ কি? কাকে উদ্দেশ্য করে ত্যাগ করব, কিভাবে করব এবং যজ্ঞফলই বা কি, এ সবই ভাল করে জেনে নিতে হবে।

যজ্ঞ একটি সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে যজ্ঞের বিবর্তন নানা আকারে সব কর্মেই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। সহজভাবে হিন্দুধর্মে আজও এই ধর্মানুষ্ঠানের প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়। অন্য ধর্মে ক্ষীণ হতে হতে এ সব ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান প্রায় লুপ্ত বললেই হয়। Catholicদের ধর্মে কিছুটা অনুষ্ঠান আছে যাতে যজ্ঞভাবনার প্রভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষে যজ্ঞের অনুষ্ঠান যে কি প্রবল হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছিল, তা বোধকরি সর্বজনবিদিত। গীতায় তাকেই বলা হয়েছে "ক্রিয়াবিশেষবহুল"। যজ্ঞানুষ্ঠানের মূল কথাই হল দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, মীমাংসকের এই মত। গীতা বলেন, দ্রব্যযজ্ঞে দেবার বস্তু সাধারণত খাদ্যাদি উপচার। কিন্তু যজমানকে যে বলতে হয় "ইদং তব ন মম", এই ভাবই হল যজ্ঞমূল। দেবতাকে নিবেদন করে আত্মাহুতিই হল প্রকৃত কর্ম, আর সব বিকর্ম। বেদের ভাষায় এই কর্মই সুকৃত, কিনা সমর্থ ও সার্থক কর্ম। তখন যজ্ঞ ও কর্ম সমার্থক। এ থেকে

পরে ভাল ও মন্দ দু'দিকই এসেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কর্মই যেন কর্মযোগে গণ্য হয় না, এমন ধারণাও এসে পড়ে এবং অনুষ্ঠানগুলি হতে থাকে ক্রিয়াবিশেষবহুল। পূজা-অর্চনাই যদি একমাত্র দেবকর্ম হয় তাহলে জীবনে ভাগাভাগি এসে যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন জীবনের সমস্ত কর্মই যজ্ঞ বা দেবকর্ম হতে পারে। জীবনের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্রিয়া ও কর্মানুষ্ঠান—এই হল ভাবমূল। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একথা বলেছেন এবং তারও পূর্বে উপনিষদে, ঘোর আঙ্গিরসের মুখে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ শুনেই আপিপাস হয়ে গেলেন, এই আখ্যান আমরা শুনেছি। সমস্তজীবনই তাহলে সোমযাগ এবং পুরুষই যজ্ঞ। তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে অমৃত আনন্দের উচ্ছলন। গীতায় অনাসক্ত যোগের মূল ভাব এই আপিপাস হওয়া। আবার জীবনের সব কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমার বলতে দ্বিতীয় আর কিছু থাকে না। এই ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করা ও কর্মযোগে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।

কিন্তু এই শাশ্বত যজ্ঞবিধিই যে জগৎসৃষ্টির মূলে, শ্রীঅরবিন্দ তা ধরিয়ে দিয়েছেন। গীতা থেকেও এই প্রাচীন ভাব ধরে যজ্ঞসহিত প্রজাসৃষ্টির ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ বিশদভাবে করে দিয়েছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে দেবতার আত্মাহুতি বা পুরুষযজ্ঞের কথা পেয়েছি। দেবতার আহুতির নাম হল বিসৃষ্টি। তন্ত্রমতে পরমশিব স্বেচ্ছায় জীবভাবের মূলে পাশবন্ধন স্বীকার করেছেন, সেটাই পুরুষযজ্ঞ। আবার এই যজ্ঞদ্বারাই পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত সদাশিব হতে পারবেন। মানুষের দিক থেকে যজ্ঞপথে উজানে যাবার নাম হল উৎসর্গ বা অতিসৃষ্টি। দেবতা সৃষ্টিতে নেমে এলেন বিচিত্রভাবে, তাই সেটা হল বিসৃষ্টি। আর মানুষও সেই বিধি অনুসরণ করে নিজেকে ঢেলে দেয়, উৎসর্গ করে। তাঁকে দিলে নিজকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়তে হবে। দেবতাই মানুষের আধারে পূর্ণভাবে বিকশিত হবেন বা যজ্ঞদ্বারা

যজমান হিরণ্যশরীর লাভ করে দেবতা হবে, তাই মানুষের যজ্ঞ হবে অতিসৃষ্টি। মানুষের এই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করাই হল যজ্ঞ বা ত্যাগ। এই যজ্ঞকর্ম শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অভিসন্ধিশূন্য হবে। কোনও মতলব বা ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকলে চলবে না।

প্রাচীনেরা এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে তিন রকমে ভাগ করে দেখিয়েছেন, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য অর্থাৎ কোন কামনায় যজ্ঞ করলে তারও নানা প্রকার আছে। কাম্য কর্ম প্রাচীন কালেও নিন্দিত ছিল। আবার বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে তাকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ যথাক্রমে কাম্যকর্ম ও নিষ্কামকর্মের নির্দেশ দেন। নিত্য-কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে করতে চিত্তশুদ্ধির ফলে যজমান নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। তাই নিত্যযজ্ঞ এক অবশ্য কর্ম। প্রাচীনকালে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান এক নিত্য কর্তব্য কর্ম ছিল। অগ্নিদেবতাকে রক্ষা করে, তাতে প্রতিদিন আহুতি দিয়ে বলা হত "ইদং তব ন মম।" আহুতিটি হবে নিষ্ক্রয় (ransom), আত্মাহুতির প্রতিনিধিস্বরূপ। গীতাতেও এইরকম দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ এ তিনটি যে ওতপ্রোত তা দেখানো হয়েছে। আবার ভক্তের লক্ষণ দেখিয়েও গীতা বলেছেন আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী, এই চার রকম সাধক আছে। এর মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী দেবতাকে দেয় কিন্তু প্রতিদানে কিছু চায়। এ ভাবেও চিত্ত পরমতার দিকে এগিয়ে যায় ও ক্রমশ চিত্ত শুদ্ধ হয়, এই লাভ। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে যজ্ঞ করাই শ্রেয়। নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান ঠিকমত হলে ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর পদবীতে আরূঢ় হয়ে অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হন। শেষ পর্যন্ত যজ্ঞের অর্থই হল আত্মদান—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন (self-surrender)। সম্পূর্ণ করে নিজকে দিতে পারলে তবেই সেই শূন্য স্থান পূর্ণ হয় দেবতার দানে। চিত্ত ভরে ওঠে প্রসাদে।

শ্রীঅরবিন্দ এই আত্মনিবেদন ও পরম প্রাপ্তির প্রসাদ যে অন্যোন্য সম্বন্ধযুক্ত, সেটি ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গীতাতেও তার আভাস আছে। দেবতাকে ঠিক ঠিক দেওয়া হলে তাঁর প্রসাদ নেমে আসেই, এ-বিধি শাশ্বত ও সুনিশ্চিত। প্রেমাশ্রিত কর্মে আত্মনিগ্রহ (self-immolation) বড় কথা নয়। যদিও প্রকৃতিতে বিকৃতি থাকলে কিছুটা প্রয়োজনমত নিগ্রহ করতেও হয়। কিন্তু বান নেমে আসেন এখানে, মানুষের মধ্যে। মানুষ প্রেমের অধিকারে এই ক্ষুদ্র অহং-এর বেদিতেই অনন্তের সিংহাসন গড়ে তুলতে পারে। জ্ঞানে ও ভক্তিতে রসোজ্জ্বল যে-কর্ম, তাতে আত্মনিবেদন করলে নিগ্রহ কোথায়? কোন প্রত্যাশা তাঁর কাছে নিয়ে আসিনি, কিন্তু তাঁর দান দুহাত ভরে গ্রহণ করব, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়টি মেলে দিয়ে তাঁকে নিয়ে জীবন ভরে তুলব। দেবতাই যে এই আধারে দিব্যসংকল্প মূর্ত করে চলেছেন, প্রেমময় কর্মের ভিতর দিয়ে। তাই তো চরম দেওয়া বা ত্যাগ আর পরম পাওয়া একই কথা। তাঁকে পাওয়ার কথায় ভালবাসার কথা আসে। ভক্তিসিদ্ধান্তে বৈষ্ণবদের রতি সম্বন্ধে সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা এই তিন নামে ভক্তের অধিকার-ভেদ দেখানো হয়েছে। সাধারণী বলে, আমি তোমাকে আমার জন্য ভালবাসি, তুমি চাও কিনা জানি না, বুঝিও না। সমঞ্জসা রতি দিতে চায় ঠিকই, আবার তাঁর ভালবাসা পাওয়ার বোধটিও তার ঠিক থাকে। তাই বিশুদ্ধ এক লীলারসের সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে তার গড়ে ওঠে। আর সমর্থা রতিতে সব দেওয়ার অর্থ হল রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় "বেশি কেটে জলে যাওয়া।" সকলে এর অধিকার পায় না এটাও যেমন ঠিক, আবার এমন সময়ও আসে যখন তা না করে উপায় থাকে না। কিন্তু নচিকেতা ও সাবিত্রীতে আমরা যেমন দেখেছি, ফিরে আসার পথটিও যেন ঠিক থাকে। সেজন্য সমঞ্জসা রতির ভাবই জীবনে সমতা রক্ষার ও যোগকর্মের সহায়ক বেশী, এই ভাবের উপর শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়েছেন। ধ্রুব জানি, তিনি ডেকেছেন বলেই আমার এই আকুলতা ও তাঁকে

পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা। তাঁর প্রেমের কাছে উজাড় করে দিতে চাই আমাকে ও আমার বলতে যা-কিছু আছে। তাতে তাঁকে পাবই আর আমার সব পাওয়াও যে তাতে। এই দেওয়া ও পাওয়া যে শাশ্বত বিধান, এ বোধ স্পষ্ট থাকে। এই যে ভালবাসা ও আত্মত্যাগ, এটাই যজ্ঞ। এতে বৃহতের ধারণা, ঈশ্বরবোধ এসব সহজেই আসে। যদি মনে করতে পারি সমস্তই তিনি, তখন আত্মীয়স্বজন, প্রিয় পরিজন সমস্তের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ ও বিকাশ দেখতে পাব। তখন সবই তিনি—এই বোধে তাদের সেবা করলে সেই সেবাকর্ম যজ্ঞকর্ম হবে, ত্যাগে মধুর হবে। সন্তানের মধ্যে গৌরী ও গোপালবোধ এবং স্ত্রীকে মহাশক্তিরূপিণী দেখতে পারলে, সংসার প্রতিপালনের প্রতিটি কর্মই ত্যাগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে দিব্য হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ এই শাশ্বত দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কটি সহজ জীবনের ছকে দেখিয়ে আবার তা থেকে যজ্ঞভাবনা নিয়ে উজানে যাওয়ার পথটিও দেখিয়েছেন। মানুষের সমাজে ও সংসারে এই দেওয়া-নেওয়ার ধারা প্রথমদিকে একেবারে জৈব নিম্নপ্রাণমনের স্তরে থাকে। সেখানে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রয়োজন সিদ্ধির ভাবটাই প্রধান। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ ভালবাসার বোধ জাগলে, মনে আদর্শবোধ জাগে। এটা উচ্চস্তরের প্রাণ ও মনের ক্রিয়া। ধর্মসংসার কল্পনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস তখনই দেখা দেয়। হরগৌরীর লীলাবিলাস ভাবনা ধর্মসংসারের মূলে, কিন্তু সেখানেও ভগবানের প্রকট রূপটি সহজে ধরা পড়ে না। আরোপের ভাব নিয়েই আরম্ভ করতে হয়। সেজন্য এর চেয়েও উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ভাব হল তাঁকে পেয়ে, 'বেদান্তজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার করা।' তখন সব থাকলেও তিনি, আবার সব ছাড়লেও তিনি। ত্যাগের ঐশ্বর্যরূপে সংসারে ভোগ করা তখনই সম্ভব। গার্হস্থ্য জীবনে যজ্ঞের এই পরম ভাব প্রকটিত দেখতে পাই যাজ্ঞবল্ক্যের বেলায়। তিনি মৈত্রেয়ীকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বুঝিয়েছিলেন যে, স্বামী স্ত্রী পুত্র বিত্ত ইত্যাদির

সম্পর্ক জীবনে যা জুড়ে রয়েছে তা সবই প্রিয় আত্মার জন্য। তাই ভালবাসার জন্য সবই উৎসর্গ। সংসারে এই হল প্রেমের যজ্ঞ। পরে যাজ্ঞবল্ক্যের বাণী আরও গভীর সুরে ধ্বনিত হল। তিনি আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করলেন, বলেছিলেন "তুমি ও আমি চণকের এক দ্বিদল দানার মত এবং তাই (স্ত্রী) দিয়েই আমার আকাশ পরিপূর্ণ।" অদ্বৈতজ্ঞান আমরা এইভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনকেও এই রকমভাবে পূর্ণ করতে পারি।

তাহলে দেখতে পাই যজ্ঞে দেওয়ার মধ্যে নিগ্রহের কথা ওঠে না। যজ্ঞ, দান ও তপঃ গীতায় বলা হয়েছে, এ তিনটি একই সঙ্গে আসে। এই তপস্যাই হল যোগের সংযম। জোর করে চাপিয়ে দিলে সেটা হয় পীড়ন। কিন্তু শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া মানুষের কর্ম, পশুর নয়। উপবাস সংযম ইত্যাদি অনেক সময় নিগ্রহের আকার ধারণ করলেও মূলে এটি আত্মশুদ্ধি বা সংযমের তপস্যা। মানুষের আধারে সাধারণত অনেক অশুদ্ধি থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণ বিক্ষেপ ও আবরণ দিয়ে সত্ত্বগুণকে (বুদ্ধি) বিভ্রান্ত করে। কিন্তু একাগ্র ও সংযত হয়ে প্রকৃতিতে গুণসাম্য ঘটাতে পারলে প্রচণ্ড তাপ বা শক্তি সঞ্চারিত হয়। নিঃসঙ্গ হয়ে এই আত্মসংযমের তপস্যাই যোগীর আত্মকর্ম ; বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহ একাগ্র ও সংহত হয়ে প্রচণ্ড তপঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে-শক্তি অপরাজিতা। সেজন্য এই আত্মকর্মই হল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ম।

নিগ্রহ ও সংযমে যেন আমরা গোলমাল করে ভুল না করি। একাগ্রতা না থাকলে মানুষের জীবনে কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না। Repression বা আত্মপীড়নের ফলে, অবচেতনের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় যথেচ্ছাচার ও অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগের ইউরোপীয় মতবাদ, আধুনিক যুগে আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেছে। সেটা ধ্বংসের পথ, জাতির অবক্ষয়ের সূচনা। বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহ একাগ্র করলে আত্মসংযমের প্রচণ্ড

শক্তি উৎসারিত হয়। এই হল যোগের পথ। সেজন্য তপ যোগের উপায়, সেটা নিগ্রহ নয়। আতস কাঁচের ওপর সূর্যকিরণ সংহত হয়ে যেমন প্রচণ্ড তেজে আলোক সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্রভাবে সংযমের শক্তিতে সিদ্ধ হলে যজ্ঞে আত্মহুতিও তখন সম্ভব হয়। যোগীকে এই একাগ্রতাই নির্জনে অভ্যাস করতে হয়।

এর পরে আসে দানের কথা। সর্বভূতে যা আছে, তাই আবার তাঁকে দিতে হয়। এটা লৌকিক বুদ্ধিতে করলে হয় দান, আর তাঁরই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলে হয় যজ্ঞ। সবার মধ্যেই তুমি আছ, তোমাকেই দিচ্ছি। আবার আমার জন্যও যে আমি গ্রহণ করি, তাও তোমারই জন্য। তাই তোমারই জন্য আমার আত্মপ্রসাধন, তোমারই জন্য আমার আত্মসংযম। প্রাচীন কালে গৃহস্থদের পঞ্চাগ্নি বা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ছিল। এগুলি আত্মশুদ্ধির উপায় তাই কোন না কোন ভাবে করতেই হবে। লৌকিক ভাবের স্তরে দানই যজ্ঞরূপে আরম্ভ হয়, কিন্তু নিয়ে চলে লোকোত্তর ভাবে। সকাম কর্ম থেকে নিষ্কাম কর্ম বা কর্তব্য কর্মের এই যে নির্দেশ, কর্মযোগে যজ্ঞভাবনায় এটি সম্পাদিত করতে একত্ব ও সমত্ব রেখে চলতে হবে।

কিন্তু কর্মের গতি তো গহন, কি করে জানা যাবে কর্তব্য কর্ম কি! জীবনের সামনে পরম্পরাক্রমে যা আসে তা করে যেতে হয়, তাতে সাধারণ কর্তব্য কর্ম জানা যায়। কর্মে অবিচলিত থাকা আর আঘাতে স্থির ও অটল থাকা, এসব লক্ষণ নিয়ে কর্ম করতে শুরু করলে, কর্ম ঠিকমত করে যেতে দ্বিধা ও সংশয় আসতে পারে। কতকগুলি কর্মকে কর্মযোগের শাস্ত্রবিহিত কর্ম বলেও নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু তাতেও সংশয় উপস্থিত হলে পরে শাস্ত্র ও মহাজনের নির্দেশ নিতে হয়। তাকে বলে কর্মবিচিকিৎসা। এ সবই ফলাকাঙ্ক্ষা না

রেখে কর্ম করা। কিন্তু এহো বাহ্য। আসলে মনে মুখে এক হয়ে সব কিছুতে তাঁকে দেখে তাঁরই কর্ম করার কথাই যে শুনেছি, সেই তিনি কে? তিনি আমার ইষ্ট, আমার প্রভু আমার দেবতা। সেই দেবতাকে নামরূপ দিয়ে স্বীকার করে তাঁর পূজাই আমার সংসারের কর্তব্য কর্ম। তিনি সাক্ষী অন্তর্যামী গৃহদেবতারূপে যেমন আমার অন্তরে-বাহিরে, তেমনই আবার সবাকার অন্তরে-বাহিরে সর্বব্যাপী চৈতন্ত তো তিনিই। তাই কালী কৃষ্ণ যে নামরূপই তাঁকে দিই, সে সবই তাঁর ভাবরূপ। আবার ভাবকে ছাপিয়েও তিনি ভাবাতীত নিরঞ্জন, এটা তো কোন সময় ভুললে চলবে না। এটা ভক্তিতে পাওয়ার কথা। বৈদিক যুগেও প্রতি গৃহে অগ্নি জেলে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সেই অগ্নি সাক্ষী রেখে প্রতিদিনকার কর্তব্য কর্ম নির্বাহ করার ব্যবস্থা ছিল। আমরা অনেক সময় মনে করি নাম ও রূপের আশ্রয় না পেলে অনন্তকে বুঝি ধারণাই করা যায় না। সেভাবে মানুষের মধ্যে ভক্তি প্রথম স্ফুরিত হয় বটে, তা থেকে আবার বন্ধনও এসে পড়ে যদি না নামরূপের পিছনে সেই বৃহৎকে অনন্তকে ধাবন করতে পারি। গীতাতে যেমন দেখি, ভগবান গোড়াতেই অর্জুনের ক্লৈব্যকে আঘাত করলেন অজ সনাতন অবিনাশী সেই এক আত্মাকে দেখিয়ে, যে কে কাকে মারে? শ্রীঅরবিন্দ সেই রকমভাবে এখানে সেই বড় কথাই মূলে ধরিয়ে দিয়েছেন যে সবই শাশ্বত আত্মা। ওইভাবে আঘাত পেয়ে এক সর্বব্যাপী শূন্যতাকে না পেলে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় না। প্রাচীনেরা নামরূপের মাধ্যমে বিগ্রহবত্তা দেখিয়েছেন, কিন্তু কখনও শুধু তাতেই বাঁধা পড়েননি। ভক্তিশাস্ত্রের সার যে ভাগবত, তিনিও প্রথমেই "সত্যং পরং ধীমহি" বলে সেই বিরাট অরূপের আশ্রয়ে লীলাবিগ্রহকে সর্বদাই ধরিয়ে দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ যজ্ঞেশ্বরকে সেখানেই বসিয়েছেন, তিনিই জীবনযজ্ঞের অধিপতি।

তাঁকে যেন নামরূপ দিয়ে খণ্ডিত করে কখনও না দেখি। সেই বিরাট যে ক্ষুদ্র হয়ে সীমিত হয়ে আমার কাছে ধরা দিতে পারেন, এ তাঁরই মহিমা। ভক্তির উচ্ছ্বাসের আতিশয্য এই মহিমা-বোধকে কখনও যেন খর্ব না করে। প্রাচীনেরা আকাশ ভাবনা দিয়ে তাঁকে ভাবনায় ধারণা করতে শিখিয়েছেন। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"—সর্বব্যাপী নির্লিপ্ত সেই আকাশ অধিষ্ঠানরূপে সদা বর্তমান। নামরূপকে ধরেও তিনি, আবার নাম রূপ সব তাতে গলে গেলেও তিনি। যখন বহির্ধা আকাশকে দেখে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়ে অসীম হয়ে যায়, তখন সেই বহিরাকাশবোধকে দেখতে পাই আমার অন্তরে। অন্তরের সেই আকাশকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। সেই হার্দাকাশে ব্রহ্মই ইষ্টরূপে উপস্থাপিত। আমার ইষ্টই ব্রহ্ম। সেই কেন্দ্র হতে শক্তির অনন্ত উল্লাস। সে-শক্তি ব্রহ্ম। বিষ্ণুরূপে শিবরূপে শক্তি-রূপে সেই ব্রহ্ম। এই ইষ্টব্রহ্মের যুক্তভাবনা এখন যেন আমরা ভুলে গেছি, এমনও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীনেরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারেরা যেমন ঈশ্বরকে ব্রহ্মে উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি পরে শক্তিসাধনার যুগেও আমরা সেভাবে এক করেই বুঝতে পেরেছিলাম—'কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সৎচিৎ আনন্দ।. তাঁর শক্তি ও আনন্ত্যের লক্ষণটি এইসঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করলেই উদ্দীপনা আসে। অসীম অনন্ত চৈতন্য সত্তা আকাশবৎ, তার কূল পাওয়া যায় না। তাতেই'দেখি আবার সমুদ্রবৎ যে-জগৎ উল্লসিত, তারও থৈ পাওয়া যায় না। বৃহৎ সর্বব্যাপী চৈতন্যের প্রপঞ্চোল্লাসই শক্তি; ওষধি বনস্পতিতে, ঘটে-ঘটে সবার মধ্যে, সবার পিছনে সব ছাপিয়ে, সেই একদেব। তিনিই তো আমার ইষ্ট, আমার যজ্ঞেশ্বর। এই বৃহতের পরিবেশে হৃদয়-বেদীতে তাঁকে বসাতে হবে, তবেই না অন্তর্যামী যজ্ঞেশ্বরকে চিনতে পারব। আমার যজ্ঞের উৎসর্গ তখনই সার্থক হবে।

এভাবে পাওয়া যায় সকলের শেষে, তাই প্রথমে নিজকে বাদ দিয়ে নিজের বাহিরেই তাঁকে একভাবে পেয়ে সাধনা শুরু করতে হয়। সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে বৃহৎকে জুড়ে নিয়ে, শেষের লক্ষ্যকেই মূলে ভাবনায় আনতে হবে। এও গীতার কর্মকৌশল। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন "জ্ঞানীর হেথা হেথা, অজ্ঞানীর হোথা হোথা"। এটা ভক্তিরও অনুকূল। তারই মধ্যে আমি বা যা-কিছু সসীম, সে সবই। এইভাবে বৃহতের অনুভব—সেই ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে মীন হয়ে বিচরণ করার মত। ব্রহ্মসমুদ্রে আমরা সকলেই ডুবে আছি। ইষ্টভাবনাতে এভাবে জারিত হতে পারলে পরাক দৃষ্টিতেও তাঁকেই দেখা যায় ও আত্মতুষ্টি হয়। এত বড় করে না ভাবতে পারলে ধর্মকর্ম প্রাণহীন অনুষ্ঠান কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মকে বিভূতি বা শ্রী রূপে জীবনে কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? কালী কেমন? না 'ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন'। তিনি যে ইচ্ছাময়ী এই আকাশ-বাতাস সব তিনিই হয়ে আছেন, তিনিই প্রাণ, ব্রহ্মের প্রাণসমুদ্র—সে তো তিনিই। অহরহ এ ধরণের ইষ্ট ভাবনা থেকে সাযুজ্যবোধ আসে। এই সাযুজ্যবোধে উপাসক ইষ্টের সঙ্গে একাকার হন।

যাদের আবার আত্মভাব প্রবল থাকে, সাযুজ্যে তাদের আত্মচৈতন্যের এক বিস্ফারণ ঘটে। বেদান্তের ভাষায় সেটি হল অহংগ্রহের উপাসনা। এ বিচারের পথ। বহির্জগতের যা-কিছু সেসব আমার চৈতন্যে রূপান্তরিত না হলে যেমন কিছু বুঝি না, তেমন আমারই আত্মচৈতন্য বিরাট, স্থির ও পর্ণ—"আপূর্যমাণ্‌ম অচলপ্রতিষ্ঠ্‌ম"; সব ভাবরূপ তার মধ্যে পড়ে একাকার হয়ে যায়, এই দেখতে পাই। কোন তরঙ্গ আর শেষ পর্যন্ত ওঠে না। এভাবে অহংগ্রন্থিটি একেবারে খুলে গেলে, উপনিষদের ভাবে ভূমার উপাসনায় আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ হয়।

এই দুরকম ভাবে ছাপিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া, তার অধিকারী খুবই কম। শ্রীঅরবিন্দ যেমন দেখিয়েছেন—সর্বব্যাপী চৈতন্যে নিজকে বৃহৎ করে যেন ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দিলাম। আত্মজ্যোতির বিস্ফারণে জ্বলছি, তা থেকে সত্তা মাত্র রইল মহানির্বাণরূপে। রিক্ততার এক মহাশূন্য, সব জ্যোতি মিলিয়ে যায় এক অপরূপ কালোর আলোয়। সেই আভা থেকেই সব কিছু বিভা। এ সর্বনাশা ডাক যেখানে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ফিরে না আসার এক তীব্র আকর্ষণ আছে এবং তা থেকেই জীবন প্রত্যাখ্যানের দর্শন এসে জীবনকেও অধিকার করে। মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ এই জীবন প্রত্যাখ্যানের দর্শন। কিন্তু বুদ্ধের এই পরিনির্বাণকেও পেতে হবে, তবেই শ্রীঅরবিন্দের যোগের ভিত্তি বোঝা যাবে, একথা বলা হয়েছে। নির্বাণের পর এক মহাশূন্য, কোনও বিকল্পের অধীন তা নয়। পরম রিক্ততা ও নিবিড় নীরবতা, আর সেখানেই রয়েছে মূল শক্তির উৎস। সেই মহামরণকে যদি জীবনে অনুস্যূত দেখতে শিখি, তবেই পূর্ণযোগের অধিকার পাওয়া যাবে। এই পরম শূন্যতা ও বৈরাগ্য নিয়ে সংসারে থাকাটা যে অসম্ভব বা খুব কঠিন, তা যেন মনে না করি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখেছি, তিনি মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁকে মৃত্যুর ধ্যান পেয়ে বসেছিল। এও বৌদ্ধভাবনার অনুকূল ধ্যান। এই নিয়ে তিনি সংসারে থেকে গেছেন, কর্ম করে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে সে-শিক্ষাটুকু আমরা নিতে পারি। তিনি বলেছেন তাঁর মধ্যে আছে এক বাউল, যে কখনও বাঁধা পড়ে না। সকলের মধ্যেই সেই বাউল ঘরে-ঘরে এক মহামরণরভসে ঘুরে বেড়ায়, তাকে চিনে নিতে হবে। অনাসক্ত ভালবাসা, শোক ও মোহের অধীন না হওয়া, এইভাবে নির্বাণকে নামিয়ে এনে জীবনে চলতে পারলে সংসার পর্যন্ত উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে ওঠে।

প্রথমে দেখলাম, অহংগ্রহের উপাসনা ও তা থেকে নিজকে আত্তস্ত করা। তখন ভূতভাবন কর্ম হল "বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ"। সমস্ত জীবনটাই এক মহাযজ্ঞ। যখন তাঁকে সর্বত্র দেখি, ওষধিতে বনস্পতিতে তখন আর এক দিক থেকে বলি "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়ে এ সব দৃষ্টান্ত দেখিয়েও গেছেন। তিনি সবার মধ্যে ছোঁওয়া দিয়ে বলেছেন "তোদের চৈতন্য হোক্"। এ যেন এক আশ্চর্যভাবে ফুল ফোটানোর পালা। সবার ভিতরে তিনি, এভাবে দেখতে শিখলে যজ্ঞভাবনা এসে যায়। আমার আচরণ যেন অপরের মধ্যে তোমাকে না আবৃত করে। সবার মধ্যে যে তুমি, তুমি জাগো। তোমাকে অর্ঘ্য দিই আমার সব কিছু ফুলের মত বিকশিত করে দিয়ে। এইভাবে যদি কর্তব্য কর্মে ও স্বভাবে নিজেকে সব সময় বাজিয়ে দেখে নিই, তাহলে কর্মের সঙ্গে জীবনের গতিতে সংঘর্ষ বাধে না। কর্মের গতির অদলবদল হতে পারে যদি আমার নিয়ত কর্ম তাই হয়। এইভাবে জীবন ও যজ্ঞ এক করে নিতে পারি।

১০

যজ্ঞ-ভাবনার উদয়ন

তাহলে কর্মযোগের প্রথম সঙ্কেত হল, কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করা। এ একটা সাময়িক অনুষ্ঠান মাত্র নয়। যজ্ঞভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সমস্ত জীবনব্যাপী সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান সম্পাদিত করতে হবে, গীতাতে এরকম নির্দেশ আছে। আবার দেখলাম বেদে যজ্ঞকে বলা হয় সুকৃত এবং তাই হল কর্ম। আবার যজ্ঞভাবনা না থাকলে সব কর্মই বিকর্ম। গীতা পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, শুধু নিজের জন্য স্বার্থভাবনা নিয়ে কোন কর্ম করলে, সেটা বন্ধনই হয়। আবার সেই কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে মুক্তি, আর তা-ই যজ্ঞ। আধুনিকযুগে দেবতার বদলে মানুষকে বসানো হয়েছে। মানবজাতির জন্য, মানুষের প্রগতির জন্য কর্ম ছাড়া কর্ম যে দেবোদ্দেশে হয়, এখন আর তা কেউ ভাবে না। সমাজ স্থিতিকে বজায় রাখাও যে কর্মের উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন কালেও গার্হস্থ্যাশ্রমে অবশ্য করণীয় ছিল পঞ্চ মহাযজ্ঞ—নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ। সংসারাশ্রমে এগুলি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হলে তবেই তা ধর্মসংসার আখ্যা পেতে পারত। যজ্ঞের মূল ভাব, "ইদং তব ন মম", কিনা তোমারই সব। সেই 'তুমি'র স্থানে আমরা প্রিয়কে না বসিয়ে পারি না। সেজন্য সংসারে ভালবেসে যে ত্যাগ করা হয়, সেটা যজ্ঞ। কিন্তু সেই ত্যাগের মূলে বিরাটের ভাবনা না এলে, যজ্ঞেশ্বরকেও চেনা যাবে না, যজ্ঞভাবনাও ঠিক হবে না। ভাগবতের ভাব অনুশীলন করতে গেলে পাই— "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" এই ভাবে আমি ছেড়ে তুমি বা দেবভাব এলেই প্রিয়ের জন্য ত্যাগ সহজে হয়, আর চিত্তও বৃহৎ হয় ও অনন্তে প্রসারিত হতে থাকে। আধুনিক যুগে মানবতার প্রভাবে, মানুষকেই প্রত্যক্ষ

ঈশ্বর ভাবে গ্রহণ করার দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম ভাবনায় এ কথা নতুন নয়। দরিদ্রনারায়ণের সেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা এ সব উচ্চ আদর্শ ছিল এবং আজও আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেবা করতে গিয়ে 'অহং' যদি বিলুপ্ত না হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে, তাহলে সবই নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে, যত বড় পরিবেশে সেবাব্রত গ্রহণ করা হোক না কেন, ত্যাগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও প্রেমরসে মধুর না হলে, ঈশ্বরবোধ বা ভগবৎসেবার ভাব হবে না। অন্তর্মুখ হয়ে হুঁশে থাকতে হবে, আর তাতেই হবে যোগ এবং তা হতেই কর্ম হবে যজ্ঞ। কাজেই মনুষ্যযজ্ঞই হোক আর দেবযজ্ঞই হোক, হুঁশে থেকে ভগবৎসেবার বুদ্ধি নিয়ে করতে থাকলে, আর একটি তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে। নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করা যায় যে, হৃদিস্থিত পরম দেবতা সবার মধ্যে থেকেও সবাইকে ছাপিয়ে আছেন। তাঁর নাগাল পেয়েও পাওয়া যায় না। দেবতার সম্বন্ধে এই ভাবই হল লোকোত্তরের ধারণা। ঠিক তেমনভাবে, যখন নিজের উৎসর্গ নিজকেও ছাপিয়ে (Self-exceeding) তাঁর দিকে চলে যায়, তাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যজ্ঞ। আবার যাঁর উদ্দেশে এই উৎসর্গ, সব ছাপিয়েও যাঁর কূল পাই না, সেই অনন্ত অসীমই আমার যজ্ঞেশ্বর।

তাহলে দেখছি, যজ্ঞের সাধনাই আমাদের কর্মযোগের পথ। কর্মযোগে জ্ঞান ও ভক্তির আর প্রয়োজন নেই, এমন ধারণাও অনেকের হয়। কিন্তু আমরা জানি শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের গোড়াতেই বলেছেন, কর্ম জ্ঞান ভক্তি আলাদা করা যায় না। গীতার ভাবও তাই। যাঁর কাছে যাব আর যাঁকে উৎসর্গ করব, সব দিয়ে দেব, সেই তাঁর কাছে অনুরাগ না থাকলে যাবই বা কেন, আর দেবই বা কি করে? তাঁর সঙ্গে আমার পরম মধুর এক প্রীতির সম্পর্ক আছে বলেই, তাঁর জন্য সব বিসর্জন দিতে পারি। এই ভাব বা ভক্তি না থাকলে কর্ম যান্ত্রিক হয়ে যায় কিন্তু ভক্তিতে কর্ম সরস হয়। সেই ভাবে

কর্ম করে, আপনাকে যথার্থভাবে দিতে পারলে নিজের স্বরূপকেই ফিরে পাওয়া যায়। স্বভাবে রণচণ্ডী এমন মেয়েকে দেখা যায় যে, ভালবাসার প্রভাবে হয়ে যায় কল্যাণী প্রতিমা। এই ভাবযুক্ত কর্মে চিত্তের উৎকর্ষ হতে থাকে এবং জ্ঞানের পরমে পৌঁছে আত্মাকে জানা যায়। তখনই পরিপূর্ণভাবে ভালবাসায় নিজকে দিতে পারলে বিরাটের ভাব অধিগত হবে। তখন জ্ঞান ও ভক্তির দুই পক্ষ ভর করে, সাধক কর্মযোগে উড়ে চলবে পরম অভীষ্টের পানে।

এই পরম অভীষ্টই যজ্ঞেশ্বর—তিনিই আত্মনিবেদন ত্যাগ বা যজ্ঞ, এ সবের লক্ষ্য। যজ্ঞেশ্বরের ভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিস্তৃত আলোচনা আছে। অসীম ও অনন্তের সেই বোধটি চাই। আমি তো একদিকে সসীম ও সান্ত, আমার চারিদিকে কত দিক দিয়ে গণ্ডীটানা। অথচ আমাকে ব্যাপ্ত করে ও ছাপিয়ে বিরাট পৃথিবীরূপিণী এই যে দৃশ্য জগৎ, এ সবই তো তিনি। তিনি ভূমা, তিনি বৃহৎ, তিনি আকাশ বাতাস সব-কিছু, আবার তিনিই আমার সকল শক্তির উৎস। এইভাবে অনন্ত ও বিরাটের বোধে অন্তরজগতের সঙ্গে, ওই বিরাটের এক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'যখন কথা বলি, মা-ই রাশ ঠেলে দেন।" তেমনি অনন্ত এক শক্তির ভাণ্ডার থেকেই সব-কিছু শক্তি, মনের ক্ষেত্রে প্রাণের ক্ষেত্রে ও জড়ের ক্ষেত্রে, সর্বত্রই উৎসারিত হয়। আমি বা আমাদের এই যে ব্যষ্টি খণ্ডবোধ, তা সান্ত ও সীমিত হলেও, ওই অনন্তবোধে যুক্ত থেকে আমরাও সীমার মধ্যে অসীমকে পেতে পারি। এ কথা যুক্তি দিয়েও বোঝা যায় এবং এতে, আলাদা করে ভগবানের বিগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা না করলেও চলে। অসীম ও অনাদি অনন্তের এক ব্যাপ্তিবোধের আবেশ, আমরা কল্পনায় ও ধারণায় আনতে পারি।

কিন্তু যখন যোগের পথে যাত্রা শুরু হয়, বোধির ক্ষিপ্র ও চমকিত আবির্ভাবে যে রাজ্যগুলি খুলে যেতে থাকে, তার সংজ্ঞা কিভাবে দিতে পারি? শ্রুতি যেমন বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"; কৃপাবাদীও তেমনি

বলবেন যে, তিনি না জানালে তাঁর সঙ্গে যোগের রাজ্য বুঝতে পারি, এমন সাধ্য নেই। তাই যদি তাঁর দেখা নাও পাই, তবুও কালের এমন মুহূর্ত আছে যে, প্রতিবোধের দ্বারা বোধ হয়—এটা স্বীকার করে নিয়ে চলতে হবে। সে প্রতিরোধ কালসাপেক্ষ, তাই তাঁর কৃপা ও কালের কৃপা সমানভাবে পাওয়া চাই। এ ছাড়াও অপরের দৃষ্টান্ত দেখে, তাঁর জীবনবেদ প্রত্যক্ষ করেও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের এক মানসিক প্রত্যয়ের ভূমি আছে। সেভাবেও কারো কারো জিজ্ঞাসা জাগে। যুক্তির ভূমিতেই খোলা মন নিয়ে, বিজ্ঞানাগারের সমীক্ষা ও পরীক্ষার মত ফলিত কর্ম করতে করতে সে সে-রাজ্যের সন্ধান পেয়ে গেল, আর যোগসাধনের আনন্দ পেয়ে যোগপথে তাঁর সঙ্গে যুক্তিযুক্ত হয়ে পড়ল, তাও হতে দেখা যায়।

এই জন্য যজ্ঞেশ্বরকে জানতে ও বুঝতে না পারার জন্য প্রবর্তসাধকের ব্যাকুলতার মধ্যে একটা ছটফটানির ভাব আসে। তিনি কে, তাও সে জানতে চায়, আর তাঁকে প্রত্যক্ষও করতে চায়। তার নিজের মানসী প্রতিমাকে সে চাক্ষুষী করতে চায়। কিন্তু কিভাবে যে সে সেই তিলোত্তমাকে গড়ে নেবে, তা তো সে জানে না। অন্তরের এই আকৃতিটি ঠিক মত জাগলে, সেই ভাবের পরিপাকে অন্তরের পথগুলি নানাভাবে খুলে যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ সেই আন্তর পথগুলি সব বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ সাধকের ক্ষেত্রে সাধনার শুরুতেই এক বিরাট পরিমণ্ডল খুলে যায়। যেমন এক বিরাটের পরিমণ্ডল, তার মধ্যে এই আমি। এই বিরাটকে উপনিষদের ভাবনায় দেখতে ও শিখতে হয়। তিনিই সেই বিরাট পুরুষ, পৃথিবী তাঁর পাদপীঠ মাত্র। তাঁর একাংশে স্থিত এই জগৎ। এই অনুভবকে জ্ঞানের ধারায় গ্রহণ করতে পারি। আবার এই বিরাটের ভাবনাতে, আকাশ বাতাস আলো জল ওষধি বনস্পতি, এ সবের মধ্যেও তাঁর উপস্থিতি যেন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। গাছের পাতাটি সূর্যাস্তের সময় শির শির করছে, এর মধ্যে যে তাঁরই স্পর্শ!

তাঁরই মধ্যে সর্ব অঙ্গ দিয়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি, আর আমার শিরায় শিরায় সেই একই প্রাণসত্তাকে বহন করে চলেছি। এ হল ভক্তির দিক দিয়ে অনুভব। আবার এই দুই দিকের দুধারার ভাবের পরিপাকে, অথবা বিভিন্ন ভাবে তাঁকে আমার সামনে প্রতিমারূপে দেখি—বিষয়ীর বিষয় রূপে। বোধ হয় যে জ্ঞান কর্ম সংবেদন সবই তাঁকে নিয়ে, একরম অদ্বৈতরসনিবিড় একরসপ্রত্যয়েও বৃহতের একতান যেন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। যেভাবেই হোক না কেন, এই বিরাটের কল্পনা বা ভূমাবোধই চিত্তে মুক্তি এনে দেয়। তাঁর অনন্তবোধের আভাসে তাঁকে যেটুকু ধরতে পারি! তাও আমি ধরেছি বা খুঁজে পেয়েছি এভাবে কিন্তু নয়, তিনিই যে আমাকে ধরেছেন, আমাকে তিনি পেয়েই আছেন, এই গভীরের ভাবপ্রত্যয়টি আবিষ্কার করতে পারলে, সাধনা অনেকটা নিশ্চিন্ত ও সহজ হয়। শিশু যেমন সহজভাবে জানে ও ধরে থাকে তার মায়ের কোলটি। মা যে তার সবচেয়ে আপনজন এ তার আত্মার অনুভূতি, গভীরের প্রত্যয়। একথা তো তাকে আলাদা করে শিখতে হয়নি। তেমনি করে, এই আকাশ বাতাস আলো যেমন আমার কাছে প্রত্যক্ষ ও সহজ, তেমনি প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রাণে শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে সহজ আনন্দে তাঁকে পাই, এ ধারণার অভ্যাসও জীবনের সহজ ধারার মধ্যে পড়ে। বৈদিক ঋষির আকাশ-ভাবনা যেমন সহজ ছিল, তেমন এক শূন্যতার বোধে যখন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলি, তখন সেই শূন্যের মধ্যে জাগে আলোর দীপনী। তাঁরই ছোঁওয়ায় বিরাটের বোধে রংছুট হয়ে একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে, আবার তারই আলোর সম্ভারে ঝলমল করা, এই রকম স্মরণ ও মনন চলতে থাকলে বিরাটের আবেশ ঘটে। তাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থভাবনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেছেন, তুমি তাঁর—এটা কিন্তু শেষে হবে। যখন তাঁর ছোঁওয়ায় ধ্যানে আবিষ্ট হয়ে যাই, কোনও কূল কিনারা পাই না, তখন হল ব্রহ্মাত্ম ভাব—অহংব্রহ্মাস্মি, সোঽহং অস্মি ইত্যাদি। এক

আত্মচৈতন্য বিরাট হতে হতে বিস্তৃত ব্যাপ্ত, তার মধ্যে খোলা রয়েছে শুধু চোখটি, অর্থাৎ দ্রষ্টার ভূমিকা মাত্র। এতে সবের মধ্যে আমি এ ভাব যেমন হতে পারে, তেমন তিনিই বিরাট অনন্তবোধে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আর তার মধ্যেই আমি বা আমার যা-কিছু সব; এ দুরকম বোধও হতে পারে। যোগের দিক থেকে ওই আমি বা আত্মাকে দেখার সাধনা হল, নেতি নেতি করে খোঁজা। আমি দেহ নই, প্রাণ নই, মন নই, এভাবে দেখে খুঁজতে খুঁজতে শুধু থাকে কূটস্থ চৈতন্য-রূপে সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র—শিবোঽহম্। আবার তার মধ্যে ডুবে গলে গেলে আত্মার স্বভাবের নিয়মেই আমি বৃহৎ হয়ে যাই—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই অনন্ত। এরই অপর দিক হল এইভাবে জগৎকে দেখে নিয়ে, নেতি নেতি করে উজিয়ে জগৎ-ব্যাপারের সম্পূর্ণ বাহিরে চলে যাওয়া। জগদতীত (transcendent) অবস্থায় চলে গেলে, লোকোত্তরে এক বিস্ফোরণ ঘটে। এটা না হলে নেতি নেতি এই আদেশ সম্পূর্ণ হয় না। এর আগে জগতে সবই দেখেছি। তুমি আকাশ বাতাস আলো জল সবই হয়ে আছ, আর দেখেছি বর্ষার জলের মত তোমারই ধারাসারে আমি অভিষিক্ত হয়ে রোমাঞ্চিত। তোমারই মধ্যে আমি—এই ভাব। কাজেই এখানে দুটা পথ দেখতে পাচ্ছি। নেতি নেতি করে গেলে লোকোত্তরে আমার পরম. নির্বাণ, অন্তরের পথে এটা হল মোক্ষের পথ, প্রকৃতির ব্যাপার থেকে ছুটি নেওয়ার ভাব এসে পড়ে আর তীব্র বৈরাগ্য দেখা দেয়। সহজ সংস্কারেও অকস্মাৎ এ ভাব এসে ধরে। স্বামী বিবেকানন্দের এ রকম হতে দেখা গেছে। রামকৃষ্ণদেব এই 'নেতির কথা সহজ কথায় বুদ্ধিগ্রাহ্য করে বলেছেন—এ যেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত। একই জিনিষ দেখছি আর একটা করে কোষ ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকছি। শেষ পর্যন্ত আর কিছুই. রইল না। এই অবস্থা থেকে প্রকৃতি-পরিণামের পর্বে আর ফিরে নাও আসতে পারি, একথা আমরা

অনেক শুনেছি। কালাপানিতে পড়লে জাহাজ আর যেমন ফেরে না, তেমন এক স্রোতের চোরাটানে যেন সত্তাকে টেনে নিয়ে নিঃশেষ করে দিল এক শূন্যের মধ্যে। এই চরম নেতিটি যথাসাধ্য বুঝে নিতে হবে। এই পথটিকেও ধরলে তিনটি ধারাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তিনি অনন্ত, তিনি জগন্ময়। তিনি জগদতীত হয়েও জগৎ তাতেই পূর্ণ করে রেখেছেন। আর একটি ধারায় জগৎ ছাড়িয়ে, জগদতীত অবস্থায় জগৎ বা সৃষ্টির ব্যাপার আর কিছু থাকে না। শেষ পর্যন্ত তিনি অসৎ। ভক্তির ও জ্ঞানের দিক থেকে দুভাবে দেখলে তাঁকে নিয়েই জগৎ, এই হল বিশিষ্টাদ্বৈত। কিন্তু তিনি জগৎ বা সব ছাপিয়ে নির্বিশেষ মাত্র, এও খাঁটি। রামকৃষ্ণদেব বেলের উপমা দিয়ে বলতেন যে, খোসা বীচি শাঁস সবটা নিয়েই বেল, না হলে ওজনে কম পড়ে। তাঁর নির্গুণ নির্বিশেষ অনাদি অনন্ত ভাব, আর সগুণ সবিশেষ কল্যাণগুণের আশ্রয়ী ভাব, একই সঙ্গে মনের সাহায্যে ধরা অসম্ভব। কল্পনার আশ্রয়ে তাকে ধরে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাই সেই পরম ভাব বা পরম প্রভু যে যজ্ঞেশ্বর, তাঁকে পাওয়ার ধারাতেও তিনটি ভাবনার প্রবলতা দেখা যায়। তিনভাবে তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্ক প্রতিভাত, সেই তিন রকমের যুগনদ্ধ বিভঙ্গগুলি হল ব্রহ্মমায়া, পুরুষ প্রকৃতি এবং ঈশ্বর শক্তি।

ব্রহ্ম ও তাঁর মায়ার কথা আমরা একসঙ্গেই বরাবর শুনে এসেছি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জগদতীত নির্বিশেষ অনন্ত প্রকাশস্বরূপ, নেতি নেতি করে সেই জ্ঞানে পৌছতে জগৎকে ছাপিয়ে যেতে হয়। জগতের প্রলয় ঘটে, নয়তো জগৎ মিথ্যা, এই বোধই পেয়ে বসে। তাই জগৎ বা ব্রহ্মের সৃষ্টিকে বলা হয় মায়া। জ্ঞানের এই চরম অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ তাই কিছু করেন না বা বলেন না, এইরকম নির্বিশেষ অনন্ত হয়ে যান। শান্তম্ শিব এব কেবলম্ অস্তীত্যুপলব্ধি-মাত্রম্—এই হল তাঁর সংজ্ঞা। ব্রহ্মকে বলি অক্ষর, অমর অজর। এই ব্রহ্মকে জানা, যেন অনন্ত জ্ঞানের দিকে যাত্রা। এ থেকেই সাংখ্যভাবনা এসেছে।

সাংখ্যের পুরুষ কেবল, নির্বিশেষ, সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ। সেই ভাবে শুধু চৈতন্যের পরিচয় পেলে জগৎ ছেড়ে যাবার দিকে ঝোঁক হয়। আঘাত পেলে মোক্ষবাসনা আসে, আর তখন মোক্ষের স্বরূপ বুঝি, এই জগৎ ছাড়ার তাগিদ। জগতে থাকাকে বলি ইতি ইতি। আর জগৎ ছাড়লে হয় নেতি নেতি। তাই যা-কিছু ইতি তাই মায়া, সব ছাড়ো। ওদিকে গিয়ে জগদতীত ব্রহ্মে লয় ঘটল। আমার জগৎ মুছে গেল, নয়তো স্বপ্নে রইল। কিন্তু জগৎ তো আছে যেমন তেমনই। তার অস্তিত্বের বিলোপ হচ্ছে না। আমার চৈতন্যে লয় পেলেও সকলের চৈতন্যে তা প্রতিভাত। তাই পূর্ণযোগে জগৎকেও সেখানে তুলে নেবার দায় আছে। জগৎকে ছাপিয়ে গেলে, তবেই জগৎকে মুক্ত করার শক্তি জাগবে। না হলে ব্যষ্টির নির্বীজ সমাধিতে জগৎ যেমন, তেমনই থাকে। তাই ব্যুত্থানে বিপরীত দর্শন হয়, আর সংঘর্ষ লেগেই থাকে। সুপ্তিতে ও স্বপ্নে তেমন নির্বিশেষ ব্রহ্মে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু জাগ্রতে অন্য এক জগৎ—মায়া। এই অনুভূতির দুই কোটির বিরোধ নিয়ে অনেক দার্শনিক কূট তর্ক আছে। তবুও বিরোধ যে একটা আছে, তা অনস্বীকার্য। তাই ব্রহ্ম জগদতীত সত্য, তা নির্বিশেষ এবং তুরীয় এবং তাতে পৌঁছে সেখানেই যে ভাবে হোক থাকতে পারার ঐকান্তিক এক আকর্ষণ আসে। তাই জগৎকে মায়া বলে, ভ্রান্তি বলে, তা থেকে দূরে থাকাই চরম সত্যের উপলব্ধি, এই প্রত্যয় হয়। কিন্তু তবুও বলতে হবে, এ বিরোধ তো আমারই চৈতন্যে, আমারই উপলব্ধির চরম এক কোটিতে। আমরা জাগলে ঘুমাইনা আবার ঘুমালে তো জেগে থাকি না, এই হল প্রাকৃত চৈতন্যের অবস্থা। কিন্তু যোগে যে জেগে থাকতে হয় সুষুপ্তির নিথরে, আর ঘুমিয়ে পড়তে হয় জাগ্রতের কোলাহলে। জাগরণ আর সুষুপ্তি একই চৈতন্যের দুই কোটি, কাজেই আমার চৈতন্যেই শুধু এই বিরোধ। অনন্ত চেতনার অনন্ত বৈচিত্র্য যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমন আমার বা ব্যষ্টিচেতনার এই দুই

কোটিকেও অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নির্বিশেষ সুষুপ্তিস্থান পুরুষ প্রজ্ঞানঘন, সর্বেশ্বর সর্বযোনি, আবার তিনিই প্রভু, তিনিই দ্রষ্টা। তাঁরই মধ্যে হারিয়ে গিয়ে যদি হারানোটাকে সত্য বলি, সেটা হল ব্রহ্মের একদেশ দর্শন। কেননা সেখানে থেকেই যে আবার সব বেরিয়ে আসছে, এটা তো ঠিক। না হলে ব্রহ্ম যুগপৎ সুষুপ্তিস্থান পুরুষ স্বপ্নস্থান পুরুষ ও জাগ্রৎস্থান হন কি করে। সুষুপ্তিতে লয় হয়ে ব্রহ্মেই যদি জেগে উঠতে পারি, তবেই পূর্ণযোগের দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হবে। এ দর্শন তো আর বললেই হবে না, হবে তাঁরই প্রসাদে। আগে যেমন বলা হয়েছে যে, স্রোতের চোরাটানে একেবারে তলিয়েই গেলাম এমন যদি হয়, তাহলে কেই বা দেখবে আর মায়াকেই বা কে বুঝবে? সেই যে শুনেছি, নুনের পুতুল সমুদ্রের জলে পড়ে গলে যায়—এও সেই রকম। আবার সেই নুন জমাট বেঁধে পাথরের মত শক্ত হয়ে যেতে পারে, তখন এক অদ্ভুত দর্শন হয়। সুষুপ্তিতেও দেখা যায় সর্বেশ্বর সর্বযোনি সেই নির্বিশেষ চৈতন্য তা থেকে বেরিয়ে আসছে এই জাগ্রত জগৎ ঠিক তুবড়ির মুখ থেকে অগ্নি শিখার মত, আর ঝিকমিক করছে তার স্বপ্নের অবস্থা। অনন্ত শয্যায় সর্বেশ্বর সর্বযোনি নারায়ণকে আমরা এ ভাবেও দেখেছি, যে তাঁর সুষুপ্তি গুটিয়ে আছে, আবার তিনি এমন এক বিদ্যুৎগর্ভ স্বপ্ন দেখছেন, যা জাগ্রতে ভর্গরুচিতে প্রতিভাত। এ তিন অবস্থা একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে রয়েছে, আবার তিনি এ তিনেরও অতীত তুরীয়। ব্রহ্মের মধ্যে যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি একই সঙ্গে থাকতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তেমন যুগপৎ সৃষ্টির অতীত থেকেও সৃষ্টিতে সব বিভঙ্গগুলির মধ্যে নেমে থাকতে পারেন। সুষুপ্তি যে শক্তির উৎস, এটা আমরা প্রাকৃত জীবনেও বুঝতে পারি। ঘুমের মধ্যেই শক্তি সঞ্জাত হয়। কাজেই যেটা সুষুপ্ত ও একদিকে শূন্য, সেটাই আবার শক্তিগর্ভ অবস্থা। এটা আমরা প্রাকৃত ভূমিতেই

দেখতে পাই। তাই ওই নৈঃশব্দ্য যে বাক্যের উৎস এবং উৎস থেকে রাশ ঠেলে দিলে তা তুবড়ির মত বেরিয়ে আসে, এরকম দর্শন হয়। কেউ সুষুপ্তিতে গিয়ে আর ফিরলই না, আবার কেউ ওই তুবড়ির মুখের কাছে গিয়ে দর্শন করে আর কিছু বলে। আবার একদল প্রাজ্ঞ সাধক আছেন, তাঁরা তুরীয়ে বসে তিন অবস্থাই যুগপৎ দেখতে পান। তাই ব্রহ্ম থেকে মায়ার উৎপত্তি নিয়ে স্ববিরোধী যুক্তি থাকলেও, পূর্ণযোগীর অখণ্ড দর্শনে ব্রহ্ম তাঁর মায়াকে নিয়েই নিত্যবিরাজিত। ব্রহ্ম থাকলেই মায়া থাকে। কালাতীত চৈতন্যের উপলব্ধির চরম কোটিতে গেলে ব্রহ্মে মায়ার নির্বিশেষ নিমেষে জগৎভ্রান্তি ঘটে, এই তত্ত্বটি এখানে মুখ্য স্থান পেয়েছে। ব্রহ্ম আর মায়া আসলে যুগনদ্ধ সত্তা।

সাংখ্যসম্মত পুরুষপ্রকৃতির দর্শন ও সাধনা হল যুক্তিযুক্ত সাধনা। এই আমিকে নিয়েই আমার সাধনা। আমার কাছে সব চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ দর্শন হল আমার আমি। আমার কি আছে? ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই সব নিয়ে আমার প্রকৃতি, আর এ সবের অতিরিক্ত এক বস্তু প্রাণ ও চৈতন্য। দেখতে পাই, প্রাণ আবার চৈতন্যেই আছে। চৈতন্য নেই, এ তো কোনসময় হয় না বা হতে পারে না। অবিবিক্তভাবে চৈতন্য যেন সবের মধ্যে জড়ানো রয়েছে। বুদ্ধির দর্শন হল যান্ত্রিক। সকলে যে একভাবে দেখতে পায়, এক রকম কাজ করে, এটাই বুদ্ধির খেলা। জড়ের মধ্যে যান্ত্রিক আবর্তনের পথ ধরেই বুদ্ধিকে উল্লসিত হতে দেখা যায়। যেমন, আমরা এখন বিজ্ঞানের আবিষ্কারে electronic brain পর্যন্ত গড়তে পারি! যান্ত্রিক নিয়ম থেকেই বুদ্ধিযুক্ত কর্মফল পেতে পারি। কিন্তু ওই electronic brain-রও একজন চালক ও কর্তা দরকার একজন যন্ত্রী মানব। ঠিক তেমনভাবেই আমরা সাংখ্যদৃষ্টিতে বলতে পারি, একজন পুরুষ রয়েছেন চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃতি হতে বিবিক্ত।

অথচ তাঁরই দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী প্রকৃতির সব খেলা। পুরুষ যদি রসের লোভে প্রকৃতিতে ডুবে যায়, তাহলে জ্ঞান বা চৈতন্য হয় না। এই জন্য পুরুষকে প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। এই প্রকৃতির বিয়োগফলই হল বিবেকজ্ঞান বা শুদ্ধ বিচারের ক্ষমতা। রামকৃষ্ণদেবকে বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন যে, তিনি রসের সমুদ্রে ডুব না দিয়ে কিনারে বসে লেহন করে রস আস্বাদন করবেন, সেই হল সাংখ্যসম্মত বিবেক-জ্ঞানের সাধন। প্রকৃতির কাজ তার স্বভাব অনুযায়ী চলছে, তাতে একটা যন্ত্রের মত নিয়মও ফলিত হচ্ছে, এটা হুঁশে থেকে দেখে যেতে পারলে পরে প্রকৃতি আপনিই সংযত হয়ে আসে, এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম। এইভাবে আপনাকে দেখতে শিখলে, ভিতরে যা যা ঘটে যায়, তারও দ্রষ্টা হওয়া যায়, আর স্বভাবের বৈষম্যও সুষম হয়ে আসে। তা থেকে তখন প্রকৃতির উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা (master of situation) হয়ে, প্রকৃতিকে বশে রাখার ক্ষমতা আসে। বিবেক-জ্ঞান ঠিক ঠিক হলে তবেই প্রকৃতিকে শাসনে রাখার কথা আসে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এ এক জটিল বিচারের পথ। ধরা যাক, আমি কেবল ঝামেলা নিয়েই উদ্ব্যস্ত, তা থেকে মুক্তি চাই। সাংখ্য বললেন, শুধু দ্রষ্টা হয়ে থাক। তাতেও যদি আন্দোলিত হই, তখন দ্রষ্টার ভূমিকা থেকে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব একেবারে কেটে ছেঁটে ফেলতে হবে, শুধু দেখে যাও। এ থেকে অকর্ম ও বৈরাগ্যবাদ আসে। এইভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির সাধনা চলে ক্রমশ বিয়োগের পথে। তাই বলা হয়ে থাকে, সাংখ্যযোগের প্রথম পদক্ষেপই হল প্রকৃতি থেকে বিয়োগ। এ ভাবের পরিপাকে কি পেয়ে থাকি? মরমীয়ারা উত্তর দেবেন, শেষ পর্য্যন্তও দ্রষ্টাস্বরূপে থেকে যেতে পারি। কর্তা ভোক্তা উপদ্রষ্টা মাত্র হয়েও প্রকৃতির লীলারস দেখেই যাই, প্রকৃতির বিলয় তো চাই না। বাহিরে তো নয়, আমার ঘরেই সব লীলারসের সাধন চলেছে। পিণ্ডে

ব্রহ্মাণ্ডের ছন্দ আবর্তিত। প্রকৃতিতে তিন গুণের খেলা চলে, সত্ত্ব রজ তম। অন্তরে এই খেলা দেখলে দেখি, জগতের পর জগৎ খুলে যায় প্রকৃতির নৃত্যচ্ছন্দে। সে প্রকৃতি চিন্ময়ী, আর সেই যে আমার স্বীয়া প্রকৃতি। সে আপন খুসীতে তার আপন ছন্দে খেলে বেড়ায়। আমি জেগে থাকি ঘুমাই আর নেশা করি, বা যাই করি না কেন, গুণময়ী প্রকৃতিই তার রাশ ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেন। আবার আমি কিছুই করব না, নিজে নৃত্য করব না, বুক পেতে দেব তোমার নৃত্যচ্ছন্দের অধিষ্ঠান হয়ে। দেখে যাই, তুমিই নাচো। এই হল শিবের বুকে নৃত্যকালী। আত্মভাব থেকে ব্রহ্মভাবনা। কঠোর সাংখ্যবাদীরা চৈতন্যের উদয়ে প্রকৃতিকে একেবারে ছেঁটে দেন। তাতে জগতের কোন অর্থ থাকে না। এই যে বৈরাগ্যবাদ, এই বৈরাগ্যেরই বা হেতু কি? গীতায় এর প্রতিপূরণ পাই—'উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।' শ্রীঅরবিন্দ তাই বিবেক সাধনের পথ গোড়ায় ধরিয়ে দিয়ে এই শেষ পর্যন্ত নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কি ভাবে স্বীয়া প্রকৃতির পরিচয় মেলে। •বাহির থেকে দেখা বা প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে দ্রষ্টার ভাব যত গাঢ় হবে, ততই প্রকৃতির ছন্দকৌশল ধরতে পারা যাবে, আর শেষ পর্যন্ত ভগবানের পরমা প্রকৃতিকে বুঝতে পারা যাবে। তাঁর সম্বন্ধে গীতায় তিনি বলেছেন—প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত থাকার শক্তি হল এই আত্ম-প্রকৃতিরই চিন্ময়ী শক্তি। নিবৃত্তির শক্তি দিয়ে প্রবৃত্তিকে ছাঁটাই করে, তটস্থ হয়ে দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থানের ফলে, ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চার বস্তু উপচিত হতে থাকে। শক্তির এই ঐশ্বর্যগুলি উথলে উথলে পড়তে থাকে, কিন্তু সে বড় ভীষণ সঙ্ঘাত। পুরুষের শুধু একার জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সেও শক্তি। আত্মপ্রকৃতি সমাহিত অবস্থায় থাকেন; সে ভাবে থেকেও তিনি পুরুষের ছন্দের পরিপূরক ও দোসর হয়ে, তাঁর

নৃত্যকলার ছন্দে ঐশ্বর্য ফুটিয়ে চলেছেন। শিবতাণ্ডব তো আছে, তারই সঙ্গে গৌরীর লাস্য। এই রসসমুদ্রের হিল্লোল যদি আমার বাহিরে প্রযুক্ত হয়, তখন দেখতে পাব আমার ভিতরের ঐশ্বর্যই তো সেখানে সুরে ছন্দে তালে লয়ে উর্মিভঙ্গে উচ্ছল। আমি তখন অনুমন্তা। আবার আমি শান্ত ও সমাহিত হচ্ছি বলেই আমার প্রকৃতি ঋতচ্ছন্দা ও মধুচ্ছন্দা, তাতে আমিই ভর্তা ও ভোক্তা। যে রসসমুদ্রের কিনারে উপদ্রষ্টা হয়ে ছিলাম, সেই দ্রষ্টা ও দর্শন অদ্বৈত একরসনিবিড় হয়ে হয় মহেশ্বর। এই হল যথার্থ পৌরুষ। একদিকে জীবভাবে দ্রষ্টা পুরুষ তটস্থ, অপর দিকে তারই চিন্ময়ী শক্তিতে 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর' হতে পারলে তবেই দর্শন পরিপূর্ণ হয়। এ যেন দুটা জগৎ, অন্তর জগতে পুরুষপ্রকৃতির যুগনদ্ধতা, আর বাহিরের জগৎ-ব্যাপার ব্রহ্মের মায়া বা প্রকৃতির লীলা। এই দুই ভাবই একসঙ্গে আমাদের অখণ্ডদর্শনে সমন্বিত করে দেখতে হবে। যতক্ষণ আমাদের অনুভবে ও দর্শনে না মেলাতে পারব, ততক্ষণ বিরোধ থাকবে। তন্ত্রের সাধনায় এই দুই ভাব মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাই প্রকৃতি মায়া সেখানে যথার্থ শক্তি। সেই যে পুরুষ ওই আদিত্যে "অসৌ", আর আমার মধ্যে এই আত্মা "অয়ম্", সেই ও এই এক, তিনি ব্রহ্ম। এইভাবে আমার জীবন মন্থন করে; যেমন পেয়েছি প্রকৃতি ও পুরুষের যুগনদ্ধ সত্তা, ঠিক তেমনভাবে বিশ্বসৃষ্টির প্রাণসমুদ্র মন্থন করলে যাঁর দর্শন লাভ করি, তিনিই ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি। আদিত্যমণ্ডলে যিনি পুরুষ, যিনি আত্ম-চৈতন্য, এই ঈশ্বরের শক্তি হলেন তার ধাত্রী। এই শক্তিই মায়া, তাই তিনি মা। তন্ত্রদর্শনে শক্ত্যালিঙ্গিত পরমশিবকেই শক্তিমান্ ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্যক্ দর্শনে ঈশ্বর ও শক্তির যুগনদ্ধ ভাবের অখণ্ডবোধের 'পরেই ওই তিনটি বিভঙ্গকেই মিলিয়ে দিয়েছেন।

তিনটি ভাবনার ধারা বিশ্লেষণ করে করে আমরা পেয়েছি, ব্রহ্ম

পুরুষ ও ঈশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবত এই আদি অদ্বয় জ্ঞানের ত্রিপুটিকে সূত্র করে শ্লোকে সুন্দর করে বলেছেন—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ্যতে"। এই সংজ্ঞাগুলি নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও সেখানে করা হয়েছে এই বলে যে, ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানীর উপাস্য, আত্মবাদীর যোগীর উপাস্য হলেন পরমাত্মা, আর ভক্তের উপাস্য ভগবান। এই ভগবানকে না পেলে পাওয়াও তাই পরিপূর্ণ হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে ব্যাখ্যা ধরেছেন, তার নিহিতার্থও বড় সুন্দর। সূর্যের আলো যেমন জগতে ব্যাপ্ত জগন্ময়, তেমনি ব্রহ্মও ব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দময়—"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। এ হল অধিষ্ঠানতত্ত্ব, এই আলোতেই জগতের প্রকাশ। জগৎ প্রকাশিত না থাকলেও তাতেই আছে। এই আলোই প্রকাশ, এ আলো সবিতার সৃষ্টি। আবার কেউ হয়তো সূর্যের আলোর দিকে দেখল না, সহসা এই জলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে দর্শন করল। তাতে হল পরমাত্মজ্ঞান; পুঞ্জীভূত সূর্যবিম্ব হল পরমাত্মা, আবার তা থেকেই বেরিয়ে আসছে আত্মা। শুধু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান চৈতন্য নয়, অন্তর্যামী হয়ে সবের মধ্যে, সবার মধ্যে গভীরে অনুপ্রবিষ্ট এই আত্মা সর্বানুভূঃ, গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, অধূমক জ্যোতি। এই আত্মজ্ঞানটিও চাই। সূর্যবিম্ব দেখে আবার মানুষরূপেও দেখাটা দরকার। সূর্যে থেকে দেখা বা কল্পনা নয়, বিগ্রহে তিনিই আছেন। পরমাত্মায় প্রবিষ্ট ও সংহত হলে কল্যাণতম রূপটি যে দেখব, তাতো এই মানুষেরই আত্মা। সে হিরণ্ময় পুরুষ একহংস, আবার তারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, রূপে—এই মানুষী তনুতে। এই ভাবে জানার আর শেষ হয় না। শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের ত্রিপুটিতে (Triple status of Supermind) এই অদ্বয়জ্ঞানের ত্রিপুটিকে নানা ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই জানা গভীর থেকে ক্রমে গভীরতর হয়েই চলে, তুঙ্গ থেকেও তুঙ্গতর আর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর; যেটা কাষ্ঠা সেটাই পরমা গতি।

ব্রহ্ম আর মায়া অতিমানস ত্রিপুটির প্রথম পর্ব। এই অনুভূতি বা জানার আরো জমাট বাঁধতে থাকলে সবার মধ্যেই সেই আলোকে জানতে ও দেখতে পাওয়া যাবে : সর্ব ভূতে আত্মা, আবার মদাত্মা সর্বভূতাত্মা : একে বোধের দ্বিতীয় পর্বে নিতে পারি। সকলের মধ্যে সেই সূর্য জ্বলছে —"সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ", এই বোধে জানা হল অতিশয় তুরীয় তত্ত্ব (Absolute) ভাবে তাঁকে জানা ও পাওয়া। তাঁকেই পরম পুরুষরূপে, পরমাত্মারূপে জানতে ও বুঝতে শিখলে দেখব তিনিই আমার ভগবান ঈশ্বর, আমার যজ্ঞেশ্বর। তিনিই আমার পুরুষ, আমার পরম পুরুষ। তখনই যজ্ঞেশ্বরকে পরিপূর্ণ করে গভীর ভাবে জানা সম্ভব হবে। সেই যজ্ঞেশ্বরের কর্মই আমার জীবনযজ্ঞ, আবার তাঁতেই সেই যজ্ঞকর্মের নিবেদন উর্ধ্বায়ন ও পরিসমাপ্তি। এই যজ্ঞেশ্বরকে উৎসর্গ করতে হবে আমার যত কর্ম, যত ধর্ম, যত মর্ম, আর পরিশেষে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করে আপনাকে।

১১
প্রজ্ঞার কর্ম ও চৈত্যপুরুষ

গীতার কর্মযোগের সূত্রগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতির অনুশাসনে অকর্তা হয়ে কর্ম করার নির্দেশ পাওয়া যায়। ভাব হল তটস্থ ও উদাসীন থাকা, আর কৌশল হল ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করা। ইতিবাচক অনুশাসন হল সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করা। আমরা শুনেছি যে, যজ্ঞভাবনা না নিয়ে কর্ম করলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কর্ম করতে করতে নিজেকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করতে হয়। সংসারের জন্য দেশের জন্য বা বহুজনহিতার্থে যে উৎসর্গকর্ম, তা চরমে যায় যখন বলি "জগদ্ধিতায়"—জগতের কল্যাণে উৎসৃষ্ট সেই কর্ম। কিন্তু এও আলুনি হয়ে যায় যদি না এর পিছনে যজ্ঞেশ্বরকে বসাতে পারি। "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" কর্ম হলে তবেই উৎসর্গ সার্থক হবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কর্মকে দুদিক দিয়েই নিয়ে যোগপথে যেতে হবে। এই অকর্তার বা নেতিবাচক দিকটি যোগের সাহায্যে ধরে রেখে, কর্ম করে তাঁরই সেবা—এই ইতিবাচক দিকটি পরিপুষ্ট হয়, যদি একটা Cause বা মহান আদর্শ সামনে রেখে চলতে পারি। কিন্তু তাঁরই জন্য সব কর্মের মূল্য, এই অর্থ-বোধটি যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে ধারণায় আসা দরকার। তিনি ভূমা তিনি বৃহৎ তিনি অনন্ত, সেই তাঁরই শক্তিতে সব কর্ম। কর্ম অতি ক্ষুদ্রই হক আর বিরাটই হক, সেই অসীম অনন্ত থেকেই শক্তি উৎসারিত হচ্ছে, আবার তাতেই পরিসমাপ্ত হয়ে মিশে যাচ্ছে।

কিন্তু কর্মের ভূমিতে এই অসীম ও অনন্তের বোধ এমনি সহজে আসে না, এজন্য অনুশীলন চাই। এতে জ্ঞানের কথা আসে। নিজের সত্তাকে বিরাটে মিলিয়ে যেমন অনুভব করতে হবে, তেমনি আবার বিরাটকেই সর্বত্র অনুস্যূত

দেখতে হবে। তখন যে কর্ম হবে, তা যেমন প্রজ্ঞার কর্ম, তেমন বিরাটের কর্ম। এই রকম ভাবকেই বলা যায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" এই সব মহাবাক্য বিরাটে আত্মনিমজ্জনেরই ফল। আমি বিরাট অসীম অনন্ত হয়ে যাই, আবার অসীম অনন্ত ও বিরাটের মধ্যে আমি, যুগপৎ এই বৃহতের ভাবনাতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্র উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবার আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণে কূল ছাপিয়ে অকূলে এক লোকত্তর চৈতন্যে নির্গলিত হয়ে গেলে যে এক চরম শূন্যতা পেয়ে বসে, তাকেই বলা যেতে পারে বুদ্ধের নির্বাণ। সে এক বিরাট শান্ত অবস্থা। শ্রীঅরবিন্দ এই অধিষ্ঠান তত্ত্বের অবস্থাগুলির নাম দিয়েছেন Fundamentabs। অধিষ্ঠান তত্ত্বগুলির ওপরেই শক্তির স্থান। অধিষ্ঠান না থাকলে শক্তির প্রকাশ সম্ভব হয় না। এই শক্তিতত্ত্বকে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন Instrumentals। এখন এই অধিষ্ঠানের আধারেই কর্ম উৎসারিত হয়; তা সে ঘোর যুদ্ধকর্মই হক কিম্বা শান্ত গৃহকর্মই হক, সবই করতে হবে শক্তির সহায়ে। অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে শক্তির উজানে যেতে হয়, শক্তি সেখানে স্তব্ধ শান্ত সমাহিত এক মৌনে মগ্ন। এই শান্ত নীরবতার মাঝে শক্তিটুকু তার সমূহ শক্তি ব্যূহ করে রাখে, এ শক্তিবোধ অন্তরের। যে কোন সময়ে তার প্রচণ্ড বিস্ফারণ হতে পারে।

মহাভারতের ধারাটি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এই শক্তিবিন্যাসটি ধরতে পারব। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অভিব্যক্তি দেখা যায়। দ্বৈপায়ন কৃষ্ণে ব্যাসচৈতন্য, তাঁর ধৃতিশক্তিসমূহ নিয়ে তিনি ধরে আছেন অধিষ্ঠান। এরপর আছেন যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব কৃষ্ণ ধনঞ্জয়, তিনি শক্তির প্রকাশের যন্ত্র। আর সমস্তটা যিনি ধরে আছেন, তিনি হলেন বাসুদেব কৃষ্ণ। তিনি সব শক্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করছেন, অধিষ্ঠানকেও প্রকাশের শক্তিকেও। এই তিন শক্তির সমন্বয় ঘটলেই বিজয় সুনিশ্চিত—"ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ"।

শক্তি থাকেন কুণ্ডলিতা নিমেষিতা, তাঁকে সচেতন করে উন্মিষন্ত করে না তুলতে পারলে, তিনি বন্ধ্যাই থেকে যাবেন। কিন্তু শক্তির এই উন্মেষ পর্বটি সাধকের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তাকে নিয়ে অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই সিদ্ধ মহাজনদের মধ্যেও অনেকে শক্তিকে এড়িয়ে চলতে চান। তাঁদের মতে শক্তির সমন্বয়ের চেষ্টা অবান্তর। কিন্তু তা তো সম্যক জ্ঞানের দর্শন হতে পারে না। শক্তিসমন্বিত শিবেই যথার্থ পূর্ণতা ও শান্তি। এই শক্তিই বীর্যের প্রস্থতি। তাই ক্লৈব্যের শান্তি যোগীর কাম্য নয়। বীর্যবান, বীর্যবত্তর, বীর্যবত্তমের শান্তি যোগীকে অধিগত করতে হবে। সাধনার উত্তর পর্বে সাধকের শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। গীতায় যেমন নির্দেশ আছে বিগতজ্বর ও প্রশান্ত হও, কিন্তু কর্মের মধ্যে থাকতে হবে। এই যন্ত্রের মধ্যে শক্তির সুষম বিচ্ছুরণটি ঘটাতে হবে।

অধিষ্ঠান তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা চাই, না হলে প্রজ্ঞার কর্ম অনুষ্ঠিত হবে না। তাতে চিত্ত বৃহৎ হবে ধ্যানে এবং কর্মে। এই যোগকর্মের অনুষ্ঠানে চিত্তকে বৃহৎ করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ছোট ছোট অপূর্ণতা ও অসঙ্গতিকে বৃহতের অঙ্গীভূত করে দেখতে হবে, তবেই চিত্তের মুক্তি। এইভাবে প্রজ্ঞার কর্ম যথার্থভাবে শুরু হলে চিৎসূর্যের উদয়ন ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। তাই মুক্তি ও কর্ম একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। নিজের মুক্তির ইচ্ছা বা মুমুক্ষুত্ব যেমন চাই, জগদ্ধিতায় কর্ম করাও তেমন চাই। সাধক হবেন কল্যাণকর্মকৃৎ। তাঁর প্রজ্ঞার কর্মে বীর্যের প্রকাশ হয় শক্তির সুষমতায়, এ শক্তি তাঁর সাধন সম্পৎ, আত্মার বিভূতি। বৈদিক যুগের প্রজ্ঞা ও প্রাণের যুগনদ্ধতা উপনিষদের যুগেও সাধনায় সক্রিয় ও জীবন্ত ছিল। প্রাণকে আশ্রয় করে সাধনা করার বিধিতে ব্রহ্মবীর্য ও ক্ষত্রবীর্য অর্ধনারীশ্বরের মত আবির্ভূত হলে তবেই যোগক্ষেম সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম-ক্ষত্র প্রকাশের এপিঠ ওপিঠ মাত্র, তাদের আলাদা করে রাখা যায় না। শিবজ্ঞান লাভ করতে হলে শক্তির জ্ঞানও চাই, তা না হলে সম্যক্

জ্ঞান হয় না। শিবশক্তিকে জানাই যথার্থ প্রজ্ঞান। শিবত্বের সাধনায় শক্তিকে গুটিয়ে এনে সমাহিত করেও জ্ঞান লাভ করতে হয়। শক্তির নিমেষ ও উন্মেষ যুগপৎ জানতে ও বুঝতে পারলে প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া সম্ভব। ব্রহ্ম-মায়া পুরুষ-প্রকৃতি আলোচনা করে আমরা জেনেছি যে ঈশ্বর ও তাঁর শক্তিকে সবরকম বিভঙ্গেই জানতে হবে, তা-ই হবে সম্যক্ জ্ঞান। আর তখনই কর্ম হবে প্রজ্ঞার কর্ম। শুদ্ধব্রহ্ম মায়াতীত নিরুপাধিক সত্তা মাত্র—এই তুরীয় তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, কিন্তু শুধু এই তুরীয় অবস্থাতে সর্বক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছিলেন 'নি'-তে স্বর রেখে দেওয়া যায়না, আবার যেখান থেকে শুরু, সেই 'সা'-তে নামাতে হয়। সেই রকম বুত্থানে বা জাগ্রতে নেমে আসার সময় ব্রহ্মের মায়াকে চিনে নিয়ে নামতে হবে, এটাও বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। অধিষ্ঠান তত্ত্বের ওপরেই ভাটিয়ে আসা, কাজেই তখন আবার উজান ধারায় চললে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে। তাই পূর্ণযোগের অখণ্ড দর্শনে ওঠা-নামার সবটাই জানতে বুঝতে ও করতে হবে।

আমাদের এক ভয় আছে যে, শুদ্ধব্রহ্মের উপলব্ধি যে সম্প্রসাদে নিয়ে যায়, মায়ার এলাকায় নামলে তাকে বুঝি ভুলে গিয়ে হারিয়ে ফেলব। তাই মায়ার মধ্যে আর না যেতে হয়, সেই রকম মুক্তিই আমাদের কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরিপূর্ণ দর্শন হলে, ব্রহ্মে থেকেই তাঁর মায়ার শক্তিকে সৃষ্টিধর্মী চিৎশক্তি বলে চিনতে ও বুঝতে পারব। কেননা এ জগৎ কল্পনা তো স্বয়ং ব্রহ্মেরই। তিনিই কবি মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভু, তাঁর কল্পনা তো মিথ্যা হতে পারে না। মায়া তাঁর সেই কল্পনা। মানুষ যখন কবি হয়, শিল্পী হয়, তখন তার সেই কবিকল্পনাই কাব্যে রূপায়িত শিল্পে সুগঠিত হয়। আর এই অপরূপ জগৎ-কাব্যের মর্মে অবগাহন করি, ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নশতদলের মর্মকোষটির সন্ধান যদি পাই তবে এই মায়াশক্তিকে (Creative Force) জানা যায়।

শঙ্করের মায়াবাদে এই মায়ার স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তন্ত্রে এই শক্তিকে মহামায়া বলে চিনে নিয়ে বন্দনা করা হয়। বৈষ্ণবেরা বলেন যোগমায়া, যাঁকে অবলম্বন করে ভগবানের জগৎলীলা সম্ভব হয়। এই ভাবের পরিপূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিপাতে ব্রহ্ম-মায়ার যুগনদ্ধ সত্তা (bi-uneness) ধরা পড়ে। আর তখনই তুচ্ছ কর্মেও বিশ্বকর্মের ভাবাবেশ হয়, তুচ্ছতম ঘটনাতেও ব্রহ্মের চৈতন্য আনন্দ ও শক্তি স্ফুরিত হতে দেখা যায়।

সাংখ্যদৃষ্টিতে পুরুষকে প্রকৃতি থেকে যে বিযুক্ত হতে হয় তা পরাপ্রকৃতিরই শক্তিতে, তাঁকে আশ্রয় করে। না হলে অখণ্ডদর্শন হয় না, পুরুষের জ্ঞানই শুধু হয়; সেটা একদেশ দর্শন। পরাপ্রকৃতির শক্তিতেই অপরা প্রকৃতিকে বশে আনা সম্ভব হয়। গীতাতে বলা হয়েছে যে অষ্টধা এই অপরা প্রকৃতিই সব নয়, একে ছাপিয়ে আছেন ভগবানের পরাপ্রকৃতি, যিনি জীবভূতা সনাতনী। তিনিই চৈত্য সত্ত্ব। জ্ঞানীভক্তের পরাপ্রকৃতি উন্মেষিত, তাই তাঁর জীবনের গতি ঈশ্বরের দিকেই চলে। ভগবানের এই পরাপ্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করে আছেন—"যয়েদং ধার্যতে জগৎ"। এই পরাপ্রকৃতিতেই বৃন্দাবনের লীলাকমল প্রস্ফুটিত হয়। অপরাপ্রকৃতি কোলাহল তো আছেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেন বীরের মত প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে (rejection); তার অর্থই হল যথার্থ কল্যাণকে লাভ করা, শুভশক্তির পুষ্টিবর্ধন করা। আর তার মূলসূত্র হল হৃদয়ের ভালবাসা। এই ভালবাসা পরাপ্রকৃতির ধর্ম। চৈত্যপুরুষের এই প্রকৃতির সঙ্গেই পুরুষের ভাব হল বিবিক্ত তটস্থ ও উদাসীন থাকা। সবই দেখে যাই, সাতে পাঁচে নেই, এই ভাব। কিন্তু কর্মের মধ্যে নেমে অনেক সময় যেন জড়িয়ে পড়েছি এও যখন মনে হয়, তখন সেটাও ঘটে পরাপ্রকৃতিরই ঈশনায়। কেননা এই বুদ্ধি তখন খুলে যায় যে, উপদ্রষ্টা শুধু নয় অনুমন্তাও তো ঐ পাকা আমি। সে-ই কাঁচা আমি-র অশুভ শক্তিকে ছাড়িয়ে শুভ শক্তিকে বাড়িয়ে চলে। এই উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তার ভাবে

চৈতন্যপুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আরও গভীরে যাত্রা শুরু হয়। ভর্তা পুরুষ তার মধ্যে নেমে আসেন আর সাধক তখন যথার্থ ই কল্যাণকর্মকৃৎ। এরও গভীরের কথা হল ভোক্তা মহেশ্বরের অবতরণ ঘটানো, আর তখনই যুগনদ্ধ পুরুষ-প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

আমরা প্রকৃতিকে তিন ভাবে দেখলাম, অপরা পরা ও পরমা। পরম পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতিরই তিনটি অবস্থা মাত্র। দুনিয়া জুড়ে অপরা প্রকৃতিরই রাজত্ব, কিন্তু আয়তনে বৃহৎ দেখালেও অপরা প্রকৃতি পরাপ্রকৃতির বীজ থেকেই সম্ভূত। কাজেই পরা প্রকৃতি থেকে সে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। পরা প্রকৃতি উন্মেষিত হলে পরে অপরা তার বশীভূতা হয়ে যথার্থ সামর্থ্য লাভ করে। পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতিকেই ধরে রেখেছেন পরমা প্রকৃতি, শ্রীভগবানের স্বীয়া প্রকৃতি Mother Herself, তিনিই মা। ব্রহ্মসদ্ভাব বললে যেটা বোঝা যায়, সেটা যেন ফাঁকা এক শূন্যতা। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় যখন বলা হয়, তাতে চেতনার আলো ব্যাপ্ত হয়। আবার এই আলোই ঘনীভূত হয় আত্মাতে। এই সচেতন নিবিড় ঘনীভূত আলোর অবস্থাটি লাভ করে তবেই আত্মবোধ হয়—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আর আত্মা আলাদা নয়, এক। তারপর এই ব্রহ্মবোধকে আত্মবোধে নিবিড় করে পেয়ে আত্মায় ও সবার মধ্যে, অর্থাৎ জগতে তাকে পাওয়া হলে তবেই ব্রহ্মবোধ সম্পূর্ণ হয়। জগৎ আত্মা ব্রহ্ম তিনে এক। আত্মবোধ যেন অন্তর্যামীরই ব্রহ্মবোধ, জগৎব্যাপী বৃহতের বোধ ব্রহ্মবোধ। কেমন? না চিৎসূর্যের এক কিরণ অনুপ্রবিষ্ট হয় জীবের আত্মাতে। 'সেই অন্তর্যামী, তাঁকে সেখানে জানতে হবে। আবার ওই যে সূর্য—'জ্যোতিরণীকম্', সকল জ্যোতির জমাট বাঁধা পুঞ্জজ্যোতি সেই পরমাত্মাকেও জানতে হবে। এই দুইকে মিলিয়ে নিয়ে তবেই জানতে পারা যাবে পুরুষোত্তমকে। আর তাঁকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঈশ্বর, তাঁরই শক্তি পরমা প্রকৃতি মা।

বেদের পুরুষ মূর্ত ও অমূর্ত আর সাংখ্যের পুরুষ অমূর্ত। নেতি-নেতি করে যেখানে যেতে হয় সেই অমূর্ত আত্মাই শুধু আমি নই, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এ সব নিয়েই তো আমার অখণ্ড তত্ত্ব। পুরুষের এই সামগ্রিক তত্ত্ব নিয়েই ভগবতদের পুরুষোত্তম, উপনিষদের মহান্ত পুরুষ। আমরা বলে থাকি মহাপুরুষ। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত, জগতে অনুপ্রবিষ্ট ভোক্তা মহেশ্বর, তিনিই ঈশ্বর-শক্তি। আর তাঁকেই জানতে হবে যজ্ঞেশ্বর বলে—ঈশ্বর-শক্তি, পুরুষোত্তম-পরাপ্রকৃতি এই যুগনদ্ধ তত্ত্বটি সর্বদা বজায় রেখে। সাধনা করতে গিয়ে আমরা যেন এই দুইকে মিলিয়ে চলতে পারি না, একদিকে ঝোঁক পড়ে গোলমাল হয়ে যায়। কখনও ঝোঁক পড়ে শিবে বা ঈশ্বরে আর কখনও ঝোঁক পড়ে শক্তিতে। শৈবদর্শন শক্তিকে বাদ দেননি কিন্তু ঝোঁক পড়েছে শিবত্বে, আর শক্তিদর্শনে শক্তিই পরমেশ্বরী, শিব পিছনে। শিবশক্তির যুগনদ্ধতা কখনই ভঙ্গ হয় না। সিদ্ধজীবনে এই ঈশ্বরশক্তিকে অবিনাভূত বোধে, দ্বিধাব্যাবৃত্তিকে এক করে জেনে বুঝে নিয়ে প্রাত্যহিক দিনযাত্রায় নামাতে হবে।

এই জানার স্বরূপ কি? ঈশ্বর চিৎপুরুষ আর তাঁর শক্তি চিৎবৃত্তি। তাই তাঁর পুরুষবিধাতার তত্ত্বে (personality) সম্যক দর্শনের পূর্ণতা। এ পুরুষ কিন্তু সাংখ্যদর্শনবর্ণিত পুরুষমাত্র নয়, কেননা সাংখ্যমতে তাঁকে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র করে রাখা হয়েছে। আমাদের মন বুদ্ধি অহঙ্কার সব অপরা প্রকৃতির কবলিত, কিন্তু ভগবানের পুরুষবিধাতার মন বুদ্ধি অহঙ্কার সবই চিন্ময়। তাই তাঁর চিৎবৃত্তির বিচ্ছুরণে জগতের সর্বত্র জীবত্বের উল্লাস। অনন্তকোটি জীবনের প্রাণসমুদ্র থৈ থৈ করছে "অপ্রকেত সলিলরাশির" অন্তরে। জীবাণু (virus) থেকে আরম্ভ করে মহাপুরুষ পর্যন্ত কোটি কোটি অগণিত জীবসত্তা, সবই এই ঈশ্বরশক্তির যুগনদ্ধতা, তাঁর পুরুষবিধাতা। যতই জীবত্বের উত্তরণ ঘটে, ততই চিৎপুরুষের চৈত্যসত্ত্ব বিচ্ছুরিত হতে থাকে সত্তা শক্তি ঐশ্বর্য আর আনন্দরূপে। প্রতিটি বিগ্রহে তাঁরই রূপায়ণ—"রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব"।

সবই সেই পরমপুরুষের প্রতিরূপ দেখতে পেলেই তা থেকে বিচ্ছুরিত হয় দৈবীসম্পৎসমূহ—শান্তি কল্যাণ ঐশ্বর্য আনন্দ। জীবনের আদর্শ এগুলিকে লাভ করা, এসব এনে দেয় দীপ্তবুদ্ধি, উজ্জ্বল মন, সমর্থ প্রাণ, সুন্দর দেহ। আর ওই পরমেশ্বরের বিগ্রহের আদর্শে এইসব বৃত্তি যদি সুগঠিত হতে পারে, তবেই সেই বিগ্রহ হবে পূর্ণাবয়ব। আমার যজ্ঞেশ্বর যোগেশ্বর হরি যে বিগ্রহবান পুরুষ, তাঁকে পেতে হবে 'সর্বভাবেন,' পুরোপুরি জানতে ও বুঝতে হবে। একটু জানা হলে বা খানিকটা জেনে ভাবের ঘোরে চাপা দিলে চলবে না বা বিচারবুদ্ধি দিয়ে কাটাছাঁটা করে নিলে হবে না। পূর্ণযোগে যে পথে যে ভাবে যা-ই আসুক, এই সর্বভাবের স্বীকৃতি দিয়ে ও সমন্বয় করে জীবনে চলতে হয়, এর কোন সরল পথ (made-easy) নেই। অদ্বয় বাদীকে পূর্ণযোগী বলবেন 'এহো হয় আগে কহ আর', একদেববাদীকে বলবেন 'এহোত্তম আগে কহ আর,' বহুদেববাদীকেও বলবেন....'আগে কহ আর'। আবার এও বলা হয় যে তিনি অবিগ্রহ, নির্নাম নীরূপ, তাও সত্য। বিগ্রহে পেলে অবিগ্রহ ভুললে চলবে না। আমরা সেটা ভুলে যাই বলেই বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে ভেদচিহ্নের উদ্ধত প্রাচীর খাড়া করে তুলি। তিনি বলেছেন, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"। তাঁর এই মানুষী তনুটি 'সর্বভাবেন' বুঝতে হবে। আমিও যে মানুষ, তাঁর মত করে পাওয়া ও বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে তাঁকে পেয়ে, তাতে শুধু তৃপ্ত থাকলে আমার চলবে না। যুগপৎ লোকোত্তরে এবং লোকে লোকে 'সর্বভাবেন', 'সর্বেষাম্ অবিরোধেন' তাঁকে পেতে হবে।

এই হল যজ্ঞেশ্বরকে স্বরূপে পেয়ে তাঁতে মিলিত হওয়া। "সর্বকর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। পশুর জ্ঞানোন্মেষ হয়নি, কিন্তু মানুষ যদি পশুভাবে কর্ম করে, সেটা তার বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি যজ্ঞার্থে অহংবর্জিত হয়ে তাঁকে সামনে রেখে সজ্ঞানে কর্ম করা হয়, তাহলে সেটাই

আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। তাতেই জগতে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞান তাহলে কি? না, চেতনার উল্লাস ও বিস্ফারণ। তাতে জগৎ আর অহম্‌কে জেনে নিয়ে ঈশ্বরকে জানতে হবে। তাই হল জ্ঞানের লক্ষ্য এবং সেই জানাই পরম জ্ঞান। কাজেই কর্ম করে জ্ঞান লাভ করতে হলে, কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করতে না পারলে কর্ম সিদ্ধ হয়ে জ্ঞানোন্মেষ ঘটাতে পারে না। এ ভাবে কর্ম করে জ্ঞানের সিদ্ধি যে উজান পথে নিয়ে যায়, তাতে মুক্তি লাভ হয়। সালোক্য, সামীপ্য, সাধর্ম্য সার্স্টিত্ব ও নির্বাণ, এই পাঁচরকম মুক্তির কথা বলা হয়। সাধারণভাবে বিগ্রহের সাধনা থেকে সালোক্য মুক্তি ও অবিগ্রহের সাধনা নির্বাণমুক্তিতে নিয়ে যায়। কিন্তু গীতায় আছে সাধর্ম্য মুক্তির কথা—"মম সাধর্ম্যমাগতাঃ"। শ্রীঅরবিন্দ এই সাধর্ম্যমুক্তিকে মুক্তি-লাভের মূল স্তম্ভ বলে ধরেছেন।

সালোক্য মুক্তিতে তাঁরই লোকে বাস করি, এই ভাবের আবেশ হয়—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং...." ইত্যাদিতে যে ভাব ব্যক্ত। তাতে দেখা যায় সবই তো তাঁর দ্বারা আবিষ্ট, অপরা তিনিই সবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। সমুদ্রে মীন বাস করার মত তাঁরই মধ্যে সতত সঞ্চরণশীলতার ভাব পেয়ে বসে। এই ভাব নিবিড় হতে থাকলে পরে আসে সামীপ্য মুক্তি। তাতে তিনি সতত আমার সম্মুখে, আমি তাঁর সমীপে; তাঁরই লোকে তিনি সদা সন্নিহিত, আর তাঁর সঙ্গে আমার এক বিশুদ্ধ লীলারসের সম্পর্ক। "আমি যদি চলি পথে, শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে," এই হল তখনকার অনুভূতির কথা। আরও গভীরে তাঁর রূপে ডুবলে হয় সারূপ্যমুক্তি। তাঁরই রূপে আমার প্রকাশ—"not I but Christ in me", এই হল তখনকার কথা। এই জগতে এই লোকে তাঁকে এমন করে পাওয়া যে, বাইরে শুধু আমার রূপের খোলস, তাছাড়া সবই তিনি।

এভাবের চলায় সমস্ত কিছুই ভুল হয়ে যেতে পারে। সব হারানোর

সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ভক্তি দিয়েই পাই আর জ্ঞান দিয়েই পাই সব হারিয়ে তবেই সব পেতে হয়—"সব ছোড়ে সব পাওবে', Fosake all to achieve all। আমি নেই, এই ভাব চলতে থাকে। তিনি ঝলকে ঝলকে আসেন, আর রেখে যান এই নিমিত্ত আমিকে। তিনি সরে গেলেও তাঁর আবেশ তো কাটে না। তিনি হারান বা আমি হারাই, এই বাচ্ খেলার মত যেন খেলা চলতে থাকে। এই ভাবে আসে ব্রাহ্মীস্থিতি—তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যমুক্তি, অন্তে ব্রহ্মনির্বাণলাভ। এই জীবনকালেই তাঁর সাযুজ্যমুক্তি লাভ হয়। জলের বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে গেল, কিন্তু সেই মিলনে তাতে তখন সমুদ্রের আবেশ হয় এবং সেই ভাবই হল "মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ"। মানুষের স্বধর্ম হল পুরুষোত্তমের ধর্ম, একাধারে মুক্ত ও যুক্ত হওয়া। অপরা প্রকৃতির কবল থেকে একেবারেই মুক্তি, আর ওই সঙ্গে শুদ্ধা স্বীয়া প্রকৃতির অবরুদ্ধা শক্তি মুক্ত হয়। বন্ধন মুক্তির সঙ্গে সৃষ্টির পরম ধর্মে প্রপঞ্চোল্লাসে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারই কর্ম করে চলা, এই হল দিব্যকর্মের ভূমিকা, আর কর্মযোগের মূল সূত্রটি এখানেই।

আমার বিশেষ রুচি নিয়ে পথে নেমেছি, কিন্তু কোথাও মনকে বিমুখ রাখব না, এই হল পূর্ণযোগের সাধকের ভাব। সেই কেন্দ্রবিন্দুটিতে ধারণ করে চলেছি যেখানে, আমার সিন্ধু সেখানে তাঁরই সমুদ্রে মিলেছে। পথ চলার সময় সমন্বয়টি হয়তো ঠিক ঠিক খুঁজে পাই না। কেননা জ্ঞানী ও ভক্ত দুজনের পথ চলায় যেমন বিভিন্নতা একটু থাকে, তেমন আবার আমার নিজস্ব পথটিও অপরের পথ থেকে ভিন্ন। কিন্তু ভিতরের দিকে যখন তাকাই, দেখি কাকে চাই? যিনি ঘরছাড়া করে আমার সর্বনাশ করে পথে নামালেন, তিনিই আবার ঘর বেঁধেছেন যে! সবারই সঙ্গে এক মুক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়ি—'সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ'। সবই আমার সেই মুক্ত আত্মায়, সমস্ত পথই আমাতে। আমি যে বিশ্বপথের পথিক!

তাহলে ব্যক্তিগত সাধনায় আমার নিজস্বভাবে কি পেলাম? চিত্ত থাকবে মুক্ত, কোন পথের বা কারও নিন্দা করা চলবে না। আমার ঠাকুরই যে সব হয়ে আছেন—অরূপ, সরূপ এবং অপরূপ। তাঁকে পাব কি করে? এক স্থির প্রত্যয় অন্তরে যে, তিনি দূরে নন, তিনি 'অন্তিকে—হেথা হেথা'। তিনিই আমার তুমি—তোমার সেই সাবিত্রী শক্তিতেই ধীবৃত্তিসমূহের প্রচোদনা, আর তাতেই তার পরম কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমাতেই উপচিত। এ ভাবে তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করে, বিশ্বে তাঁর ব্যাপ্ত রূপ ও বিশ্বাতীতে লোকোত্তর সবই নিতে হবে। এই শুদ্ধ আমি যে তাঁরই সখা, তাঁরই গোপী, তাঁর পরাপ্রকৃতি। গোষ্ঠলীলায় তাঁর সখ্যে, কুঞ্জলীলায় তাঁর মাধুর্যে, সব রূপেই আমি তাঁর। সেই পরম পুরুষ আমার অন্তর্যামী বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর হয়েও বিশ্বাতীত। তাঁতেই আমার সব সমর্পিত, তাঁকেই সব লুটিয়ে দিই। ফাল্গুনীর কিছু নয়, কৃষ্ণই সব। এই হলে হবে যজ্ঞেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। আর কর্মযোগের সিদ্ধ কর্মের লক্ষ্য হল, তাঁরই শক্তি জগদ্ধিতায় উল্লসিত হবে, তা সে যে আধারেই হক না কেন। যজ্ঞের মূল কথা যে উৎসর্গ, ভাবের দিক থেকে তাই হল আত্মোৎসর্গ।

এর পরের প্রশ্ন যার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞকর্ম, সেই যজ্ঞেশ্বরের দেবধর্ম জানা যাবে কেমন করে? "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। প্রথমে জানতে হবে সেই আকাশকে; এক বৃহৎ সত্তা, আকাশবৎ তার বিপুলতা। এতদিন যে "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে," তা থেকে এই আকাশে আমার মুক্তি। আমাকে ঘিরে সেই মহাকাশ, যার দ্বারা আমি সঞ্জীবিত, আমার বিশিষ্ট ভাবধারাতেও তিনি। কেননা বিগ্রহ তো আকাশেরই। এ পর্যন্ত ভাবনাকে পুষ্ট করতে না পারলে তো চিত্তের মুক্তি হবে না। প্রাচীনকালে দেখেছি, তাঁরা নামরূপের নির্বহিতা এই আকাশকে বৃহৎরূপে নামরূপের পিছনে দেখতে কখনও ভোলেননি। সেই তাঁকে

অবলম্বন করে আমার উজান গতি, তাঁতেই আমার আত্মোৎসর্গ। এই গতির আবার দুটি ধারা। আত্মোৎসর্গে সেই দেবতার চরণে নিজকে শূন্য করে দিতে হবে। "ইদং তব, ন মম," এই ভাব নিয়ে যজ্ঞকর্ম চলতে থাকলে একটা ফল হতে পারে, একেবারে নিঃশেষ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া (self-immolation)। এটা সম্ভব হলেও শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু একে আদর্শ করেন নি। আমি ঘুচে "তুমি" বা "তিনি" হতে হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক গোড়া থেকেই আসে, একথা আমরা আগে আলোচনা করে জেনেছি। সমর্থা রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমঞ্জসা রতির ভাবই সাধারণভাবে ভজনীয় তত্ত্ব। আত্মবিলোপ চাই, কিন্তু সেখানে ছেড়ে দিলে চলবে না। আত্মপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যেতে ও বুঝতে হবে। এক কথায় দেবতা হয়ে যেতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের এটি মূল কথা। ব্রহ্ম আত্মা জগৎ এই তিন নিয়েই অদ্বৈত দর্শন।

আত্মোৎসর্গের মূল কথা আত্মাকে লাভ করা, যাতে ব্রহ্ম আর আত্মা এক এই বোধ হয়—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তিনিও যেমন বিপুল আমিও তেমন বিপুল হতে থাকি। এ ভাবে বিরাট হতে হতে তাঁতে নিঃশেষে মিশে যেতে হয়। উজানধারায় চলে এই সাযুজ্য মুক্তিকেই বলা হয়েছে, জলবিম্ব জলে লয় হয়, নুনের পুতুল সমুদ্রে গলে যায় ইত্যাদি। কিন্তু এতেও শেষ হয় না। অনুভূতির এটাই চরম কথা নয়। আমি বা আমার ইচ্ছা বলে থাকেও না আর কিছু। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই মধ্যে আমাকে তলিয়ে যেতে হয়। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে আবার তীরে ছুঁড়ে দেবেন। যদি ইচ্ছা কর, বলতে পার আর ফিরব না, তিনিও বলবেন "তথাস্তু", এটি একদেশী লক্ষ্য। তাঁর ইচ্ছা বহন করার মত সমর্থ চৈতন্য হলে মূল সত্য পূর্ণভাবে অধিগত হয়। একদিকে যেমন পরমা শান্তি, অপরদিকে তেমন আবার পরমা শক্তি। একক অধিগত করলে অপর দিকটি প্রতিভাত হবেই।

আমরা দেখেছি বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করে একা থাকলেন না, সে পথে সকলকে আহ্বান করে নির্বাণের মুক্তি ও শান্তির পথ দেখিয়ে দিলেন ও তা লাভ করবার শক্তি সঞ্চারিত করলেন, এরকম হতেই হবে। শঙ্করাচার্য জগৎকে মায়া বলে বিভ্রম বলে দেখাতে ও বোঝাতে গিয়ে, মায়া থেকে যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে মায়ার জগতেই, ঘূর্ণিহাওয়ার মত প্রচণ্ড গতিতে তাঁর প্রচার কর্ম করে গেছেন। জ্ঞান আলোর মত, প্রকাশ তার ধর্ম। যেমন করে ফুল ফোটে, ঠিক তেমন করেই সত্যের প্রকাশ, আর সেই তার শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ একে বলেন সাধর্ম্য মুক্তি। তাঁরই ধর্ম মানুষী আধারে সিদ্ধ হতে থাকে। আর মৃত্যুর মধ্যে যে সিদ্ধি তা হল নির্বাণমুক্তি ; তা নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। আত্মোৎসর্গের পূর্ণতায় বা যজ্ঞকর্মের উদয়নের সার্থকতায় এই দুই ধারাকেই মিলিয়ে নিতে হবে। নির্বাণমুক্তি অধিগত করে তাঁর সাধর্ম্য লাভ করতে হবে।

প্রাচীনকালে যজ্ঞকর্মের মূলে এই ভাবনা ছিল। পৃথিবীতে এখানকার যে অগ্নি, সেই অগ্নি দ্যুলোকের অগ্নি স্বর্গে গিয়ে মিলিত হবে। আর সেই দিব্য অগ্নিতে আহুত হয়ে এই অগ্নি রূপান্তরিত হয়ে দিব্য হবে। ভালবেসে যদি তাকে আত্মোৎসর্গ করতে পারি, তাহলে আমার সেই উৎসর্গ অগ্নিশিখার মত ঊর্ধ্বমুখ হয়ে জ্বলবে। উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর সেই জ্যোতি পরিণত হবে উত্তর জ্যোতিতে, এবং তা থেকে উত্তম জ্যোতিতে। বৈদিক ঋষি এই অগ্নিকে দেখেই বলেছেন, মহিমময় সেই জীবন-শিখা বনস্পতির মত উচ্ছ্রিত হয়ে চলেছে, আর জীবনের আয়তনও বিপুল হতে বিপুলতর হয়ে উঠছে।

এ মহিমময় জীবন কিন্তু প্রাকৃত জীবন নয়। প্রাকৃত জীবন থেকে সাধন শুরু করতে হয়। তখন গোড়ায় বিরোধ দেখা দেয় যে, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। এটা কিন্তু প্রাথমিক পর্ব। বিরোধই যদি প্রবল হয়, জীবনে বৈরাগ্য দেখা দেয়। আর তাঁর দিকে যেতে চাইলে জীবনের সব কিছু ছাড়তে হয়,

অকূলে ভাসতে হয়। কিন্তু বহুশতাব্দী ধরে এই ছেড়ে যাবার কথাটা আমরা এমন করে ভেবে এসেছি যে, জীবনের সঙ্গে বিরোধকে সুদৃঢ় করে রেখে সমাধান করেছি, দিব্যজীবন লাভ করতে হলে জীবনের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব খোয়াতে হবে। এরই প্রতিক্রিয়ায় ভোগবাদ প্রবল হয়ে এমন আকার নিয়েছে, যে সেখানে দিব্যজীবনের জন্য কোন মাথাব্যথা নেই। বিরাট আকাশ ও সূর্যকে মাথার ওপর দেখেও সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে নীচের দিকে নিবদ্ধ থাকলে যা হয়, এ তা-ই।

ব্রহ্মকে জেনে জগৎকে অস্বীকার আর জগৎকে নিয়ে ব্রহ্মকে অস্বীকার, দুদিকের এই অস্বীকৃতিই অবিদ্যার আবরণ। অধ্যাত্ম সাধনার পথেও আবার দেখা যায় যে, জ্ঞানের বৃত্তি বা যোগ অবলম্বন করে এক নীতি গড়ে ওঠে, অপরদিকে জ্ঞানের এষণা ত্যাগ করে শুধু ভাবের সাধনাই কাম্য হয়। জানতে গিয়ে রসবর্জন করা, আর না হলে জ্ঞানবিচারে কাজ নেই বলে শুধু রসাস্বাদনে ডুব দেওয়া, দুরকম গোঁড়ামিতেই পেয়ে বসতে পারে। তাই মধ্যম পথটিই গ্রহণীয়, অধ্যাত্মনীতিতে সেটা মেনে চলতে হয়। যোগপন্থায় মধ্যম পথটিই স্বীকৃত। তার প্রাথমিক ও প্রধান সাধন হল চরিত্র গঠন— আধারের শুদ্ধি এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ও অন্তরের সম্পর্কে চিত্তের মার্জন। এ থেকেই নৈতিক জীবনের মূল্যবোধ এসেছে, পঞ্চশীল ইত্যাদিতে যে আচরণগুলিতে গ্রথিত করা হয়। কিন্তু এ যে প্রাথমিক প্রস্তুতি চরম কথা নয়, তা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। নীতিবোধ চরিত্রের ভিত্তিরূপে থাকবে, কিন্তু সেটা যান্ত্রিক হলেই সর্বনাশ। নীতিবোধের অনুশীলনে ভাল মানুষ হতে পারি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মানুষের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা। তাই ওই সঙ্গে ভাবের পুষ্টিও দরকার।

ভাব হৃদয়ের বৃত্তি, ভাবেরও সমস্যা আছে। হৃদয় যা চায়, তাকে আমরা সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে থাকি। তাই ভাবের সাধনায়ও আমরা ঝোঁকের

মাথায়, অনেক সময় সম্ভোগের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে সাধনার অনুকূল মনে করে, পথভ্রষ্ট হয়ে তাতে মত্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু এও অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কথা। ওপরের আলো পড়লে ভোগও সাধনের অনুকূল হতে পারে। কিন্তু সম্ভোগ যখন মত্ততা নিয়ে আসে, সেটা কখনই দিব্যজীবনের অনুকূল হয় না। রসপিপাসা ফেনিয়ে উঠে অপ্সরোবিভ্রমের সৃষ্টি করে। এ রসলোকে ভোগের পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু ভোগতৃষ্ণা মেটে না। আবার রসবর্জিত পথে শুধু নৈতিক ধর্ম শীলব্রত পালন করে চললে, তা থেকেও মোহ এসে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। তাই বলা হয়েছে, এ সব কোন কিছুতেই থেমে যেওনা, গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে অজানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়, গতি যেন কিছুতেই রুদ্ধ না হয়।

"সাবিত্রী" মহাকাব্যে অশ্বপতির যোগে আমরা দেখেছি ভ্রাম্যমাণ এক পথিককে। কতদিন থেকে কতভাবেই তিনি ওই অজানা রহস্যকে অধিগত করতে চাইছেন, তার যেন কিনারা করা যায় না। সেই রকম যে পথই অবলম্বন করা হক না কেন, তা যেন উত্তর পথেই ক্রমাগত নিয়ে চলে, কলুর বলদের মত শুধু যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে পতিত না করে। সদা জাগ্রত থেকে সেই অসীম ও অনন্তকে যেন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করে ধারণ করা—এই আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তিটি যজ্ঞকর্মের উদয়নে, চৈত্যপুরুষের ক্রম-অভিব্যক্তিতে অর্জন করতে হবে। শ্রদ্ধার আভাসন সেখানে মূল কথা।

ভূমার আবেশে শ্রদ্ধার প্রথম আলোকপাত হলে চিদগ্নিশিখাটি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে জ্বলে, কিন্তু তখনও পথ বা লক্ষ্য অজানা ও অচেনা। কিন্তু সেই প্রথম ডাকটিতে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। সে আলো প্রথম দেখা দিয়ে আবার চকিতে আড়ালে সরে যায়, তবুও তাকে তো আর ভুলতে পারা যায় না। বিরহের আগুনে ইন্ধন দিয়ে তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, আমার দিক থেকে আস্পৃহার এই দায়। এই যজ্ঞকর্মই আমার কর্তব্য কর্ম,

তাকে সম্পাদিত করতে হবে। তখন জাগে আত্মজিজ্ঞাসা। নিজকে না জানলে সর্বনাশ, আবার নিজকে জানাও এক দুরূহ সাধন। যে অগ্নিশিখাটি জ্বালিয়ে রাখতে হবে, বারবার তা নিভে যেতে চায়। এজন্য চিত্তদর্পণটি মার্জনা করতে ভুললে চলবে না। ময়লা মাটি পড়ে সেটা আবৃত হয়ে গেলে অগ্নিশিখাটিও আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কিন্তু এই চেষ্টা চলতে থাকলে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হলে দেখা যাবে এই আত্মার বুকেই যে প্রেমের সূর্য জ্বলে, আত্মদীপ যে এই দেহের ভিতরেই জ্বলেছিল, তা তো জানতে পারিনি। এই আত্মসাক্ষাৎকারের কথাই গুরুবন্দনায় বলা হয়েছে—"আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন, এই আত্মজ্ঞানাগ্নির উদ্বোধন হলে চৈত্যপুরুষ পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে এই চৈত্যসত্তা সকলের মধ্যে থেকেও এভাবে স্ফুরিত হয়ে পুরোভাগে আসেন কই? প্রতিটি বীজে অঙ্কুরের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষেতে পড়লে সব বীজকে সমভাবে অঙ্কুরিত হতে তো দেখি না। তাই তাঁর স্বয়ম্বরণের কথাটাই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে হয়। তিনি যাকে যে ভাবে বরণ করে রেখেছেন, তাকে তাই হতে হবে। যে বনস্পতি হবে, তাকে তো তিনিই সেভাবে সম্ভাবিত করে রেখেছেন! এই স্বকর্ম ও স্বধর্ম কেমন করে ধরতে পারা যাবে, এ প্রশ্ন যদি আবার তুলি, তাহলে দেখব যে, তাঁর জন্য ব্যাকুলতা তীব্র হলে সবটাই ধরা পড়ে। তাঁকে চাইতে গিয়ে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি আগে এসে আমাকে ডাক দিয়েছেন, তাই না আমার তাঁকে চাওয়া! নইলে তাঁকে চাইব, এ সাধ্য কি আমার ছিল? বৈষ্ণবেরা বলেন তাঁকে ভালবেসে না পাওয়ার ব্যাকুলতা হল, "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি"। তবুও সেই বিরহের আগুনকে বহন করে লালন করে করে বাড়িয়ে তুলতে হবে। সেই আগুনই আমার সর্বস্ব। তিনি সেই 'আগুনের পরশমণি' হয়ে আমাকে ছুঁয়েছেন, আমার হৃদয় উতলা,

প্রাকৃত জীবন আর বেঁধে রাখব কেমন করে? সবটাই আগুন হয়ে সর্বত্র ছেয়ে ফেলে উর্ধ্বমুখ হোমাগ্নি শিখা দেদীপ্যমান হয়ে উঠল, অবিদ্যার আবরণ সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না হওয়া পর্যন্ত আর শান্তি নেই।

কিন্তু তিনি কোথায় আর আমি কোথায়? জীবনের এ কূলে দাঁড়িয়ে আছি, মৃত্যুরূপী নদী বয়ে যাচ্ছে, তার ওপারে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত। তিনি পরম পুরুষ, আমার আরাধনার বস্তু, তিনিই জ্ঞান, তাঁর নাগাল পাব কি করে? তাঁর আভাস পাই আর তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাই, আমার যে সব ভুল হয়ে যায়। তিনি ছাড়া আমার গতি নেই। তিনি দ্যুলোকে আর আমি মাটির পৃথিবীতে, মাঝখানে অন্তরীক্ষের ব্যবধান। আবেশ কাটলে দেখি, এ ব্যবধান তো ঘুচবার নয়! কিন্তু এ ব্যবধান ফাঁকা নয়, অন্তরিক্ষ আলো করে যিনি সেতুবন্ধন করেন, তিনিই মা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তোমার মধ্যে পরমপুরুষের প্রতি অভীপ্সার বীজটি গর্ভে ধারণ করে, অঙ্কুরিত পল্লবিত করে সার্থক করে লালন করেন যিনি, তিনিই ভগবতী পরমা শক্তি মা। তিনি ওই দ্যুলোকের পিতা আর এই পৃথিবীর জীবসত্তাকে এক বাঁধনে বেঁধেছেন, মৃত্যুর ধারাকে উজানে অমৃতে বহিয়েছেন। সেই মাকে না পেলে তাঁকে না জানলে সাধনার খেই হারিয়ে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই ভাগবতী মায়ের শক্তিই তোমার মধ্যে সাধনা করে চলেছেন। অসীম অনন্তের প্রতি আমার আকর্ষণ, তিনি আমার বিস্ময়ের বস্তু। আর যার মধ্যে রয়েছি, রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে যে চৈতন্য আমাকে সঞ্জীবিত করে তাঁর কোলে রেখেছেন, সেই মা-ই যে সব! তাই সাধকই হই আর সাধিকাই হই, ওই বহু-শোভমানা হৈমবতীর মায়া না বুঝলে তো তাঁকে পাব না।

আমার তাই দাবী রয়েছে, আমার চৈত্যপুরুষ তো তাঁরই কুমার। তাঁর সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্পর্ক, শৌর্যে-বীর্যে আমার অধিকার, আমি তো ভিখারী নই। সেজন্য প্রাকৃত জীবভাবের উর্ধ্বে থেকে চৈত্যসত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ

হতে দিতে হবে। অগ্নিরূপী কুমার তিনি, উমার তপস্যায় শিববীর্যে তাঁর জন্ম, তাঁকে গভীর ভাবে বুঝে নিতে হবে। পরমেশ্বরের স্বীয়া প্রকৃতি, দ্বিদল চণকের মত যুগনদ্ধসত্তার সেই মহিমময়ী মাতৃশক্তির মধ্য দিয়েই চৈত্যপুরুষ কলায় কলায় উপচিত হবেন, ষোড়শকল সৌম্য পুরুষে পরিণত হবেন। সেই কৌমার শক্তি দেহপ্রাণমনের অধীশ্বর হয়ে হৃদয়ের সিংহাসনে উপবেশন করলে এই জীবসত্তাই চিরকিশোরী হয়ে উজানধারায় বইতে আরম্ভ করবে। পূর্ণযোগে কিশোর ভাবটি বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কৈশোর পর্যন্ত প্রাকৃত জীবনই দিব্য হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য শৈশব ও কৈশোর আমাদের মুগ্ধ করে। একটি কিশোর বা একটি কিশোরী যে কত সহজ সুন্দর, তা তারা নিজেরা জানে না। বেদ বলেছেন, তিনিই কৈশোরে নেমে আসেন, সেই ষোড়শকল সৌম্যপুরুষ। তাই ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত সহজ জীবন, সেখানে ভাটার টান পড়েইনি। জীবনের অভিসারও তখন সহজ। কোন কোন ভাগ্যবান সাধক সেই পথে, চিরকিশোর ও চিরকিশোরীর ভাবে থেকে চলতে পারেন। কৈশোর চেতনার অনুধ্যান দিব্য জীবনের সহজ অবস্থা। তাই তাঁদের জীবনের গতিও কৈশোর থেকে তারুণ্যে মাধ্যন্দিন আদিত্যের মত নিরত দেদীপ্যমান, তাঁদের চেতনা অস্তাচলে ঢলে পড়ে না।

অনেক সময়. সিদ্ধপুরুষদের দেখা যায়, তাঁরা বালকস্বভাব হয়ে যান। রামকৃষ্ণদেব এই অবস্থাকে বলতেন বালকের মত, আঁট নেই। এ ভাবের সাধনা বেশী শক্ত বা রহস্যময় কিছু নয়। মায়ের কাছে যখন যাব, শিশু বা কিশোর হয়েই তো যাব। আমার যা কিছু সব তাঁকেই দেব। যাই করি, আমার জন্য করি না। তিনি সদা সন্নিহিত, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে। তাঁকে আমি এ ভাবে আভাগে পেয়ে সকলের সঙ্গে চলেছি। কিন্তু আমি তাদের কারও নই, আমি শুধু মায়েরই। অথচ তাতে আমি সবার মধ্যে কোনও বিক্ষোভ সৃষ্টি করছি না। যখন কোনও নেতা

সকলের সঙ্গে এক হয়ে চলতে পারেন, তখনই সেই নেতৃত্ব সার্থক হয়—"জোষয়েৎ সর্ব কর্মাণি"। খেলার মধ্যেও দেখা যায়, ছেলের দল খেলছে, তাদের সর্দার সেই সঙ্গে খেলছে। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছে যে, খেলাটা সেই সর্দার ছেলেটিই জমিয়ে তুলেছে, সে না হলে খেলা জমে না। এই হল সবার রংএ রং মিলিয়ে চলা। রামকৃষ্ণদেব গৃহস্থের ঘরের বৌএর তুলনা দিয়ে সাধন-কৌশল শিখিয়েছেন। সংসারের সকলের সঙ্গেই মিলে মিশে বৌটি সকলের জন্তই দিনের বেলায় কাজ করে চলেছে। কিন্তু রাত্রে তার স্বামীর সঙ্গে মধুর রসের এক গভীর নিবিড় সম্পর্ক। আর সেটা তো চাই, না হলে সংসার বিষ হয়ে পড়ে। তেমনি করে তাঁর রসসায়রে বারবার অবগাহন করে সবার সঙ্গে রং মিলিয়ে চলতে হবে। সারাদিন তাঁরই জন্ত কর্ম করে, রাতে বাসক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষা। তখন শুধুই তিনি। নিজের চারিদিকে এক চিন্ময় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সঙ্গে রসনিবিড় আবেশ। শুধু একটা ভয় যে, এ রাত যেন না পোহায়। কিন্তু এ রাত বড় তাড়াতাড়ি পোহায়। তাই এ ভাবে সব কিছু রসিয়ে তুলতে হয়। প্রতি মুহূর্তেই তুহুঁ তুহুঁ, 'হাম্-মা' নয়। এই ভাবে নিরালায় তাঁর সঙ্গে যে রসমাধুর্যের সম্ভার, তাকেই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতিমুহূর্তে নিয়ে আসা। যখনই চাই, হাত বাড়ালেই তিনি, এই ভাবে এই জীবনই এক অপরূপ কাব্য হয়ে উঠবে। জীবনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে না, জীবনে সবটাই তিনি। যতক্ষণ এই কাব্যের রসে জীবন অপরূপ বিস্ময়ে জীবন্ত হয়ে না ওঠে, ততক্ষণ তিনি মায়ের মত আমাকে ঘিরে রেখেছেন। আমি মাতৃগর্ভে শিশু, এই হল সাধনার প্রথম অবস্থা।

১২

প্রাণের কর্ম

যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে চিনলাম লোকোত্তর পরম পুরুষরূপে ; ঊর্ধ্বে তাঁর প্রতিষ্ঠা, আকাশবৎ তাঁর পরম প্রকাশ। তিনি দূরে সব ছাপিয়ে অসীম অনন্ত বিশাল হয়েও, হৃদয়ের সম্পর্কে তিনিই আমাদের পরম পিতা। যেমন তিনি দূরে, তেমনই তিনি আবার অন্তিকে। যখন তিনি কাছে, তখন তাঁকে বলি মা। আমরা তাঁর সন্তান এই তো আমাদের জীবধর্ম। মা না হলে আমরা বাঁচতেই পারি না। মা তাঁর চিরকল্যাণময়ী শক্তিতে সন্তানকে কাছে টেনে নেন, দূরে থাকতে দেন না। জীবনের সম্বল এই মায়ের আলোর শক্তির ভিতর দিয়েই আমাদের যোগের পথ। বাবার কোলে, সেই আকাশবৎ পরম প্রশান্তিতে পৌঁছে দেবেন মা—এই বিশ্বাসটি অন্তরঙ্গ ভাবনা দিয়ে সদা জাগ্রত রেখে আমাদের চলতে হবে। আমরা বেঁচে থাকি, চলি ফিরি ঘুমাই আবার মরে যাই, সবই হয় মায়ের কোলে। এই মাকে ঘিরে রয়েছে এক বিরাট রিক্ততা ও শূন্যতা। মায়ের শক্তি সমুদ্রের মত ; তাতে জীবনের বুদ্বুদ জাগছে উঠেছে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। এই মহাশক্তি মা ও পরম পুরুষ পিতা যুগনদ্ধ। তারই লীলা বা দোলা আমাদের এই জীবন। তাই জীবনের কর্মে যেমন আছে প্রজ্ঞার কর্ম, তেমন আছে প্রেমের কর্ম ও প্রাণের কর্ম। জ্ঞানবিচার যোগে বুদ্ধি দিয়ে আমরা যে কর্ম সমাধান করি, তা প্রজ্ঞার আশ্রিত। আর হৃদয়ের তাগিদে যখন কর্ম করি তাতে রস পাই, তখন তাতে প্রেমের কথা আসে। এ ছাড়াও দেখা যায়, এক প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে কর্ম যেন আপনা থেকেই স্ফুরিত হয়ে চলেছে ; তাকে বলতে পারি প্রাণের কর্ম। সে তো শুধু কর্মশক্তির চঞ্চলতা নয় ; যখন শক্তি নামে,

তাকে গুছিয়ে নিয়ে ছন্দোময় করে কর্মে বিনিয়োগ করতে হয়। এভাবে সব রকমেই কর্ম যজ্ঞে রূপান্তরিত হবে, এই হল কর্মযোগের দায়।

কর্মযোগে সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ হয়। সেই সঙ্গে আন্তর কর্ম হল ভাবনা। কর্ম করার সঙ্গে যোগ রেখে, আন্তর ভাবনাটিও অবিচ্ছিন্নভাবে শুদ্ধ রাখতে হবে। ব্রহ্মের সঙ্গে কর্মের মধ্য দিয়েও কি ভাবে মিলন ঘটে, সেটা বুঝতে হবে। এই ছোট অহংকে ছাপিয়ে ওঠা দরকার, তাহলে সহজভাবে সেখানে সবই ঘটে যায়। কিন্তু নিজের প্রতপ্ত অহংকারকে জাগিয়ে যখন কিছু ঘটিয়ে তুলি, তখন এক অহংএর সঙ্গে অপর এক অহংএর ঠোকাঠুকিতে এক বিকৃত উল্লাস দেখা দেয়। তাতে যজ্ঞ পণ্ড হয়, কর্মযোগ হয় না। প্রজ্ঞাযুক্ত প্রাণে প্রেম সঞ্জীবিত হয়, তাই এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার কর্মই মূল তত্ত্ব। মনে রাখতে হবে, "যতঃ প্রবৃত্তি ভূ´তানাং যেন সর্বমিদং ততম্"...। যা থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি এবং এই সমস্ত জগৎ যা দিয়ে ব্যাপ্ত, তাঁরই উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ কর্ম করে আত্মনিবেদন সার্থক করে তোলা কর্মযোগের সাধনা। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তাঁর স্বরূপ-শক্তিতেই কর্ম। সেই শক্তিকে ছাপিয়ে এক অসৎ (Pure Transcendence)—এই আভাস চেতনাকে কর্মের মাঝে সর্বদা ধরে থাকবে। পাওয়া ও না-পাওয়া দুই মিলিয়ে এক পরম অস্তিভাব, তাতে হাঁ ও না দুইই থাকতে পারে। প্রজ্ঞা যেন পুরুষ, আর প্রেম যেন প্রকৃতি। পরম পুরুষ দ্রষ্টা হয়ে পরমা প্রকৃতিকে ধরে রেখেছেন; পরমা প্রকৃতিই সব কিছু হয়েছেন, আর তখন পুরুষ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। বিশ্বসৃষ্টিতে এইভাবে তাঁর প্রেমেই কর্ম মধুর হয়ে ওঠে। জগৎলীলায় তিনিই প্রকাশিত, শক্তির ঐশ্বর্যে তিনিই প্রতিষ্ঠিত। শক্তিকে নিয়েই তিনি পূর্ণ। তাই তাঁর কর্ম সত্য, বিশ্বকর্ম তাঁরই কর্ম। শিব শক্তি ও জীব এই তিন ভাব নিয়েই কর্ম সম্পন্ন হবে। গীতায় ভগবান বলেছেন "মৎ কর্মপরমো ভব"। তাঁর কর্ম করে তিনি হয়ে যেতে হবে। মানুষ হয়ে জন্মেছি মায়ার ঘরে, মহামায়ার বরে

শিব হয়ে যেতে পারি। এই যজ্ঞকর্ম সৃষ্টিতে হয়ে চলেছে। তাঁরই কর্ম; তাই দায় তো আমার নয়, তাঁর। এই সঙ্গে কর্মে জাগে এক রস-পিপাসা। যে বিচিত্র স্বাদ এই জগৎসৃষ্টির যজ্ঞে বহমান, তাকেও আস্বাদন করতে হবে, আর তখনই কর্ম হয় প্রেমেরও কর্ম।

কর্ম যখন জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে তোলে, তখন মানুষের জীবনে জিজ্ঞাসা জাগে। এ জিজ্ঞাসাও আমাদের জীবনকে দুধারায় প্রভাবিত করে—জগৎ-জিজ্ঞাসা আর আত্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। বেদে আমরা পেয়েছি বিদ্যার সাধনার কথা। সেখানে বিদ্যাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। ছান্দোগ্যোপনিষদ আমাদের শুনিয়েছেন নারদ সনৎকুমারের সংবাদ। নারদ ছিলেন তথাকথিত জ্ঞানী, তিনি মন্ত্রবিৎ হয়েই এসেছিলেন সনৎকুমারের কাছে। সনৎকুমার তাকে ভূমার বিজ্ঞান দিয়ে ভূমানন্দে পৌঁছে দিলেন। বিজ্ঞান বোধিজ প্রত্যয়, ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে জানা হল বিজ্ঞান। তখন দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান হয় আত্মারই অথবা ভূমারই। পুরুষ তখন স্বরাট। চেতনার যে কোন ভূমিতে তখন তাঁর অবাধ গতি এই হল স্বারাজ্যমুক্তির সিদ্ধি। এক কথায় পরা বিদ্যা দিয়ে অক্ষর তত্ত্বকে জানা চলে। কিন্তু পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার মাঝে মৌলিক কোন বিরোধ নেই কেননা দুটিই এক পরমা প্রজ্ঞার প্রকাশ। বোধির রাজ্য থেকে নেমে পরা বিদ্যা মানুষের মনের রাজ্যে এসে দর্শন আর ধর্মের রূপ নিয়েছে। এদিকে অপরা বিদ্যার কারবার লোকোত্তর নিয়ে নয়, লৌকিক নিয়ে। বিজ্ঞানের সহায়ে সে চায় প্রকৃতির শক্তি আয়ত্ত করতে, শিল্পে আর কলায় রস-চেতনাকে মুক্তি দিতে, এই ঐহিক জীবনকেই জেনে বুঝে তাকে সমৃদ্ধ করতে। বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের সাধক বিদ্যার সাধনায় লোকোত্তর আর লৌকিকে কোন বিরোধ দেখেন না। উপনিষদ বলেছেন তাঁরই পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার মধ্যে তাঁর আলো পড়লে হয় পরা বিদ্যা, এই হল সমাধান। যখন পরা বিদ্যার

অনুশীলনে তাঁকেই সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে একান্তভাবে চেয়ে উজিয়ে যাই, তখন অপরা বিদ্যার প্রতি প্রত্যাখ্যানের মনোভাব আসে। কিন্তু আবার সবই তিনি, এই ভাবের দর্শনে যখন পূর্ণতা লাভ করি, তখন আর প্রত্যাখ্যানের কথাই ওঠে না। অপরা বিদ্যা তখন পরা বিদ্যারই বিভূতি, তারই অধীন।

এ যুগে বিদ্যার সাধনায় মানব জীবনে যে মূল্যবোধ এখন স্থান অধিকার করে আছে, তা হল ধর্ম দর্শন শিল্প ও বিজ্ঞান (Science)। এই চারটি মূল্যবোধের পরেই দিব্যজীবনের আলো এসে পড়বে, সেটাও দিব্যজীবনের জ্ঞানের সাধনা। গতানুগতিক শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা তো আছেই; কিন্তু কোন সাধকের যোগে এ বিষয়ে যদি এক নতুন আলোর দিগন্ত খুলে যায়, তাকে বলা হয় প্রতিভা। এতে তখন এমন কিছু যুক্ত হয়, যাতে বিদ্যার সাধনায় সব কিছুকে নতুন আলোয় উজ্জ্বল করে দেয়। উর্ধ্বতন লোক থেকে এই আলোক সম্পাত সাধকের নিজের কাছেই এক বিস্ময়বোধ নিয়ে আসে। তাকে বলে প্রতিভ সংবিৎ (Intuitive Faculty)। এই রকমে হলে, তবেই অপরা বিদ্যার রূপান্তর ঘটে। প্রাণময় সত্তার ইষ্টার্থের বোধের ওপরেই, বিজ্ঞানের আলো পড়ে তার যথার্থ মূল্য দেখিয়ে ও চিনিয়ে দেয়। তখনই বিদ্যা ও অবিদ্যার কৃত্রিম বিরোধের অবসান হয় এবং বিদ্যার দ্বারাই অমৃত সম্ভোগ করা যায়।

মানুষের জিজ্ঞাসা যখন জাগে, তখন সাধারণ ভাবে তার দুটি ধরণ দেখা যায়—কেন এবং কেমন করে (Why and How)। পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেন, কেন এর জবাব দেয় দর্শন এবং কেমন করে এর জবাব দেয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী যথাসম্ভব তার তথ্যগুলি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে সাজিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেন, কি ভাবে জ্ঞান লাভ করলে সব জানা যাবে; কিন্তু কেন সেরকমটি হল, সে কথার উত্তর তার কাছে মিলবে না। এই রকমটি যে হয়, এটাই ধরা পড়ে। কিন্তু মানুষের জিজ্ঞাসার বৈশিষ্ট্য হল এই, যে শুধু

ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিয়েই সে তৃপ্ত থাকতে পারে না। ভাব দিয়েও সে জানতে ও বুঝতে চায়। ব্যক্তিগতভাবে নিজের সংগৃহীত জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞানে পর্যবসিত করে সে পায় বিশ্বগত (universalised) জ্ঞান। মানুষকে তখন বলা হয় মনস্বী। তাই মানুষ থেমে থাকতে পারে না। তার অহেতুকী প্রশ্ন জাগে "কেন"? এ জগৎ কি, তার মূলই বা কি, আমি কি ও কে, কোথায় যাব, জীবনের লক্ষ্য কি ইত্যাদি। এ প্রশ্ন দৈনন্দিন অন্নগত জীবনের প্রশ্ন নয়। কেন এমন হল, এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে খেই হারিয়ে না ফেলে, সমস্ত জীবন দর্শন দিয়ে ব্যক্তির জীবনের যেটি মরমী সমস্যা, তার সমাধান করা—এটাই দর্শনের দিক। এটা অতি সূক্ষ্ম বস্তু (abstract), হয়তো জীবনের ব্যবহারিক কর্মে লাগে না। কিন্তু এই অনুভূতি জাগিলে, তার উৎস ও লক্ষ্য বুঝে, তাকে রূপ ও ভাষা দেওয়াও মানুষের এক দায়। এ আকাঙ্ক্ষা জীবন জিজ্ঞাসারই এক দিক। কিন্তু এতে সাবধান হতে হয় যে, সে দর্শনের ফল যেন জীবনের অনুগামী হয়। মানুষের ব্যবহারে সেটা এমন ভাবে লাগা চাই, যাতে ভাবের দিক দিয়ে তা তাকে বৃহতে ব্যাপ্ত করতে পারে। এই ভাবের জানা আরও গভীরে তখন আর এক জানায় নিয়ে যায়, তাকে বলে ধর্ম-জিজ্ঞাসা। হৃদয়ের আলোর পিপাসা থেকেই এই আকুতি আসে।

সাধারণত ধর্মের সংস্কার নিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তার জন্ম ও পরিবেশ থেকে এক ধর্মবোধ লাভ করে। এটা সমাজগত; কিন্তু এ থেকে কারও ধর্মজিজ্ঞাসার সূক্ষ্মে ও গভীরে প্রবেশ করলে, সেটা ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সে রসপিপাসা জীবনের গভীরের মূল রসসঞ্চারীকে চায়। নাড়ীতে নাড়ীতে সর্বাঙ্গব্যাপী তার প্রবাহ সঞ্চারমান না অনুভব করা পর্যন্ত তাকে তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত করা যায় না। আমরা এদেশে প্রকৃত ধর্মবোধ বলতে জীবনের সবটাই বুঝি। যে-সব উৎসবের আচার ধর্মানুষ্ঠানের বার মাসে তের পার্বন

হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলি জীবনের রসেই সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে উর্ধ্বমূখী করার প্রয়াসী। শ্রীঅরবিন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে, ধর্মের আচরণে মোহগ্রস্ত হয়ে গণ্ডীবাঁধা এক গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়ে যে ব্যক্তিগত বিকার—যা থেকে সিদ্ধাই আসে, তা মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। তাই সামান্য শক্তি লাভ করে বাহিরে প্রচার করে বেড়ানো, মিথ্যা ভাবালুতা নিয়ে স্বার্থমগ্ন হয়ে থাকা, ভাবে উন্মত্ত হওয়া, দাসত্ব করা—এই সব চেতনা অসাড় হয়ে যন্ত্রবৎ বাঁধাধরা পথ ধরে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সব ধর্ম ও দর্শনের বিকৃতি, আমাদের চিত্তের ও বুদ্ধির অশুদ্ধি ও তজ্জনিত বিকারের ফল।

কিন্তু ধর্ম ও দর্শন আমাদের অন্তরের বস্তু, তা পরা বিদ্যারই আশ্রিত। অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে যেমন জ্ঞান লাভ করতে হয়, তেমনি আবার সেই জ্ঞানের আলোয় বাহিরটা দেখতে ও জানতে হয়। সেজন্য ধর্ম ও দর্শন প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে পারলে পরা বিদ্যায় বিদ্বান হওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে জীবনের কর্মকে জানতে হয় ও কলা কৌশলে (Art) সেই কর্মসাধন করতে হয়। জাগ্রতের জীবনে আমরা যে মন দিয়ে জ্ঞান আহরণ করি, এই বিজ্ঞানের এলাকা সাধারণভাবে তাকে অতিক্রম করে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই জ্ঞান লাভ করতে চায়। মনের গভীরে যথাসাধ্য অনুপ্রবেশ করে ও তথ্য সংগ্রহ করে সে তত্ত্বটি উদ্ঘাটন করতে চায়। কিন্তু মনের এ দেখা পরাক্ দর্শন (Objective vision), প্রত্যক দর্শন (Subjective vision) নয়। এ থেকে প্রাণবিজ্ঞান (Biology) মনোবিজ্ঞান (Psychology), এসবের বহুমূল্য তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জাগ্রত চেতনার স্তরগুলি পেরিয়ে গিয়েও এই বিদ্যার বিষয় সূক্ষ্মচেতনাসঞ্চারী হয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত। কিন্তু এসব বিদ্যাকেই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় করে রাখা হয়েছে; বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়চেতনাকে একাকার করে তত্ত্বটিকে অনুশীলন করা হয়নি। তাই

বহু শিল্পী ও বিজ্ঞানীর জীবনের ব্যবহারিক দিকটা অতিশয় অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হতে দেখা যায়। তারা যেন সব স্বপ্নসঞ্চারী শক্তিকে (Somnambulist) জ্ঞানলোকের ঐশ্বর্য অপহরণ করে চলেছে, মূলের সন্ধান পায়নি। সেই কারণেই তাদের মণীষা থেকে বড় জোর এক যান্ত্রিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ উপকরণবহুল সমাজ আড়ষ্টভাবে কিছুকালের জন্য উন্নত বলে দেখা দিতে পারে। কিন্তু মানুষের তো শুধু তা নিয়ে চলবে না।

যথার্থ অভ্যুদয়ের পথে সমাজকে তুলে নিতে হলে মানুষের আস্পৃহার গভীরে গিয়ে মূলের সন্ধান লাভ করে, সেখানে রস সঞ্চার করতে হবে। আর সেটা হবে মানুষের নিজের গরজে—অন্তরাত্মার আহ্বানে। মানবিকতা বা মানুষের ধর্মবোধ এযুগের চেতনায় একটা বড় স্থান অধিকার করেছে। মানুষকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে, সেকথা ঠিক। কিন্তু সে কোন মানুষ? 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বলে এদেশের বাউল যে মানুষের প্রেমেই প্রাণের প্রদীপটি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে আরতি করেছেন। মানুষ হয়ে যে কেন জন্মেছি, অগণিত কোটি কোটি জীব সৃষ্ট হয়ে চলেছে কেন, তা কি আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি? তাই তো মনের মানুষ নিত্য মানুষ বলে আমরা যে মানুষকে ভালোবেসে আত্মহারা হতে চাই, তাতে শুধু ইন্দ্রিয়সর্বস্ব আটপৌরে জীবরূপে মানুষকে পেলেই তো আর হবে না। প্রতিটি মানুষে হৃদিসন্নিবিষ্ট পুরুষটি যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁকে দেখে তাঁর ইচ্ছাটি ধরতে পারলে, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্য বোঝা যাবে ও ওই সঙ্গেই প্রতিটি মানবের জীবনের সার্থকতা ধরা পড়বে। শুধু পরিমাণের (quantity) মূল্যায়নেই মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণায় যেমন আছে বিস্তারের দিক, তেমনি আছে গভীরে রসের দিক। এই রসপিপাসার তাগিদেই মানুষ ভাস্কর্য চিত্র সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পকলা সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে চলেছে। তার 'সীমানা লোক থেকে লোকোত্তরের রাজ্যে উধাও হয়ে গেছে। এতে

মানুষের লাভ হয়েছে, অতীন্দ্রিয় রসলোকের ও সৌন্দর্যলোকের আভাসে যানবমন অমৃতত্বের আস্বাদ পেয়েছে। এইভাবেই তার কাছে ধ্যানের ভূমিগুলি অবাধিত হয়ে চিত্তে মুক্তি এনে দিতে পারে। কিন্তু এই শিল্পবোধ যদি আবার চিত্তের বিকারে মগ্ন হয়ে, তাকেই বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করে প্রাকৃত নেশায় মনকে বুঁদ করে রাখতে চায়, সেটা হবে চেতনার অবক্ষয়। শিল্পকলা (Art) নিয়ে এরকম এক হিজিবিজির যুগও এখন কিছু পরিমাণে এসে পড়েছে। তাকে কোনমতেই রসোত্তীর্ণ বলা যায় না। সেটা Art-র অবক্ষয় (decadence) সূচিত করে। এগুলি হল রসতৃষ্ণার মরীচিকা, মরুদ্যান নয়।

দর্শন ধর্ম শিল্প বিজ্ঞান এই চারটি বিদ্যাকেই দিব্য জীবনে তুলে নিতে হবে। তা করতে গেলে উপনিষদ যেমন বলেছেন, সেই রকম অসীম ভূমা হয়ে যেতে হবে। আমরা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই অসীমের উল্লাসেই প্রকৃতি সব কিছু হয়ে চলেছে, যথার্থ জীবনশিল্পকে ফুটিয়ে তুলছে। সেই ঋতিকে আশ্রয় করলে বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্যও প্রতিভাত হবে। সেই কারণেই মনন ও বুদ্ধিকে ভূমার ব্যাপ্তিতে রক্ষা করতে হবে, এই সাধনটি চাই। যে ভাবে এটা সম্ভব হয়, সেই ব্রহ্মকারা বৃত্তিই হল বোধি। বুদ্ধির সহায়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, বোধির আলো হারিয়ে ফেললে বিরোধ দেখা দেয়; গণ্ডিবাঁধা মতুয়ার বুদ্ধিতে অনেক সময় একগুঁয়েমি এসে এক পাথরের দেয়ালের মত নিরেট বাধা সৃষ্টি করে। তখন সে ওপরের আলো নিতেও চায় না, ভাবে বেশ আছি। কিন্তু বেশ যে নেই বা ওভাবে বেশ থাকা যায় না, তা আমরা জীবনের প্রতিপদেই বুঝতে পারছি। সারা পৃথিবীতেই হানাহানি ও মতবিরোধ বেড়েই চলেছে। সমস্ত দেশগুলি যুক্তিসহকারে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে U.N.O. গড়ে তুলেও তার সমাধান করতে পারছে কি? তাই বুদ্ধির শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় সাধন এবং বোধিকে সত্য বলে জেনে বুদ্ধি

তার অনুগত হলেই সেটা সম্ভব হবে। এই ভাবে অসীম ও অনন্তের সঙ্গে যোগ রেখে ব্যক্তিগত জীবনও সফল হতে পারবে। কেননা সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধি খাটিয়েই চলতে হয়। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মায়ের সঙ্গে যোগ থাকলে মা-ই রাশ ঠেলে দেন। আলোর মত সহজে সেই সত্য বিকশিত হয়; সেই বোধির আলোতে বুদ্ধিকে যুক্ত করতে হবে। এইভাবেই প্রতিভা স্ফুরিত হয়।

"সাবিত্রী"তে কবি বলেছেন Musings of eternity। নিদাঘের শুদ্ধ দ্বিপ্রহরে কপোতকূজনের মত তার বাণী অগাধ অতল নৈঃশব্দের গহন হতে ঝরে পড়ে; মন বুদ্ধি সেখানে থৈ পায় না, ডুবে নিশ্চল হয়ে যায়। এই শরীর যন্ত্রের যান্ত্রিক জানাকে অতিক্রম করে ওই বৃহৎ জানাকে পেতে হবে। এ যেন দরজা জানালা সব হাট করে খুলে মেলে দিয়ে জানা; এ জানার এক আরামও আছে এবং এতে না পারার কথা নেই। উপনিষদের আকাশ ভাবনাকেও এই ভাবে বুঝে নিতে পারি। সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে মীনের মত বিচরণ করা এই ভাবেরই সাধন। এতে আমাদের বুদ্ধি প্রতিভার আলোয় মার্জিত ও দীপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্র দেহ প্রাণ মন নিয়েই তো আমার যজ্ঞভাবনা। এই অণুরও অণু রয়েছে মহতেরও মহীয়ানের মধ্যে, আর সেই অণুর মধ্যেই বনস্পতির বীজের মত মহৎ ও বৃহৎ তার সমগ্রশক্তি ও সম্ভাবনা নিয়েই ক্ষুদ্র হয়েছে। এই ভাবে অসীম ও অনন্তের ভাবনায় এর ঘুম ভাঙিয়ে এই জড় আয়তনকে রূপান্তরিত করতে হবে। কর্মকে তাই প্রত্যাখ্যান না করে, ও যথাবিহিত কর্ম করে আমার এই ভূমিকাটি যথাসম্ভব নিখুঁৎ ভাবে সম্পাদিত করতে হবে। কিন্তু সে কর্ম ও তার সম্পাদনা ভূমারই, তার উদ্দেশ্য যজ্ঞেশ্বর বা মহাশক্তিতে পৌছান। সবই তো তোমার, সূর্যের আলোর মত সর্বাবগাহী তোমার প্রকাশ। "প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী দাঁড়াব তোমার সম্মুখে"—এই বলে প্রতিদিনকার সব কর্ম তোমার দৃষ্টির সামনে সম্পন্ন করে, তোমাতেই

নিবেদিত হয়ে চলেছি। এমনি করেই অংহঃ বা অহং এর ক্লিষ্টতা ও ক্ষুদ্রতার জট খুলে যায়, আর শুদ্ধ আমিতে সৌর কিরণগুলি স্নিগ্ধ হয়ে চাঁদের আলোয় পরিণত হয়।

এই ভাবে কর্মের গতি ঊর্ধ্বগ হয়। ছোট কাজ বলে কোন কিছুকে তুচ্ছ ভাবতে নেই, সব কিছুই তো বৃহতের আলোয় অপক্ষপাতে সম্পাদিত হয়ে চলেছে। আশ্রমে যেমন দেখতে পাই, Mother এর দৃষ্টির সামনে তাঁরই শক্তিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব রকম কর্মের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে। যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করলে দীপশিখার মত ঊর্ধ্বমুখী ধারা যেমন উজানে চলে, সেই সঙ্গে আদিত্যপুরুষের সোমের ধারা নেমে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই হল জগতের সৃষ্টিতে কর্মের গতির মূল রহস্য—অগ্নীষোমাত্মক জগৎ। জগতের হরণ ও পূরণের ভারসাম্য এইভাবে অগ্নি ও সোম আদিত্যের শক্তিতে রক্ষা করেন। অনন্তের ভাবনায় কর্ম করতে এই ভাবের আরোপে দেখা যায়, তাঁর শক্তিই আমার কর্মকে রূপান্তরিত করে নিয়ে চলেছে। প্রথমে তিনি করান, যেন হাতে ধরে নিয়ে যান। তারপর বোধে আসে, তিনিই করছেন। তখন শুদ্ধ আমির নির্বিকার দ্রষ্টৃত্ব ও তাঁর আবেশের ফলে প্রাকৃত চেতনার রূপান্তর শুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই চেতনার পরিবর্তনের দিকেই বিশেষ করে লক্ষ্য করতে বলেছেন। সে যেন এক অঘটন ঘটে যাবার মত জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়, ইষ্টার্থের বোধও তখন বদলে যায়। সত্যাত্ম চৈত্যপুরুষের দৃষ্টিপাতে প্রকৃতির রূপান্তরের কর্ম সার্থক হবার পথে চলে; শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থার নাম দিয়েছেন Psychicisation চৈত্যরূপান্তর। এই আত্ম-আবিষ্কারের পথে হৃদয় খুলে যায়, বিরাট জগতের সঙ্গে প্রেমের আলিঙ্গনে মন আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁকে কেন্দ্র করে আমার সব কর্ম উদ্‌যাপিত হতে দেখি; চৈত্যপুরুষ তার পুরোহিত। এতদিনে অন্ধের মত আপনাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে চলেছিলাম। তাঁকে কেন্দ্রে রেখে কর্মের পরিক্রমার ভাবনার ধারা বদলে

যায়, সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরে নির্ভর করে সহজে তাঁর কর্মের ভার বহন করা যায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহের পরিক্রমা দেখিয়ে কপার্ণিকাস্ যেমন চিন্তা-জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন, এও সেইরকমভাবে জীবনের এক কম্বুরেখ আবত ঊর্ধ্বগ সহজ গতিপথ সূচিত করে। জীবন সহজ হয়ে যায় আর তাঁকে নিবেদন করার ইচ্ছাটুকুই অবশিষ্ট থাকে। বিরাটে চেতনার ব্যাপ্তি সর্বদা কর্মের সঙ্গী থাকে বলে, কর্মের বিক্ষোভে দুঃখ ও অবসাদ আর পেড়ে ফেলতে পারে না।

এইরকম করে তাঁকে চেয়ে যত তাঁর সমীপবর্তী হব, ততই চিত্তের উদারতা বেড়ে যাবে, সঙ্কীর্ণতা থাকবে না। তাই চেতনাতে যত কিছু খাঁজ পড়েছে বা মরচে পড়ে স্থানে স্থানে করকর করছে, সে সবই তাঁর দৃষ্টিশক্তির সামনে খুলে ধরতে হয়। তাহলে সেগুলি সবই আবার তাঁর শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে অসীমের সঙ্গে যোগ রেখে চলার পথে প্রত্যেকের স্বধর্ম অনুযায়ী নিজস্ব পথ করে নিতে হবে। সুদিস্থিত দেবতাতে একান্তী হয়ে তাঁকে আবিষ্কার করে জানার পথে কর্মযোগে এক তৃপ্তি ও স্বাদ আছে। প্রথমে সে উজ্জ্বল রসধারাটি ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত বইতে থাকে। কিন্তু মূলের সঙ্গে যোগটি সুদৃঢ় ভাবে ধরতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। বহু ধারা এসে তাতে মিলিত হয়ে তাকে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলে। রামকৃষ্ণদেব যেমন দেখিয়ে গেছেন, সেই রকম সব রকমের সাধকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে রসাস্বাদন করা যায়। অসীমকে জানার উল্লাসে সেইরকম মহাশক্তিশালী প্রতিভার পরিচয় পেলে, পূর্ণযোগের সাধকও বহুবিচিত্র পথের আলোতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন পাঁচভেলে হওয়ার কথা। ঈশ্বরের লীলা আস্বাদনের তো অন্ত নেই, তার কত বৈচিত্র্য। তাই সাধনপথেও কর্মযোগ শুরু করার পর কত কর্ম খোলসের মত খসে পড়ে, আবার যেন নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, সব কর্মের ধারাগুলি এসে

মিলেছে ; কোনটি হারায়নি, কিছু খোয়া যায়নি, সবগুলি একত্র গ্রথিত হয়ে বিরাট এক ধারা স্যন্দমান সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এইভাবে সব কর্মের সার্থকতা। চেতনা যেমন ব্যাপ্ত হয়ে বৃহৎ হবে, সেই বৃহৎ সামের ছন্দে জীবনের সব কিছুই তেমন ছন্দোময় হবে। ঈশ্বরের কর্ম বলেই সংসারের তুচ্ছ কর্মও বৃহতের আবেশে সরস হয়ে উঠবে, জীবন সহজ ও সুন্দর হবে।

তাহলে এই সহজ অবস্থার গতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎসর্গের ধারাটি কিভাবে তার লক্ষ্যে পরিণতি লাভ করছে। প্রথম ভাবটি হল আমার সব কিছু তোমার। সমস্ত জীবন ধূপ-শিখার মত জ্বলে তোমার দিকেই উড়ে চলেছে। দ্বিতীয় অবস্থার ভাব এলে দেখি, এ তো অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিইনি; তিনিই তো এসে তাঁর কর্মের ভার দিয়ে আমাকে তার নিমিত্ত করেছেন। এ ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি আমি হয়ে গেছেন। দূরে তুমি অসীম, অন্তিকে তুমিই সসীম। তখন শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি বদলে যায়, আর তোমাকে কেন্দ্র করে উর্ধ্বগতি হলে দেখি—এ আমি তুমিই। এইভাবে অসীমের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ হয়। মন ও বুদ্ধির ওপারে ঈশ্বরের জ্ঞান হলে বোধির রাজ্য খুলে যেতে থাকে। তখন সেই প্রজ্ঞার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রজ্ঞার কর্ম সিদ্ধ হয়ে চলে। চৈত্যপুরুষ পুরোধা হয়ে এই সহজ অবস্থাকেই নিয়ে যান ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতায়। তখন ষোড়শকল আধ্যাত্ম সিদ্ধিতে এক মহাসমন্বয়ী শক্তির আবির্ভাবে প্রকৃতির মহত্তর চিন্ময় রূপান্তর সাধিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এরও আগে নিয়ে গেছেন তাঁর পরম সমন্বয়ী সিদ্ধিকে, যাকে বলেছেন অতিমানসী সিদ্ধি ও অতিমানস রূপান্তর (Supramentalisation, supramental transformation)। কিন্তু সিদ্ধচেতনাতেও সে অনেক পরের অবস্থা।

বোধির কথা আমরা অনেকবার উল্লেখ করে থাকি। মন দিয়ে শুধু ভাবনা করে, তাকেই অবলম্বন করে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, যতক্ষণ তার উপরে বোধির আলো এসে না পড়ে। পূর্ণযোগের সাধনে এই বোধির ঘটকত্ব

অপরিহার্য। এই বোধির আলোয় মনও নতুন করে আবার গড়ে ওঠে। তখন মনের মধ্যে দ্বিধা বৃত্তি চলতে থাকে। সূর্যের আলোর মত তাঁর চৈতন্যের আলোর মাঝেই তিনি ঘিরে রেখেছেন—এই বোধই মনকে বোধির সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু মন আবার অন্য সময় বলে, তাঁকে এত ডাকি তবু পাইনে কেন? তখন মনকে জোর করে একাগ্র করতে চাই। কিন্তু তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তাকে একমুখী করলে কিছুতেই তা বশে আসে না। কিন্তু চেতনার সবটা মন প্রাণ দেহ একই সঙ্গে শিথিল করে দিয়ে যদি তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিই; তিনি তাঁরই শক্তিতে নেমে আসেন আমার এই স্থির সুখাসনে। তখন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আবির্ভাবে হৃদয় আপ্লুত হলে, মন স্বভাবতই তাতে একাগ্র হয়। তাতে কর্মের মামলাও সহজ হয়ে যায়। তখন দেখতে পাই, একেবারে দৃশ্যমান পর্জন্যের মত তাঁরই করুণার ধারাসারে তিনি আমাকে শুচিস্নিগ্ধ করে ধৌত করে একেবারে ভরে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চেয়ে আছেন বলেই না তাঁকে চেয়ে চলেছি। এইভাবে চলার পথে অহংগ্রন্থির বাধাগুলি সব খুলে পথ সহজ হতে থাকে। তখন অনুভূতির রাজ্যে বোধই ব্যাপ্তিরূপে চতুর্দিক আবৃত করে। সর্বব্যাপী বিশ্ব তো তাঁরই ছটা, তাঁর অনন্ত রূপই ইষ্টরূপে বিগ্রহে বিগ্রহে প্রতিভাত—যেমন অন্তরে তেমনি বাহিরে। এইভাবে তাঁরই সঙ্গে নিত্যযুক্ত মনটি এই মনেরই ঊর্ধ্বতন স্তরে বিরাজিত, সেই জ্ঞান লাভ হলে এই মনেরও রূপান্তর সম্ভব হবে। এমনি করেই আকাশভরা আলো বা আকাশভরা আঁধারে, তিনি আমাকে আবিষ্ট করে জারিত করে রেখেছেন; সর্বদেহব্যাপী এই বোধটি অবাধে নেমে এলে চেতনা রূপান্তরিত হয়ে স্বচ্ছ হতে থাকে আর উষার উদয়ের মত চেতনার ক্ষেত্রগুলি উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল করে চিদাকাশে তিনি উদিত হন। সেই রূপান্তরিত চেতনায় মন তাঁরই কাজ করে চলে। ঐহিক ক্ষেত্রের বাধাগুলির পরে আলো পড়লে মনই তাদের খুঁচিয়ে বিবর থেকে বাহিরে নিয়ে আসে। তখন সেগুলি দেখে বোঝা যায় যে কত

কাজই বাকী আছে। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা বারবার বলেছেন, "Open yourself to the Mother—মায়ের কাছে আপনাকে খুলে ধর।" তার অর্থ হল এই। মন নীচে নেমে যায়, বোধি জাগ্রত হয়ে কার্যকরী হয়ে ওঠে আর মায়ের শক্তিতেই কাজ চলতে থাকে। চৈত্যপুরুষ তখন হৃদয়পুরে জেগে ওঠেন।

এই রূপান্তরিত চেতনাই নবজন্মের ফল। বৈষ্ণবেরা তাকে বলেছেন রাগের মানুষ, তার জন্ম তো যোনিতে নয়। এই নবীন ভাবসত্তা নিবিড় হতে থাকে, পরে সার্থক হয়ে ওঠে। তাঁর জ্ঞানের আলোই হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে বারবার সব আলোময় করে দিতে থাকে, তাতে প্রতিভাও দেখা দেয়। কামময় অহং বা কামপুরুষটি এতদিন যে আসনটি জবরদখল করে ঢেকে রেখেছিল, সেই আমিটি সরে যায়। তাঁর আসনে হৃদয়পুরে তিনিই সমাসীন হয়ে এই নিমিত্ত আমিকে যন্ত্র করে পরিচালনা করেন, এই বোধ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এমনি করে যে মনটি নবজন্ম লাভ করে, সেটি চিদ্‌বাসিত মন (Spiritualised Mind)—অধ্যাত্মচেতনায় সেটি চিদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে যায়। কিন্তু মনের সংস্কার তখনও থাকে, তার প্রাকৃত স্বভাবটিও অপরিবর্তিত থাকে। তাই সিদ্ধির উপান্তে এসেও সে মন ভুল করে, এমন সম্ভাবনা থাকে। তা থেকে আমরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও অন্যমতাসহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে থাকি। তাতে সমগ্র সত্যের সম্যক্ জ্ঞানের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি বিন্দুতে না দেখা পর্যন্ত মানস সংস্কার শেষ পর্যন্ত যেন গিয়েও যায় না। দিব্যমনের ক্ষেত্রটুকু বেছে নিয়ে কর্ম চললে সে মনের কর্ম চমৎকার চলে, কিন্তু মনের অবর ক্ষেত্রগুলি সে আলোয় তখনও ঢাকা পড়ে থাকে। তাই অতিমানস বিজ্ঞান যে মনের ওপারে অতিমানসলোকে, সেইখানে এই মনকে পৌঁছতে হবে, তবেই মনের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হতে পারবে। চিদ্‌বাসিত মন ব্যাপ্তিচৈতন্যে মুক্তিলাভ করে, তাতে

বিজ্ঞানের আলো এসে পড়ে। তবুও তার প্রাকৃত সংস্কারগুলি মগ্নচেতনায় ঢাকা থাকতে পারে, আর সেই কারণেই সমস্ত সাধনা সেখানেই নিরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

অতিমানস বিজ্ঞানলোকে পৌছানোর কয়েকটি ভূমি ক্রমপরম্পরা হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন। মনকে ক্রমসূক্ষ্ম করে তুলে নিয়ে গলিয়ে রূপান্তরিত করতে হবে, এই প্রজ্ঞার কর্ম। মানস বৃত্তিগুলি জোর করে যেমন বন্ধ করা যায় না, তেমন আবার ওপরের আলো জোর করে টেনে নামালেও অশুভ সংস্কারগুলি অব্যক্ত মনের অংশে চলে গিয়ে পরে আরও জোরালো ভাবে সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। পূর্ণযোগের পথ সর্বাবগাহী পূর্ণতার পথ। মনের সম্যক্ পূর্ণতাও ওই অতিমানসে। যে কোন পথ ধরেই মন জ্ঞানের চূড়ায় পৌছতে পারে, কিন্তু অনন্তের ঐশ্বর্য অনন্তভাবে তাকে জানা যায় না। মনকে কেটে ফেলে দিতে হবে না; সর্বগ্রাসী অনন্ত চেতনার অধিষ্ঠানে বিজ্ঞানের বিচিত্র ঐশ্বর্য নিয়েই, সম্যক্ জ্ঞানে মন পূর্ণতা লাভ করবে। উত্তর-মানস (Higher Mind), প্রভাস-মানস (Illumined Mind), বোধি-মানস (Intuitive Mind) এবং অধি-মানস (Over Mind)—অতিমানস (Supermind) পর্যন্ত মনের এই ভূমিগুলি অদ্বৈতচেতনায় সিদ্ধমনের ভূমি। তারও আগে যেতে হবে। এক নির্মুক্ত চেতনায় দিব্যমনের লক্ষণ আবেশে স্ফুরিত হতে থাকে। অতিমানসের পানে উত্তরায়ণের পথে ওই চারটিই মানসোত্তর বিজ্ঞানের ভূমি; এগুলিকে যথাসম্ভব বুঝে নেওয়া যাক।

প্রাকৃত মনের সঙ্গে উত্তর-মানসের মূল বিভেদ হল এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনের সংস্কার ছাপিয়ে উত্তর-মানসের দৃষ্টি চলে যায় তার পিছনের ভাবে। তখন গোড়ায় থাকে ভাব ও তা থেকে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ। সে ভাব বিশ্বগ্রাহ্য। সেজন্য দেখা যায়, ইষ্টদর্শন বা ধ্যানজ্যোতির্দর্শন লাভ হলে তাই ধরে সে পথের নিশানা পায়। সে দর্শনের ভাব তার কাছে ইন্দ্রিয়দর্শনের চেয়ে অনেক বেশী

প্রত্যক্ষ। তাই রূপ-দর্শন উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেলেও, আবছা ভাবের মত সব সময় সেটি যেন ইন্দ্রিয়-সংবিতের পিছনে থাকে। ক্রমে ভাব এত বেশী জীবন্ত ও জলন্ত হতে থাকে যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দর্শনের ভিতরে উত্তর-মানসের অন্তর্দৃষ্টি পড়ে বহির্দৃষ্টিও সেই ভাবে ভাবিত হয়। বিষয় ও বিষয়ী একেরই দুটি মেরু—এই ভাবে দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি ও দৃশ্য একেরই বিভঙ্গ হয়ে দেখা দেয়। ব্রহ্মই সব হয়ে সব দেখছেন, তাই এই ভাবের আবেশে ধূলিকণার মধ্যেও সৌরজগতের মহিমা দৃষ্ট হয়। এইভাবে ব্যাপ্তিচৈতন্যের আধারে ক্রমে আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হতে থাকে, আর প্রভাস-মানস ইত্যাদি পরপর ভূমিতে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে চলে।

প্রভাস-মানসে বিচিত্র রূপে গাঢ় ভাবের প্রকাশ হতে থাকে, ইষ্টমূর্তি যেমন ঘনীভূত হয় চিৎএর উদ্ভাসে। সূর্যের আলো যেমন গাছের মধ্যে পড়ে তার বিশিষ্ট বর্ণটি বিস্ফুরিত করে দেয়, এ ভূমির দর্শনও তেমন ধারা। এই দর্শনে বোধি মানসের আলো এসে পড়ে, শ্রবণ দর্শন স্পর্শ এ-সবই তাকে অনুসরণ করে। ক্রমে এই দর্শনের পরিপাকে ভিতর বাহির একাকার হয়ে যায়। কারণ প্রভাস-মানস স্বরূপত এক বিশাল অদ্বৈত-চেতনার ভূমি। ভাব ঘনীভূত হয়ে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষের সাধন হয়, তাহলে মনের সাধারণ মনন-ক্রিয়া আর থাকে না, কিম্বা থাকলেও তা ভাববাসিত হয়েই দেখা দেয়। প্রাকৃত-মানস থেকে উত্তর-মানসে যেতে ইন্দ্রিয় হতে ভাবে, বিশেষ-দর্শন হতে সামান্য-ভাবনার দিকে উজিয়ে যাই এবং এই সামান্য-ভাবনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবকে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষে ঘনীভূত করতে পারি, তাহলেই প্রভাস-মানসের ভূমি অধিগত হয়। প্রভাস-মানসে বিষয় বা দৃশ্যের স্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে। গভীর ভালবাসায়ও এই স্বরূপানুভবের আভাস ফুটতে দেখা যায়। সেই যে আমার মনের মানুষ, সে চিন্ময়। সে মোটেই আরোপ মানুষ নয়, আমার প্রতিভ-সংবিৎ দিয়ে তার স্বরূপ যেন আমি আবিষ্কার করলাম। তার স্বরূপ আর সত্যের স্বরূপ একাকার।

প্রভাস-মানসের আগে আছে বোধি-মানস। উত্তর-মানসের দিব্য মনন আর প্রভাস-মানসের দিব্য-দর্শন দুয়ের উৎস সেই। বোধি-মানসের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও মর্মভেদী। সব জানাই শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় 'হয়ে জানা'তে বা বিষয়কে নিজের সঙ্গে একাকার করে জানাতে। আমাদের সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির মূলে এই তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের প্রেরণা রয়েছে। সেই তাদাত্ম্যবোধই হল বোধির বিশিষ্ট লক্ষণ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাঝেও বোধির আবেশ থাকে বলে, তাতে আমাদের এত বাস্তব প্রত্যয় হয়। কিন্তু তবুও সেখানে প্রত্যক্ষের বিষয় বিষয়ীর বাইরে, তাই বিষয়কে পুরাপুরি জানতে পারি না। জানার এই অভাব আমরা পূর্ণ করি অন্তরের ভাব দিয়ে। ভাবের মাঝে বোধির আবেশ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের চেয়েও অন্তরঙ্গ একরস প্রত্যয়। ভাবের এই পাওয়াতে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ ঘুচে যায়। প্রাকৃত জগতেও এই ভাবের জানার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সমবেদনা তার এক সর্বজনীন ও সুপরিচিত রূপ। কবির হৃদয়ে এই ভাবেই নিষ্প্রাণও স্পন্দিত হয় প্রাণস্পন্দে। বুদ্ধিও অন্তরাবৃত্তি ও তন্ময়তার ধারা ধরে চলতে জানে। বিষয়ে নিবিষ্ট একাগ্র চিত্তের তন্ময়তার গভীরে জ্ঞানের আলো 'দপ করে' যে জ্বলে ওঠে, এ তথ্য বৈজ্ঞানিকেরও অজানা নয়। কিন্তু যোগী যখনতন্ময় হয়ে বিষয়ীকে জানেন তখনও নিজেকে হারান না। সে জানাতে আত্মবোধ ও বিষয়বোধ দুইই উজ্জ্বল থাকে। এই অবস্থাকে জাগ্রৎ সমাধি বলা যেতে পারে। জাগ্রত চেতনায় আনন্ত্যের বোধকে নিরন্তর বহন করা যে পূর্ণযোগের সাধন, একথা আমরা আগেই জেনেছি। বোধির দর্শন হল আবৃতচক্ষু হয়ে নিজেকেই যেমন সামনাসামনি দেখা, তেমনি আবার সেই আত্মদর্শনের উল্লাস রূপান্তরিত হয় বিষয়ের বিসৃষ্টিতে। তাই তখন দৃষ্টিই হয় সৃষ্টি—যেমন হয় কবির হৃদয়ে কাব্যরূপের আবির্ভাবে, মরমীয়ার ভাব-সম্মেলনে। চৈত্য রূপান্তরের মত বোধি-মানসের মাঝে এই রূপান্তরে মনেরও এক নবজন্ম লাভ হয়, আর তা

প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে ও দেহচেতনাতেও উত্তর জ্যোতির দীপ্তি ও বীর্যকে ছড়িয়ে দেয়। তাই একেই বলা যায় ব্যক্তিসত্ত্বে প্রতিষ্ঠার ভূমি।

বোধি-মানস পর্যন্ত থাকে চিদ্‌বৃত্তির একাগ্রতা ; তা উর্ধ্বমুখ তীরফলকের মত বিষয়ের আবরণ ভেদ করে তার মর্মসত্যকে আবিষ্কার করে চলে। এ থেকে বস্তুর মূলে চিন্ময় ভাব রূপ স্পর্শের সংবিৎ উন্মেষিত হয়। এইসব চিদ্‌বৃত্তির উৎস হল এক সংহত আত্মসংবিৎ। আত্মসংহত বিশ্বব্যাপ্ত সেই চেতনায় নিজেকে অনুভব হয় বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু বলে। অনন্ত পুরুষের অনন্ত চক্ষুতে রাসচক্র জেগে উঠল বিচিত্র ভূতিতে (becoming in manifold ways)। যে আমি তখন বিশ্বসমুদ্রের বুকে আলো হয়ে দোলে, তার বোধে সংক্রামিত হয় বিশ্বাত্মারই সম্যক্ সম্বোধি (Spiritual Intuition)। এই হল অধিমানসের ভূমি।

অধিমানস এক সংবর্তুল চেতনার (global) ভূমি। মানস প্রত্যয়ের তা চরম ও পরম প্রতিষ্ঠা। এই ভূমিতে প্রেম জ্ঞান শক্তি, তাদের বৈশিষ্ট্য রেখেও একসঙ্গে থাকতে পারে এবং তা থেকে সাধক ভক্তি জ্ঞান কর্মযোগে, তার নিজস্ব দিব্য ধারাটির ক্রিয়ার অবরোহণের পথটিও পেয়ে যাবেন। চেতনার এই উত্তুঙ্গ ভূমিতেও কিন্তু চিদ্‌বৃত্তির প্রগতি শেষ হয় না। তাই পরমা প্রকৃতির অনধিগত রহস্য তখনও অনধিগত থাকে বলেই পরম সাম্যের সম্যক সিদ্ধি সম্ভবপর হচ্ছে না। সেই নিগূঢ়তম রহস্যই হল অতিমানস।

সাধনার দিক থেকে অধিমানস আর অতিমানস একেবারে মুখোমুখি হয়ে আছে। অতিমানসের চাপেই জড় অধিমানস পর্যন্ত ঠেলে ওঠে। এও অতিমানসের বিভূতি, একে সহজ একান্ত বিভূতি হতে হবে। গীতায় যেমন অর্জুনের জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদর্শন দিয়ে দিব্যজ্ঞানও দিয়ে দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে গলে মিশে গিয়ে, গীতা হয়ে যদি অর্জুন গীতা বুঝতেন তাহলে সমগ্র গীতা সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত হতে পারত। প্রজ্ঞা প্রেম

শক্তি সেখানে একেরই বিভূতি। গীতাতে প্রজ্ঞার দিকটি পরিস্ফুট, কিন্তু নেপথ্যে যে ভাগবত প্রেম, সেখানে তারও আবরণ ঘুচে গেছে। জ্ঞানকে ঠেলে দিচ্ছে সেই ভাগবতধর্মের রাসচক্র (Supramental)। এক্ষেত্রে অধিমানস ও অতিমানস নিয়ে ছোটবড়র কোন কথা আর নেই, যেদিকে তিনি দৃষ্টি ফেলছেন, তাঁর কর্মের অভিব্যক্তিকে যেভাবে সম্ভূত করছেন, তাই নিয়েই সম্যক্ দর্শন। অর্জুনের সারথি হয়েও তিনি দুর্যোধনের প্রেমিক। এ পর্যন্ত না যেতে পারলে তো মানস-সংস্কার শেষ পর্যন্ত যায় না ও তা না হলে একরস প্রত্যয়ও সম্যক্‌সিদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু সে রূপান্তর ঘটানো মানস প্রকৃতির সাধ্য নয়, তার সাধ্যের সীমা অধিমানসের উন্মীলন পর্যন্ত। দিব্য অতিমানসকে অধিমানসের মধ্যে পূর্ণভাবে কাজ করতে দিতে এক প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—Inscrutable Supermind leaning on Earth; অতিমানস সবার মূলে অধিষ্ঠান হয়ে আছেনই। তাকে ছেড়ে বিশ্ব-ব্যাপার হতেই পারে না। তবুও তার শক্তি পার্থিব লোকে এখনও প্রকট হয় নি।

প্রাকৃত মনের সামান্যভাবনার বৃত্তি ধরে সাধনার পথে অতিমানসের পানে উঠে যেতে সোপানগুলির বিবরণ পেলাম। মনের আড়াল ঘুচাতে তাকে অতিমানসের ধারা ধরেই লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, আর সেইভাবে প্রজ্ঞার কর্ম সংসিদ্ধ হয়ে চলবে। এভাবে ধর্ম দর্শন শিল্প বিজ্ঞান জীবনের সর্ববিদ্যায় প্রজ্ঞানকে নামিয়ে এনে কর্মকে উত্তরভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। ব্রহ্ম তার সম্যক্ জ্ঞান নিয়ে যেমন কর্ম করে চলেছেন, দিব্যকর্মে তাঁর মত হয়ে কর্ম করতে হবে—দিব্যকর্মযোগের ওই সুদূর নিশানা। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

১৩

প্রেমের কর্ম—চৈত্যপুরুষ ও ভালবাসা

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে আমরা দেখেছি সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তিকে। তাঁর সৎ-স্বরূপের প্রকাশকে বলি অধিষ্ঠান, যাতে এক অবর্ণ সমতার ভাব। যোগে তাকেই বলে সমত্ব—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" তাঁর চিৎ-স্বরূপের প্রকাশ প্রজ্ঞায়, আর তারই পরিচয় বিজ্ঞানে। এই বিজ্ঞানের আলোই মনে নেমে এসে খণ্ডিত হয়েছে। মনকে বিজ্ঞানে তুলে নিয়ে তার জড়স্বভাব পরিবর্তিত করতে হবে। পূর্ণযোগের সাধনায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা অতিমানস রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রজ্ঞার কর্মের আলোচনা করেছি। কিন্তু ব্রহ্ম যে আবার আনন্দ-স্বরূপই : আর তার প্রকাশ হয় প্রেমে। তাই প্রেমের কর্মে সেই ভালবাসার স্বরূপ লক্ষণটি ও বিলাস উল্লাসের বৈচিত্র্যটিও যথাসম্ভব বুঝতে ও পেতে হবে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, আনন্দং ব্রহ্ম। এই প্রজ্ঞাসমন্বিত আনন্দের বিচ্ছুরণ হয় ব্রহ্মের শক্তি-স্বরূপ। তাহলে ব্রহ্মের সৎ-স্বভাবকে অধিষ্ঠান রূপে রেখে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর চিৎ-স্বভাব থেকে প্রজ্ঞার কর্ম, আনন্দ-স্বভাব থেকে প্রেমের কর্ম ও শক্তি-স্বভাব থেকে প্রাণের কর্ম বিচ্ছুরিত হয়ে যেন উথলে পড়ছে। চৈত্য, চিন্ময় ও অতিমানস এই তিন ভাবে রূপান্তরিত চেতনাই পূর্ণযোগের সম্যক্ সিদ্ধিতে অধিগত হবে অতিমানসী শক্তির অবতরণে, সে আভাস পর্যন্ত আমরা পেলাম। প্রজ্ঞার প্রসঙ্গে একটা ক্রম দেখিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সাধনা ক্রমেও চলে, অক্রমেও চলতে পারে। তাই চৈত্য পুরুষকে জাগানোই আসল কথা এবং চৈত্যরূপান্তরের দিকে দৃষ্টি রেখে সাধনপথে চলাই সমীচীন।

হুঁশে থেকে সাধনা করতে হয়, ভাবাবেগে অন্ধ হলেই মুশকিল।

বিবেক-বিচারকে নিরাপদ আশ্রয় করে জ্ঞানের পথে চলার কথাতে মস্তিষ্কের ক্রিয়াই প্রধান, এইরকম মনে হয়। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সত্তার ভূমিকাতে প্রজ্ঞার বেদি গড়ে তুলতে হয়; সাধনায় এটা যেন পৌরুষের দিক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এই সব মহাবাক্যের আদেশে পৌরুষের ব্যঞ্জনাই স্পষ্টত অভিব্যক্ত দেখতে পাই। এর ওপরে হৃদয়ের অর্গল উন্মুক্ত করে আত্ম-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে পারলে রসের অনুভূতিতে প্রাণ যখন আবার নতুন করে জেগে ওঠে, তখন বোঝা যায় যে হৃদয় যেন এতক্ষণ শুষ্ক ছিল; আমরা ভালবাসতে পারি নি তো! তখন প্রজ্ঞায় স্থিত হয়ে হৃদয় দিয়ে সাধনা শুরু হয়। তাহলে আবার পেলাম, সৎ চিৎ যেন পৌরুষের দিক দিয়ে জ্ঞানের দেবতা শিব, অচল অটল; আবার তাঁরই উল্লাস আনন্দময়ী প্রকৃতি ভুবনেশ্বরী শক্তি। এইভাবে শিব-শক্তিতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত সাধনায় আমরা জ্ঞান প্রেম ও শক্তিকে কর্মে মিলিয়ে নিতে পারি। সাধনার পথে মস্তিষ্কে (বুদ্ধিতে) হৃদয়ে ও সঙ্কল্পে উত্তরোত্তর তার প্রকাশ সুসমঞ্জস হতে থাকে। হৃদয় উন্মুক্ত হলে বোঝা যায়, মহাপ্রকৃতি জীবের মধ্য দিয়ে নিজেই সাধনা করে চলেন, চৈত্যসত্তা (soul) তখন হৃদয়ের পুরোধা।

আমরা অনেক সময় নিন্দাচ্ছলে কোন মানুষকে বলে থাকি বিরস (heart-less)। তার অর্থই হল তার আত্মা জাগে নি, হৃদয়ের রসের সন্ধান সে পায় নি। অথচ এই হৃদয়ের ভালবাসাতেই কামনা বাসনার রস এমন ভাবেই গেঁজে ওঠে যে, তাকে হৃদয়ের মৌলিক বৃত্তি বলে ভুল করে, মানুষের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক পাতিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেখা যায় যে, বাসনার ক্ষণিক তুষ্টি হলেও তা ভালবাসার মানুষকে ও যে ভালবাসে তাকে, সার্থক করে তুলতে পারল না। এক তিক্ততা ও অবসাদ যেন হৃদয়বৃত্তিকে অবসন্ন করে অসাড় করে দিল। কিন্তু এই হৃদয়েই রসচেতনার আশ্রয় সেই চৈত্যপুরুষের বাস। তিনিই জীবনের মধুদ পুরুষ, মধুভোজী আত্মা। হৃদয়ের মণিকোঠায় একান্ত

অস্তিকে বসে তিনিই মিষ্ট তিক্ত কষায় সব কিছু রস পান করে চলেছেন—'স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি'। তাঁর সম্বন্ধে বেদ বলেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

এই স্বাদু পিপ্পলাদ হলেন চৈত্যপুরুষ, আর অপর কূটস্থ চিদাত্মা—অনশ্নন্ অভিচাকশীতি, তিনি দ্রষ্টা কিন্তু ভোগ করেন না। দুটিকেই সদাযুক্ত একজোড়া সুপর্ণ বলা হয়েছে, তারা একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে। তাই জীবনের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ যা-কিছু ভোগ, তা সবই চৈত্যপুরুষের অন্ন। ভালবাসা চৈত্যপুরুষের ধর্ম, কিন্তু সে ভালবাসার ভোগের মধ্যে কূটস্থ আত্মা জেগে থাকেন। তাই ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

গীতা বলেছেন ভাবসংশুদ্ধি চাই। আবার বলেছেন "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে"। প্রজ্ঞাধৌত নির্বিকার চিত্তেই বিশুদ্ধরস সঞ্চারিত হয়। তাতে প্রজ্ঞাবান পুরুষ আত্মারাম আনন্দঘন, আর তাঁর আনন্দের বিলাস প্রকৃতিতে উচ্ছলিত, যাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বলেন রস ও রতি। এইভাবে জ্ঞানাত্মা চৈত্যপুরুষের আনন্দঘন ভাবের উচ্ছলনে (ecstasy), সাধকের আত্মদানের অভীপ্সার বিগলিত হয়ে উজিয়ে ওঠে। এই হল তাঁকে পাবার প্রশান্ত ব্যাকুলতা। আর তাতেই অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান প্রবেশ-পথটি উন্মুক্ত হল। এর অভিব্যক্তি প্রতিটি সাধকের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনের ও সাধনের অধিকাংশ বৃত্তিই হল এই শুদ্ধ ভালবাসা। একেই বলে ভগবানের প্রতি আসক্তি, যাকে মরমিয়া বলেছেন "লগ রহ ভাই।" এই প্রেমের যোগটি চাই-ই। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন মায়ের ভালবাসা; বলা যায় মা-ই (SHE) ভালবাসা (LOVE)—পরম পুরুষের হৃদয়। পিতা উচ্চে সমাসীন, নির্বিকার দ্রষ্টা আর কর্মরতা মা যে আমার সঙ্গেই। তাঁর কাছে যাই আপীল করি, তিনি শুনবেন। তাই তার প্রতি জন্মগত সহজ আসক্তি

নিয়েই আমাদের সাধনা শুরু হয়। কিন্তু ভাবের জগতে বে-সামাল হওয়ার কথা আগেই হয়েছে। শুদ্ধ বিচারণাকে অনেক সময় কুতর্ক দিয়ে নস্যাৎ করা হয়ে থাকে, মনের এই এক দুর্গুণ যেমন আছে, তেমনি বুভুক্ষু প্রাণের কেন্দ্র এই হৃদয়ে অবর প্রাণ এসে হানা দেয়; কেবল খাই খাই চাই চাই তার রব। কোনদিই সে প্রাণবাসনার তর্পণ শেষ হয় না, তার শান্তি কোন সময়েই নেই। এ জন্য ভগবানকে চাওয়ারূপ পবিত্র ভালবাসার মধ্যেও ভেজাল এসে পড়ে। তাই ভগবানকে আমার মত করে চেয়ে যে ভালবাসতে চাই, তা যদি প্রজ্ঞা দ্বারা বিধৃত না হয়, তাতে অশুদ্ধি এসে পড়ে। প্রাণের অবর লোকেই (lower vital) কামাত্মার অধিকার। সেজন্য শুদ্ধ না হলে সে ভালবাসার হোমশিখা উর্ধ্বমুখী হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। চৈত্য-পুরুষকে আবৃত করে কামপুরুষের ছায়া অপদেবতার মত ভর করে থাকে। সেই বিকৃত রস সর্বতোভাবে বর্জন করা চাই, না হলে চৈত্যপুরুষের অধিকারে শুদ্ধ রসবিলাস চলতে পারবে না।

তাহলে শুদ্ধ ভাবে চৈত্যপুরুষের ভালবাসা কেমন করে বুঝতে পারব? সাধনার সময় গোড়ায় জীবাত্মা ও কামাত্মা পাশাপাশিই চলতে থাকে, পরস্পরের ছায়া সংস্পর্শ হচ্ছে, এটা বোধে আসে। যখন অনুরাগ আসে, প্রাণ কেঁদে ওঠে তখন দেখতে হয় কিসের এই কান্না। যদি অনেক-কিছুর অভাবে সে কান্না আসে, তাহলে সেটা হবে কামপুরুষের কান্না। তাকে সাধনজীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। অন্তরের গভীরে মধ্বদ পিপ্পলাদ চৈত্যপুরুষ, হাসি-কান্নায় তিনিই রসভুক্। কাজেই তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, ভালবাসা। উন্মুখ হয়ে তাঁকেই চাইতে হবে, বাহিরের কোন বিষয় নয়। ভগবানকে চাইতে গেলে গভীরের সেই আকূতি চাই, lust for life বা কামপুরুষের যে ভালবাসা, তা নয়। পরমহংসদেব বলতেন তিন-টান এক হলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়—পতির প্রতি

সতীর টান, সন্তানের প্রতি মায়ের টান, আর বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর টান। বিষয়বিষবিকারে চিত্ত মলিন ও অধোমুখী হয়। এটা জেনে ও বুঝে নিয়ে সেই উর্ধ্বগামী আকর্ষণকে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হতে দিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ ,এই কারণেই চৈত্যপুরুষকে সম্মুখে আনার কথা বারবার বলেছেন। চৈত্য-পুরুষের স্বভাবই হল তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমে উন্মুখ; সবের মধ্যে ও সবার মধ্যে তিনি রস যুগিয়ে চলেন। সেই লক্ষণ দিয়ে তাঁকে চিনে নিতে হবে। তাই ভগবানের প্রতি আকর্ষণ এলে পরে, স্বামী স্ত্রী মাতা পিতা সন্তান, এই সব সম্পর্কের মধ্যে বহির্জীবনের যে সঙ্গ, তাতে যেন আর রস পাওয়া যায় না; প্রাণ অতৃপ্ত হয়ে কেঁদে ওঠে। বোধ করি এই ভাবের দৃষ্টান্ত দেখাতেই মহাপ্রভু ভ্রষ্টা মেয়ের উপপতিসঙ্গের কামনার সংবেগটি ধরতে শিখিয়েছিলেন। গৃহকর্মে ব্যাপৃত রয়েছে তার সর্বেন্দ্রিয়, কিন্তু মন পড়ে আছে অভিসারের দিকে। এই তীব্র আকুলতায় তাঁর সঙ্গে নিতুই নব সঙ্গ-রসায়নে চিত্ত আপ্লুত হয়ে আছে। এই ভাবটি জাগিয়ে রাখলে বাহিরে সংসারের বিরহের মধ্যে, অন্তরে তাঁর সঙ্গে নিত্য মিলনটি ঘটতে থাকে। কেননা সেই ভালবাসার ব্যাকুলতা ও আবেশ, তা তো তিনিই। তিনিই তো অন্তর্যামী ঈশ্বর হয়ে আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে জড়িয়ে ধরে আছেন, এই ভাব দৃঢ় হলে বাহিরের কর্মে ও ভাবে সব কিছুই শেষ পর্যন্ত সরস হয়ে উঠবে। চৈত্যপুরুষকে জাগানোর প্রধান লক্ষণও তাইতে ধরা যায়; তখন সবই ভাল লাগে, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

প্রজ্ঞা ও প্রেম এই দুই দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে যে চৈত্যপুরুষ জাগ্রত হলে এক দিকে মন ও বুদ্ধি আর অপর দিকে হৃদয়, এই দুই কেন্দ্রেই শক্তি সমৃদ্ধ হতে থাকে। বুদ্ধি দিয়ে যার কূলকিনারা পাই না, প্রাণ তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করে এও যেমন সত্য, তেমনি হৃদয়ের উত্তালতাকে বুদ্ধি যদি সামলাতে না পারে, তাতেও বিক্ষোভ এসে বাধার সৃষ্টি করে—এও ঠিক। তাই

জ্ঞানের পথে রসবর্জন করতে গিয়ে জীবন থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লে, সাধনপথেও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। যে পর্যন্ত না সত্যের সাক্ষাৎকার হচ্ছে, ততক্ষণ সে ত্রুটি থাকবেই। সাধনায় সামঞ্জস্য রেখে চলতে গেলে তাই প্রথম প্রয়োজনীয় কর্ম হল বুদ্ধির শুদ্ধির সঙ্গে ভাবেরও শোধন। ভাব শুদ্ধ হলে প্রেমও সহজ হবে। রসের পথকে বলা হয় পিছল; কেননা রসচেতনায় প্রাণের সঙ্গে যুক্ত থাকেন হ্লাদিনী শক্তি স্বয়ং। তিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী। প্রাণের ভালবাসার উৎকর্ষ তাঁকেই অবলম্বন করে, এবং ভালবাসার গতিও সেই পরম লক্ষ্যে। তাই ভালবাসা বা ভাবাবেগ যখন ভাসিয়ে নিতে চায়, তখন দেখতে হয় সেটা খাঁটি কি না।

যদি দেখা যায় মানুষ কাকে ভালবাসে কাকে চায়, তাহলে প্রথমে দেখতে পাই যে এক আত্মরতিতেই সে মজে আছে। ছোট শিশু একটি যেন আনন্দের জীবন্ত প্রতিমা। তাকে ঘিরে সকলে আনন্দ পায়। সেও এতই আত্মকেন্দ্রিক যে, নিজের আনন্দ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। এই ভাবে ভালবাসার শৈশব পর্ব কেটে চলে এক উর্ধ্বায়ন—উৎকর্ষের দিকে। তখন দেখা যায়, অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হচ্ছে ভালবাসার ব্যাপারে। সেজন্য এ পথে চাই হৃদয়ের প্রসার। অপরের সঙ্গে ভালবাসায় মিলতে হয় হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে; হৃদয়ের এই ব্যাপ্তিতে প্রেমে ত্যাগ সহজ হয়, আর তাতেই প্রেম মধুর হয়ে ওঠে। পরিবারের ভিতর থেকেই এই ত্যাগের শিক্ষা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা থেকে সমাজের জন্য ও বৃহত্তর পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের জন্য, ভালবেসেই ত্যাগের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়। হৃদয়ের সব গ্রন্থিগুলি খুলে বৃহৎ হতে না পারলে প্রেমে ত্যাগ করাও সহজ হয় না। শেষ পর্যন্ত প্রেমে চিত্তের প্রসার ও জ্ঞানে চিত্তের ব্যাপ্তি একই কথা হয়ে দাঁড়ায়। তাই জ্ঞানে চিত্তের শুদ্ধির সঙ্গে প্রেমেও চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে কিনা বুঝতে আমরা পতঞ্জলির যোগভূমির চিত্তবৃত্তিগুলি দিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

মূঢ় ভূমিতে চিত্তের ভালবাসা তামসিক, তাই দেহ ও দেহের সব বৃত্তির মূলে। পশুর ভালবাসা, যান্ত্রিক কামাবেগ, সব এই পর্যায়ে পড়ে। জ্ঞানীরা তাকে ভালবাসা বলবেন না, সেটা শুধুই ভারের মত চেপে বসে। ক্ষিপ্ত ভূমির ভালবাসায় আলো আসে, কিন্তু চিত্ত তখনও স্বচ্ছ হয় না। রস-চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিন্তু স্থৈর্য বা ধৃতি নেই। তাতে এক বিহ্বলতা ও আবেশ আছে এবং শিল্পের সৌন্দর্যবোধও সেখানে দেখা দেয় কিন্তু তা গভীরে যেতে পারে না। এই রাজসিক ভালবাসার বৃত্তিই মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসে। এরপর বিক্ষিপ্ত ভূমিতে চিত্তবৃত্তি অনেকটা গুছিয়ে আসে; সেখানে সাত্ত্বিক ভালবাসা স্ফুরিত হলে চিত্তে এক আদর্শবোধ দেখা দেয়। সমাজ-জীবনে ভালবাসার আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের মহিমা এই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ ভূমির ত্রুটি হল এই যে, এই ভালবাসার বিশুদ্ধি জীবনে ও সংসারে স্থায়ী করা যায় না। নীচের টানে মূঢ়তা ও অস্থিরতা এমন ভাবে সে সাত্ত্বিক ভালবাসাকে পেয়ে বসে যে, তা শুদ্ধ থাকতে পারে না। কেননা মূঢ় ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ভূমিতে অযোগী-চিত্তের প্রাকৃত ভালবাসা। একাগ্র ভূমিতে গেলে এই ভালবাসা লোক থেকে লোকোত্তরের দিকে যাবার প্রবণতা পেয়ে যায়। একাগ্র ভূমিতে ভালবাসাকে নাম দিতে পারি চৈত্য (Psychic) ভালবাসা। তখন তাকে আমরা বলি ভক্তি, প্রেম, প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি যদি নিরুদ্ধ ভূমিতে তুলে স্থায়ী করতে পারা যায়, তবেই পরমপুরুষের ভালবাসার স্বরূপটি বোঝা যেতে পারে। জ্ঞানের সাধনায় চরম জ্ঞানে যিনি একা একল, প্রেমের স্পন্দনে তাঁকেই দুইকোটি হতে হয়। সেই একই যেন দ্বিধাবিভক্ত; সাধকের এই একের জ্ঞান হয় একরসে, দুই হয়েও সেই এক। আবার এক থেকেও এক দ্বৈতাভাস; তাকে ভেদও বলা যায় না আবার অভেদ বললেও সবটা বলা হল না, মনে হয়। তাই সেই প্রেমরসের স্বরূপকে বলা হয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদ।

মূঢ় দেহাশ্রিত ভালাবাসাই প্রজননের কর্ম করে চলেছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেই কামলীলাই রিরংসারূপে বয়ে চলেছে। কোথা থেকে তার অন্ধ প্রবেগ, সেটা বলা যায় না। এক creative urge পিছন থেকে আকর্ষণ করে পশু মানব সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। তারও এক রস ও সৌন্দর্য আছে, যা মাদক-রসের সৃষ্টি করে। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ভূমি পর্যন্ত এই ধূমাচ্ছন্ন মলিন রসেই প্রাণ ও মন জেগে তাকে আলোকিত ও কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। তখন যে আদর্শবোধ দেখা দেয়, তা গার্হস্থ্য জীবনের সংযত পুরুষে ও সতী স্ত্রীতে দেখা যায়। কিন্তু ওই আকর্ষণে গভীর থেকে এলেও আত্মসচেতনতা না থাকলে এর অন্ধ প্রবেগ ভাসিয়ে নিয়ে আদর্শ থেকে চ্যুত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যে ও সাহিত্যে এই মাদক-রসই উপজীব্য। তাই ভালবাসায় পরীক্ষায় দেহকে ছাপিয়ে প্রাণময় ও মনোময় হয়ে তা যখন একাগ্র ভূমিতে যেতে পারে, তখনই যোগশক্তি তাতে সচেতনভাবে যুক্ত হয়। তা থেকে ভালবাসায় আদর্শবোধ আবার দেহ ও প্রাণেও সংক্রামিত হয়। চিত্ত একাগ্র হবে, না হলে তাঁর বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ রূপ সে রসে স্থিত হতে পারবে না। একাগ্রতায় তল্লীন হয়ে চিত্ত পরিণামে নিরুদ্ধ হয়ে যাবে।

এদেশে ওই একাগ্র ভূমির ভালবাসাতেই সতী নারীর চিত্তে "পতি পরম গুরু" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল। পুরুষের রাশ খোলা থাকা সত্বেও এদেশের নারীচিত্তের প্রবল সংস্কার ছিল যে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেবতাতেই আত্মনিবেদন। ভগবানকে হৃদয় দিলে সে ভালবাসা হয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ভক্তিপথের সাধনায় ও রসশাস্ত্রে আমরা এই ভালবাসার পরিচয় পেয়ে থাকি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটা ত্রুটি সেখানে থেকে যেতে পারে। প্রেমের গভীরতা ও তুঙ্গতা দিয়ে নিজ দেবতাতে একান্তী হয়েও অন্যমতের সঙ্গে সংঘর্ষ এসে পড়তে পারে। তাতে সংসারের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে বিরোধটাই প্রবল হয়ে ওঠে। এই কারণে একাগ্র ভূমিতে উঠেও চিত্তের প্রেম ঠিক পূর্ণভাবে মুক্তি

পায় না। হৃদয়ের প্রসার ও ব্যপ্তিবোধ নাও আসতে পারে। ইষ্ট-গোষ্ঠী ধর্মসংঘ এসব করেও সেখানে যেন আটকে যেতে হল, এমনও হয়। অথচ শুদ্ধচিত্তের এই প্রেম খাঁটি বস্তু। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেক ধর্মসংঘের মধ্যে, বিভেদটাই স্পষ্ট হতে দেখেছি। পরস্পরের মধ্যে ভাবের মিলনটি যেন সংঘটিত হতে পারেনি। মতান্তরের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার তো কোন কারণ নেই। তাই মনে হয়, সে ক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে পূর্ণ মিলনটি হয়নি। অথচ প্রত্যেকেই নিজমতের প্রতি একনিষ্ঠ।

এরই প্রতিক্রিয়ায় বোধকরি এ দেশেও এক ভাবের ঢেউ এসে পড়ে যে, মানুষকে ভালবেসে মানুষের হিতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই শ্রেয়। সেই শ্রেয়ের পথে ভগবানকে বাদ দিলেও বুঝি কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সে ভাবে প্রেমের সার্থকতা হয় না, কাজেই সে সেবাকর্মও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আবার সকলের ভাল করতে গিয়ে নিজের অহং এমনভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে পারে যে, নীতিবোধের দোহাই দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তে হয়। অধুনা রাজনীতির ক্ষেত্রে ত্যাগী নেতাদের পর্যন্ত কি করুণ পরিণতিই না লক্ষ্য করা যায়। তাই ভগবান স্বয়ং যেভাবে ভালবাসেন, তাঁর হৃদয় ধ্যান করে তাতে মিলিত হয়ে নিজেকে একেবারে গলিয়ে দিয়ে যদি ভালবাসাই হয়ে যেতে পারি, তখন নিজের মধ্যেই তাঁর সেই মাধ্বীধারাটির উৎস খুলে যেতে দেখব। তাই বলা হয়েছে একাগ্র ভূমির প্রেম নিয়ে উজানে গিয়ে নিরুদ্ধ ভূমির প্রেমরসে নিজকে হারিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে। একাগ্রতার ফলে বহুমুখী চিত্তবৃত্তি-গুলিই গভীরে প্রবেশ করে নাস্তিবৎ এক শূন্যতায় প্রেমসমাধিতে মগ্ন হয়ে যায়। এই ভাবেই পরমপুরুষের বুকে প্রকৃতি আত্মহারা হয়ে ঢলে পড়ে ; যেমন করে কালিদাসের চিত্রে তপস্বিনী উমার প্রেমকে দেখানো হয়েছে। আবার উমাই শিবের হৃদয়, শিবের ভালবাসা। আত্মারামের মহাশূন্য আকাশ-হৃদয় তো প্রকৃতির প্রেমেই আত্মহারা—সে এক মহাসমাধিমগ্ন মৌন অথচ প্রেমনিবিড়

অদ্ভুত স্বলসিত রস। এই পরমপুরুষ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই বিশ্বজগৎকে আকর্ষণ করেন প্রেমের শক্তিতে। কৃষ্ণের আকর্ষণে তাই গোপীচিত্ত উতলা হয়ে ছুটে আসে, তাঁর প্রেমে আত্মনিবেদন না করে সে পারে না। কেননা আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ সেই ভালবাসাই তো গোপীকে সম্মুখে এনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরই পরমা প্রকৃতি রাধা। এই ভাবে পুরুষের প্রেমকে যেন আত্মারাম করে দেখনো হয়েছে—তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ থাকেন প্রেমে, আর প্রকৃতি তাঁর প্রেমেই তাঁর দিকে ছুটে চলেছে। তাই তাঁরই প্রেমের আকর্ষণে তাঁর দিকে যে উজানে চলা—সেই ভাবকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন চৈত্য ভালবাসা (Psychic love)।

এই চৈত্যভালবাসা অতুলন, কিন্তু তাই বলে প্রকৃতিকে এখানে যেন ছোট মনে করা না হয়। পরমপুরুষের হৃত্সমুদ্রে নিঃশেষ আত্মসমর্পণে সেই ভালবাসাই অদ্বৈতনিবিড় প্রেমরসে গলে একাকার হয়ে যাবে। আর সে পর্যন্ত না যেতে পারলে প্রেমের ক্ষেত্রেও যেন বুদ্ধিগত থেকে যায়। চৈত্যপুরুষের প্রেম বা চৈত্য ভালবাসা বুঝতে, গেলে ডুবতে হবে অকূল সেই তত্ত্বে। প্রেমকে সমুদ্রের সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো হয় তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। বেদে ও উপনিষদে এই প্রেমের তত্ত্বটি বিভিন্ন ভাবে উপস্থিত থাকলেও শ্রীঅরবিন্দদর্শনেই প্রথম এই আলোর মাধ্বীধারাটির এক পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের হৃদয়ে ভগবানের আবেশে তাঁরই একটি স্ফুলিঙ্গ চিৎ-কণরূপে অধিষ্ঠিত, আর সেই বিন্দুটিকে বেষ্টন করে এক জ্যোতির্ময় নীহারিকা ছন্দায়িত হয়ে চলেছে—এই হল চৈত্যপুরুষ। ছোট্ট একটি পুরুষসত্তা যিনি দেহাস্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন, তাঁকেই কঠোপনিষদ বলেছেন "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা"। তিনিই হলেন জীবের ভূতভব্যের ঈশান। এতদিন যা ছিলাম, যা হয়েছি ও যা হতে চলেছি, সব তাঁরই ঈশনায়। শ্রীঅরবিন্দ এঁকে soul বলেও উল্লেখ করেছেন। জীবন-রসের এই রসিক পুরুষটিই সরস বিরস সব রকমের অঘটন ঘটিয়ে

রসাস্বাদান করে থাকেন। চিত্তে যখন হাসি-কান্না সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু, এইরকম যুগ্মরসের দোলায় সমান রস উচ্ছলিত হতে দেখব, তখনই বুঝতে হবে চৈত্যপুরুষ সম্মুখে। কবির ভাষায় "দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে," তাঁকেই বলা হয়েছে। সুখের আবেশে রসিয়ে উঠি, এটা বুঝে দেখা সহজ ; কিন্তু ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁর হাসিমুখটি দেখে তাঁকে চিনে নিতে হয়। বৈষ্ণব কবি বলেছেন "কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।" তাঁর ভালবাসায় এই ঘর্ষণের বেদনাও রূপান্তরিত হয় আনন্দে, রসে।

শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় এই প্রাকৃত জীবনেই স্বাভাবিকভাবে চৈত্যপুরুষ সামনে আসেন, তা আমরা জেনেছি। তখন জীবন যেন সুন্দর একটি স্বপ্নে লঘু হয়ে ভেসে চলে। কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে হয় না। চেতনায় মালিন্য এলেও ধূলি ঝেড়ে ফেলার মত সহজেই তা থেকে মুক্ত থাকা যায়। জীবনে প্রেমের ফুল সহজেই ফুটে উঠতে পারে ; আর আদর্শের প্রতি অনুরাগ, বীর পূজা (hero-worship), এই রকম বিভিন্ন রূপে সেই চৈত্যসত্ত্বকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কৈশোরের সরল বিশ্বাসে, বুদ্ধিতেও প্রতিভার ছাপ বিকশিত হতে দেখা যায়। তাকে যদি দেহ প্রাণ মনের অশুদ্ধি থেকে মুক্ত রাখা যায়, তবেই সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার শক্তি অর্জন করে মেধাবী হওয়া যায়। ষোল বৎসর বয়সকে অধ্যাত্মজীবনে গভীর তাৎপর্য পূর্ণ বলা হয়েছে। উপনিষদের সৌম্য পুরুষ ষোড়শকল। তন্ত্রের শক্তি নিত্যা ষোড়শী। চন্দ্রের কলার ক্ষয় ও বৃদ্ধি পঞ্চদশ কলায়, তারই অক্ষয় সৌন্দর্য ও মধুর রূপটি আধ্যাত্মিক ভাবনায় ষোড়শ কলায় নিত্যপূর্ণ। কৈশোরের আনন্দময় চেতনাকে জীবনে যদি ষোড়শ কলায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত করেই সম্মুখে রাখা যেতে পারত, দিব্যজীবনও তাহলে সহজে লাভ করা যেত। কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতার

জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করে আমরা সেই স্বপ্নের সৌরভ ও আবেগের দীপ্তি জীবনে হারিয়ে ফেলি। বিষয়-বিষ বিকারে চিত্ত মলিন ও বিকৃত হয়ে পড়ে— এই হল জীবনের অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পতিতা" কবিতায় পতিতার কণ্ঠে এই নিষ্ঠুর সত্যটি শুনিয়েছেন, "নগরের ধূলি লেগেছে নয়নে, আমারে কি তুমি দেখিতে পার ?"

শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবে চেতনার স্তরবিন্যাস করেছেন, তাতে চৈত্য-সত্তার স্থান মনের আগে প্রাণের পরেই। সৎ চিৎ আনন্দ অতিমানস (বিজ্ঞান) ঊর্ধ্বলোকের স্তরে, যাকে বলা হয় পরার্ধ। আর অপরার্ধে দেহ প্রাণ চৈত্য ও মন, এইভাবে স্তরগুলি বিন্যস্ত রয়েছে। আনন্দলোকের রসচেতনাই অবর লোকের চৈত্যসত্তায় প্রতিফলিত। আনন্দধামে আনন্দময় পুরুষ ও চৈত্যপুরুষ যেন মুখোমুখি হয়ে আছেন। দেহ প্রাণ ও মন তিনই মলিন হয়ে যায়, তাদের পরিশুদ্ধ করলে চৈত্যপুরুষ সম্মুখেই থেকে যান। বুদ্ধির শুদ্ধি ও রসসংশুদ্ধির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। প্রাণের শুদ্ধির জন্য প্রাণের উত্তালতাকে সংহত করতে হয়। কাচের চিমনি পরিয়ে যেমন অগ্নিশিখাকে শোভন ও স্নদীপ্ত করে জ্বালাতে হয়, তেমনি করে প্রাণের এই উত্তালতাকে স্বচ্ছ নির্মল আলোর আবরণে রক্ষা করে একমুখী ঊর্ধ্বশিখ করতে হবে। এই ভাবে প্রাণাগ্নির প্রজ্বলন শুদ্ধপ্রাণের লক্ষণ। এই অধূমক জ্যোতি প্রাণস্পন্দেরই, কিন্তু তাতে কামহত বাসনার উত্তালতার মালিন্য নেই। ইন্দ্রিয়শক্তিকে এইরকম করে মূল প্রাণশক্তির প্রশাসনে আনতে পারলে, চিত্ত আর বানচাল হতে পারে না।

পরিশেষে দেহের শুদ্ধির কথাও এ প্রসঙ্গে তুলতে হয়। দেহের জড়ত্ব এক ভারের মত যোগবিঘ্ন ঘটিয়ে চৈত্যপুরুষকে আড়াল করতে পারে। আলস্য প্রমাদ এই সব বৃত্তিগুলি তমোগুণ থেকে উদ্ভূত ; এই জড়ত্বকে যথাসম্ভব লঘু করতে হবে। আহার-শুদ্ধি তার এক প্রধান উপায়। উপনিষদ বলেছেন,

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"....ইত্যাদি। এর অর্থ হল, আহারের শুদ্ধি থেকে সত্ত্বশুদ্ধি হতে থাকে, আর সত্ত্বশুদ্ধির ফলে ধ্রুবাস্মৃতি লাভ করা যায়। তখন আর জড়ের বাঁধন বেঁধে রাখতে পারে না। অবশ্যই এ আহার শুধু দেহের অন্ন বোঝাচ্ছে না। প্রাণের ও মনের অন্নকেও শুদ্ধ করে আহরণ করতে হয়। আহার সংযমনের গুরুত্ব সম্বন্ধে গীতাও বলেছেন "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু···।" আহার বিহার কর্ম চেষ্টা নিদ্রা জাগরণ সবই যোগযুক্ত করতে হবে। Mother বলেছেন, আদর্শ দেহ হবে শিশুর দেহের মত, তেমনি সহজ স্বচ্ছ নমনীয় ও আনন্দময়। তাতে দেহের সঙ্গে প্রাণের ও মনের বিরোধ ঘুচে যাবে ও তারা চৈত্যপুরুষকে আর আবৃত করে রাখতে পারবে না। এই হল দেহশুদ্ধির ফল। তাহলে চৈত্যপুরুষকে জাগ্রত দিশারী করতে হলে চাই—শিশুর সুস্থ সুগঠিত দেহ, কিশোরের উদ্দীপ্ত প্রাণশক্তি ও তরুণের প্রদীপ্ত মন।

একাগ্রতার সাধন করতে বলা হয় হৃদয়ে, হৃদিস্থিত চৈত্যপুরুষ গহ্বরেষ্ঠ হয়ে হৃদয়পুরে শয়ান; তাঁকে জাগাতে হলে ঐকান্তিক একাগ্র হয়ে চেতনাকে সংহত করা চাই। কিন্তু প্রাণের ও মনের অবর স্তর-বিন্যাসে বা কামনাবাসনার বিক্ষোভের মধ্যে ডুবে একাগ্র হলে চৈত্যপুরুষকে বোঝা যাবে না। এ একাগ্রতা যোগভূমির, কাজেই দেহ প্রাণ মন অতিক্রম করে বিজ্ঞানেই সে শক্তি নিহিত, এই বিচারটি সাধনার সময়ে থাকা আবশ্যক। তাই প্রজ্ঞার কর্মের সাধনায় ও পূর্বে ঈশ্বরভাবনায় অনন্ত বিরাট জ্যোতিঃসত্তার ধ্যানের যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সচ্চিদানন্দসমুদ্রে মীনের মত বিচরণ করা—এই ভূমির একাগ্রতার অনুশীলনটি সর্বদাই ধরে থাকা চাই। সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ ব্রহ্ম—এই ভূমি থেকে কোন কারণেই একাগ্রতা স্খলিত হতে না পারে, এই হল ভূমির একাগ্রতার সাধন। সেই অনন্ত আকাশ আনন্দ হয়ে সর্বতোভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন, আলোর মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল তাঁর

প্রকাশ। তাঁর সেই সুখস্পর্শে আমার অহং-এর অন্তরালে গোপীচিত্ত ব্যাপ্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সেই তাঁর নীলাকাশের আনন্ত্যে সাঁতার কেটে চলেছে আমার মন। একাগ্রতার সাধন এইভাবে করলে উপলব্ধি করতে পারব, তিনিই অপিধান ও উপস্তরণ হয়ে আমার ওই গোপীচিত্তের আকৃতি-বিন্দুটিকে মুক্তার মত ধারণ করে আছেন। সেই প্রেমের আলোয় দেহ প্রাণ মন শুদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এইভাবের ঐকান্তিক একাগ্রতা ও ভূমির একাগ্রতা একসঙ্গে সহজে সিদ্ধ হতে পারে না। এজন্য দুদিক থেকেই সহযোগিতা চাই। সাধকের দিক থেকে থাকা চাই অভীপ্সা—যাতে অনন্ত বিরহের ভারে চিত্ত জারিত হয়ে থাকে; আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রসাদ—ব্রহ্মসংস্পর্শ। "দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচেনা", এই রকম ব্যাকুলতা তীব্র না হলে, চৈত্যপুরুষ অগ্রসর হয়ে আসেননি বুঝতে হবে। পরিবার দেশ মানবসমাজ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আসক্তি চলে গিয়ে, সর্বহারা অন্তরাত্মার আকুলতা উদ্বেল হয়ে বলে, "শুধু তোমাকেই চাই।" এই ভক্তির বীর্য না আসা পর্যন্ত বুঝতে হবে ভগবৎ-তৃষ্ণা ঠিক মত পুষ্ট হয়নি। সেই বিরহের আগুনে চিত্ত গৈরিক হয়ে অনন্তে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তখন জীবে সেবা করেও ঈশ্বরসেবার মাধুরী ও তৃপ্তি মেলে না। শূন্য চিত্ত পূর্ণ হয় প্রেমে, তাঁরই প্রসাদে। আর সেই সিদ্ধির পরে আসে ঈশ্বর হয়ে জীবের সেবা। তখনই প্রেমের কর্মে সেবার মাধুর্যে আত্মা প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

আমরা চৈত্যপুরুষকে চিনতে গিয়ে প্রকৃতির সাধনাকে গোপীচিত্ত বা নারীর হৃদয় দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। বাগদত্তা কিশোরী একটি মেয়ে, সে জানে সে তাঁরই কাছে নিবেদিতা। তাই সে অন্য কারও দিকে ফিরতে পারে না; কোথাও তার চিত্ত বাঁধা পড়ে না। বিবাহের পর তার হল গোত্রান্তর, সে অকূলে ভাসল, একূলে আর ফিরতেই পারে না। পরম পতিকে

দেখে কূল ছেড়ে কুলবতী স্রোতাপন্ন হয়ে ভেসেই চলে, তার সঙ্গে মিলনের জন্যই যা কিছু কর্ম। জগতের অন্য কোন সমস্যার দায় তার নেই, সে তাঁর লীলাবাসরে প্রেমে নিমজ্জিত। আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রে ও রসাশ্রিত সাধনায় এই প্রেমভক্তির সৌন্দর্য অতুলনীয়; সারদোৎফুল্ল মল্লিকার মতই শুভ্র সমুজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ করে তাকে মহাজনেরা কাব্যরসেও পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু এই রসের সাধনাতেই বহুক্ষেত্রে, অসংস্কৃত চিত্তের মত্ততাও বড় বেশি এসে পড়েছে। তাতে ওই উজ্জ্বলরসবর্ত্মটিতে অনেক গহন গভীর গহ্বর সব মুখব্যাদান করে আছে, দেখা গেছে। মহাজনেরা সাধকদের রসোল্লাস নিয়ে প্রমত্ত ও অস্থির না হওয়ার জন্য বহু সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, তাঁদের জীবন-বেদে তার দৃষ্টান্তও দেখিয়ে গেছেন। প্রেমের ধর্ম তো শুধুই রসোল্লাস নয়, তা যে কর্মে সেবার মাধুরী হয়েও পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে। তাই ওই কিশোরী মেয়েটিকে দেখি, সে-ই যেন দিনে ঈশ্বরী আর রাতে অপ্সরী। এইভাবে রাত্রির কাব্য ও দিনের কাব্য দুভাবেই ওই কবিপ্রিয়াকে দেখতে পারি। এই মেয়ে যখন জননী, তখন তার হল রূপান্তর। পুরুষের বীর্যে ঈশানী মা আমার তখন ভাবয়িত্রী। এমনি করে সবার জন্য তখন আবার প্রাণ খুলে যাবে প্রেমে; আর রূপান্তরিত চেতনায় ধরণীর বুকভরা ভালবাসা নিয়ে দশভুজার মত কাজ করে চলে যে ওই কিশোরী মেয়েটিই। এইভাবে চৈত্য রূপান্তরকে (Psychicisation) নারী-চিত্ত দিয়ে দেখান হল। দু' ভাবেই একে দেখতে পারি, আবার একের মধ্যেই প্রকৃতি-পুরুষ ভাগ করেও দুভাবে দেখা যায়। যে ভাবেই হোক, চৈত্য ভালবাসাকে যেমন তুলে নিতে হয় চিন্ময় ভালবাসায়—সব কিছুর উর্ধ্বে, আবার সেই ভালবাসার পরমা শক্তিকেই নামিয়ে এনে কর্মযোগ প্রযুক্ত করতে হবে, আর তবেই কর্ম দিব্য হয়ে উঠবে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে প্রকৃতিকে অপর পরা ও পরমা এই ক্রমে চিনিয়েছেন।

সবই তাঁর স্বীয়া প্রকৃতির বিভঙ্গ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চিরকৈশোর লীলা—একদিকে যেমন দিনের আলোয় সখাদের সঙ্গে গোচারণ, অপরদিকে জ্যোৎস্না রাত্রে সখিদের সঙ্গে রাসের মিলন। কালের রাখাল তিনি আমাদের গোপাল। আমাদের প্রাণ হল পশু—পশবঃ বৈ প্রাণাঃ। সেই পশুপ্রাণ আলোর পিপাসী হলেই হয় গো। সকালে গোষ্ঠের আগড় খুলে সেই গোযূথ নিয়ে তিনি রাখাল হয়ে চলেন, আবার সন্ধ্যায় তাদের গোষ্ঠে ফিরিয়ে আনেন। এই রকম করেই প্রাণগোপাল গো-চালনা করেন। এই প্রাণেরই উন্নততর চেতনায় অর্জুন তাঁর সখা, আর তিনি তার সারথি। কুরুক্ষেত্রের প্রকৃতি যাজ্ঞসেনী তাঁর সখী, সে সখ্যও অপূর্ব। রামকৃষ্ণদেব বলতেন বার বছরের বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ের মত হতে চান। কি সেই বাল-বিধবার আভিজাত্য! তার ভালবাসার কৌলীন্য থেকে তাকে কেউ টলাতে পারে না। সেই রকম সখীর ভালবাসা বীর্যবতী হলে পাই যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে। তিনিই মহাভারতের মহাসমরের নায়িকা, নেপথ্যে ওই যুদ্ধের পরিচালিকা। সেখানে যুদ্ধ করছেন অর্জুন-কৃষ্ণ, যুদ্ধের সারথি বাসুদেব কৃষ্ণ আর যুদ্ধের কারণ যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা। দিনের প্রখর আলোয় প্রকৃতিকে যেমন সখ্যরসে এই যুদ্ধের চিত্রে দেখা গেল, সেই রকম রসচেতনা নিবিড় হলে আবার পাই বৃন্দাবনের কিশোর কিশোরীকে। এ.সবই চৈত্যপুরুষের (psychic being) লীলা। তিনি দেহপুরে জাগ্রত হলে এই ভাবেই লীলারসে ও কর্মের বীর্যে স্ফুরিত হয়ে চলেন। মূলে সেই পুরুষোত্তম—তিনিই নারীচিত্ত পুরুষচিত্ত দুয়েরই নায়ক ও ধারক। এই দুইকে অবলম্বন করেই চৈত্য ভালবাসা (psychic love)। সে ভালবাসায় দুই-ই এক; দুই-এ মিলে এক; দুই-এর প্রত্যেক এক হয়েও দুই মিলে লীলারস আস্বাদন করে পুষ্ট করেন।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাবে আমরা একই তত্ত্বকে জ্ঞান ও প্রেম দুই ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছি। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয় এই দুই প্রধান বৃত্তি

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সব কিছু জেনে সব ছাপিয়ে লোকোত্তরে হারিয়ে যাওয়াকে জ্ঞানের চরম ভূমি বলে জেনেছি। সেই লোকোত্তরের সর্বনাশা জ্ঞান যেমন রয়েছে অধিষ্ঠান হয়ে, তেমনি তাকেই আবার নেমে আসতে হয়েছে সৃষ্টিতে অণুরও অণিয়ান, মহতেরও মহীয়ান সব কিছু প্রকাশের মূলে। বিশ্বমূল তত্ত্বই বিশ্বাতীত। জিজ্ঞাসা যখন জাগে, তার পিছনে ধাওয়া করে দেখা যায় অজানা হয়ে থাকাই তাঁর স্বভাব, তিনি যেন সৃষ্টির পিছনে লুকিয়ে আছেন। এই পরম পুরুষের প্রকৃতিই তাঁর পরম প্রেমস্বরূপ। পুরুষের আনন্দ রসসৃষ্টির মূলে, তাঁর অনন্ত প্রেমের অবতরণেই এই রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তি চিদানন্দ-স্বরূপ। এ তো শুধু বিচারে ও ভাবে বুঝলে হবে না, তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠিত দেখতে হবে। তাই জানতে সাধ যায় না কি—কি সেই পরম জ্ঞান, যাকে আশ্রয় করে পরম প্রেমের দিব্য আহুতি সম্ভব হয়েছে? আর সেই ভাবের দিব্যকর্ম তো আমাদেরও কর্ম-যোগের লক্ষ্য।

সাংখ্য বলেন জ্ঞান অনন্ত জ্ঞেয় অল্প। একটা ঘাসের শিসকেও কি আমরা পরিপূর্ণ ভাবে জানতে পেরেছি, বলতে পারি? প্রতিটি সীমিত জ্ঞানকে ধরে আছে অখণ্ড সমগ্র জ্ঞান। সেই অসীম অনন্তের বোধে প্রতিভান উদিত হয়। অনুভাব আবেশ এইভাবে চেতনায় তার ক্রিয়া। ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে হাট করে, তাঁর নিত্যপ্রকাশ সেই আলোকে পরিপূর্ণ ভাবে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে পেয়ে তবে জানতে হয়। তিনি অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত তাঁকে জানার বিভাবও অনন্ত। রূপে রূপে প্রতি রূপে তাঁকে জানতে গিয়ে তাঁর মূর্তিকে দেহ দিয়ে না জানতে পারলে জানাও পূর্ণ হয় না। তিনি সচ্চিদানন্দময়—আত্মায় এক হয়ে একাকার হয়ে তাঁকে যেমন জানতে হয়, তেমনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহরূপেও তো তাঁকে জানতে হবে। তাই বলা যায় যেমন লোকাতীত জ্ঞান আছে, তেমনি লোকাতত লোকে লোকে লোকী—এই সব

রূপে একই সঙ্গে তাঁকে জানতে হবে। এ হল ভালবেসে জানা ও পাওয়ার কথা। সে জানাতেও দেহাতীত হয়ে উজিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে জেনে, আবার স্বভাবের নিয়মেই দেহের অভ্যন্তরে তাঁরই কল্যাণতম রূপটি দেখে বিস্মিত হতে হয়—এই যে বিগ্রহের মধ্যে তিনি অপরূপ, এ রূপ যে চেয়ে দেখবার মত। এ তো আগে জানিনি। এ জানা আর ফুরায় না। কাজেই জ্ঞানের সাধনা আর প্রেমের সাধনা পরস্পর বিরোধীও নয়। কখনও কোনটা আগে বা কোনটা পরে, এ ভাবেও সাধনায় আসতে পারে।

প্রাকৃত জীবনের এই ভালবাসাকেই তুলে নিতে হবে রাধা-কৃষ্ণের ভালবাসায়, শিব-সতীর ভালবাসায়; আর মুক্তিই তার ধর্ম। প্রেম খোঁজে ত্যাগ, তাই সংসারে আবদ্ধ ভালবাসায় সাধারণত তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এক আদর্শ সামনে রেখে যখন ভালবাসতে চাই, তখন সে-ই আমার ভগবান। আমার বৃহত্তর রূপ ও পরিকল্পনা নিয়ে ভালবেসে তাঁকে সবই দিয়ে দিতে চাই। তিনি লোভী নন লোলুপ নন, তিনি তা গ্রহণ করে আমাকেই ধন্য করেন। তাই আমার পূজা আমার কর্ম, এই ভাবে সব ঢেলে ত্যাগে মুক্তি ও আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। এই ভূমানন্দ ভালবাসার আদান প্রদান সংসারে চালাতে পারলে দিব্য-জীবনের পথ কত সুগম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা সম্ভূত হয়েও যেন সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। শতকরা নিরানব্বইজন লোকই ভালবাসা পেয়ে ভালবেসে স্বার্থপর হয়ে ওঠে, অহন্তা ফেঁপে ওঠে। শিশুর পবিত্র ভালবাসা, শিশুর প্রতি মায়ের ভালবাসা—সেখানেও এক অহন্তার বোধ এসে ভালবেসে সন্তাকে গ্রাস করে রাখতে চায়। সেবাব্রত নিয়ে কর্মকে বিস্তৃত করেও দলাদলি খাইখাই ভাবের থেকে রেহাই মেলে না। তারপর দেখা যায়, এরই মধ্য থেকে বৈরাগ্য আসে, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় চিত্তে এক বিস্ফারণ ঘটে। তখন সন্তানের জন্য ত্যাগ প্রিয়ের জন্য আত্মবিসর্জন এ সব দেখা দেয়। তাকে যোগ করে তুলতে হবে বিশুদ্ধ করে।

প্রথম দিকে সংসারের সঙ্গে ভাগবত ভাবের একটা বিরোধ লাগেই, তখন আমরা আশ্রম মঠ মহাপুরুষ-সঙ্গ এই সব খুঁজি। একাগ্রতার সাধন পেয়েও সমন্বয় করা সহজ হয় না। দেখা যায় ভগবান ভালবাসা, সে সহজ নয় কঠিন তার সাধন। কিন্তু উপাসনা করে তাকে কিছুটা আয়ত্ত করতে পারি। সংসারে থেকেও কিছুটা সময় চিত্তকে বন্দী করে একাগ্র করার সাধন সাধতে হয়। বিগ্রহের উপাসনাতেও ভগবানকে ভালবাসার স্বাদ পেয়ে ভালবাসার তুঙ্গভূমি সহজে অধিগত হতে পারে। এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণদেব দেখিয়েছেন তাঁর ভবতারিণীর বিগ্রহ-উপাসনায়।

কিন্তু সেও কি সাধারণ লোকের কাছে সহজ হয়? তামসিক উপাসনার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ রাগ করেই বলেছেন যে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? ·· মানুষকেই ভালবাসতে শিখলি না, ঈশ্বরকে ভালবাসবি কি করে?" আবার মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে ক্রমে এই ভাবই আসতে হবে "আগে কহ আর"। কোথায় সেই মনের মানুষ? তখন চিত্তে নির্বেদ এসে ব্যাপ্তিচৈতন্যে চিত্ত প্রসারিত হয়ে শূন্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু চিত্ত পাষাণের মত নীরস হয়ে গেল, রসের উৎস খুললই না এরকম যদি হয়, তাকে কোন মতেই সিদ্ধ অবস্থা বলা চলে না। শূন্য হয়ে পূর্ণও হতে হয়, মূলে গিয়ে রসের উৎসটি ধরতে পারলে, পুরুষ-প্রকৃতির ভালবাসা ও তাথেকে জগৎ-সংসারকে ভালবাসার স্বরূপটি ধরা যায়। এ তো আর কোন ফর্মুলা (formula) করে বোঝা যাবে না, এক রহস্যপূর্ণ অনুভবই তার সন্ধান দেয়। ভালবাসা এক বিপুল যজ্ঞ, তার সাধনাও বড় কঠিন। ঊর্ধ্বমুখী দীপশিখার মত তার গতি হয়েও সব কিছু ভাসিয়ে তা টলমল করে দেয়। বহু রূপের মধ্যে সেই ভালবাসা এলেই তবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সার্থক হয়। সেই সোমধারার বর্ষণে এই মর্ত্য জীবও অমৃত হয়ে ওঠে। সে সত্যকে ঐকান্তিকরূপে পেতে হয় বিগ্রহে,

তাঁর বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বরূপে, আবার সব মিলিয়ে নিজের আত্মাতে। বলা যায়, অরূপ বহুরূপ অপরূপ—এসব মিলিয়েই তো তাঁর স্বরূপ! সব রকম করে সে ভালবাসার সত্যকে না বুঝলে প্রেমের কর্ম প্রাণের কর্ম আর প্রজ্ঞার কর্ম সুসমঞ্জস হবে কেমন করে?

তাহলে প্রেমের কর্ম সাধনা করতে কি পেলাম? সর্বজীবে ভগবান—এই শিবজ্ঞানে সে কর্ম সম্পন্ন হবে। রামকৃষ্ণদেব যে বলতেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার করতে, এও সেই রকম। এই বোধ নিবিড় হয়ে যখন অন্তর্মুখী হল, তখন বাহিরের ফলিত কর্ম এক প্রতীকের মতন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিমায় বা বিগ্রহে মাকে যেমন দেখি, সেই রকম সব কর্মে সেই আদর্শের (vision) অনুষ্ঠান। কিন্তু ভালবেসে সেবা করতে গিয়ে, মানুষের কাছ থেকে সেই অন্তরের আদর্শ রূপটি বারবার ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়। তবুও মানতে হবে তিনিই তো সব রূপ ধরে এসেছেন। এ বড় কঠিন কর্ম কিন্তু কঠিন সত্য। সাধক রামপ্রসাদের জীবনে মা-ই তো কন্যার রূপ ধরে বেড়া বেঁধে পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। এই আটপৌরে জীবনের খাওয়া পরার মধ্যেও তাঁর কত বিভূতিই প্রকাশ করেন তাঁর অপার করুণায়, মানুষের প্রেমে। সেই সর্বনাশা মেয়েটি না পারে কি? মা হয়ে কন্যা হয়ে জায়া হয়ে সহোদরা হয়ে কি খেলাই খেলে চলেছেন। এই ভূতভাবন দক্ষযজ্ঞ কি তাঁরই খেলা নয়? এরকম দেখতে পেলে ছোট ও বড় সব রকম কর্মেই রূপ দর্শন (vision) সার্থক হয়ে উঠবে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা উচ্চকোটির সাধকের। কিন্তু যথার্থ এই ভাবটুকু সম্বল না হলে, প্রতীক পূজার মত কর্ম যজ্ঞ হয়ে উঠবে কেমন করে? ভালবাসার যজ্ঞকর্ম শূন্যে শূন্যে আদান-প্রদান নয়। প্রত্যেক কর্মে ও ব্যবহারে এক নিগূঢ় শুদ্ধ রসের সম্পর্ক। আমাকে তোমার মত করে দেব, আবার তোমাকেও আমার মত করে পাব, এই অন্যোন্য ভাববিলাসের বহু রকমের রূপবৈচিত্র্য। আর এই দিব্য বিলাসকে ধরে আছে

যোগিনী হৃদয় বা তার আদিত্যহৃদয়। সেই বিরাট জ্ঞানাত্মা পুরুষেরই নিত্যকর্মযোগ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তাই তো আমার প্রতীকপূজা! তবে প্রতীকে মনটা বাঁধা পড়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

তাহলে তাঁকে পেতে হবে তিন ভাবেই, জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে। আর সাযুজ্যের জ্ঞান গভীরে রেখে তাঁর ভালবাসাকেই পূজায় ফলিত করতে হবে কর্মযোগে। চৈত্যপুরুষই ভগবানকে ভালবাসার পথ দেখিয়ে দেবেন, আর তাতে প্রকৃতিও চৈত্যভালবাসায় রূপান্তরিত হবে। সে ভালবাসায় লালসা নেই, কিন্তু সংসারের ভোগজীবন তাকে লালসায় পঙ্কে টেনে আটকে রাখতে চায়। সেজন্য শক্তির সাধনা চাই। তাই চৈত্যভালবাসাকে তুলে নিতে হবে আত্মার মহিমময় ভালবাসায় (Spiritual Love)। তা না হওয়া পর্যন্ত অবর লোকের অনেক বিকৃতিই ভালবাসার মুখোস পরে এসে দাঁড়ায় ও আদর্শচ্যুত করতে পারে। অবচেতনের গহনে কামনা-বাসনাগুলি জট পাকিয়ে (complex) থাকে। তা অনেক সময় সাধককে বিভ্রান্ত করে। তখন প্রেমের শুদ্ধ ভাববিলাস স্বভাবে থাকে না, তা থেকে বিস্তৃতি ও প্রশান্তি হারিয়ে ভালবাসা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তারই শক্ত বনিয়াদ করে নিরুদ্ধ ভূমির ভালবাসাকে দেখিয়েছি। কুমারসম্ভব কাব্যে মদনদহন করে একাগ্রভূমির ভালবাসাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যোগীর নিরুদ্ধভূমিতে। কাম দগ্ধ না হলে প্রেমের উজ্জীবন হয় না। আর তাই হলে তবেই উমা শিবের অঙ্কশায়িনী। অতনু হয়ে সঞ্জীবিত হতে হবে সত্ত্বতনুতে। এই রুদ্রগ্রন্থিটি পেরিয়ে চৈত্যপুরুষের ভালবাসা স্বভাবসিদ্ধ হয়। সর্বভাবের সমাহারে আত্মা ও তনু এক হয়ে যাবে। গভীরে অতনু থেকে শিবের সেই ভালবাসা—আত্মারামের আত্মহারা ভালবাসা, মৃত্যুকে পেরিয়ে তার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দাম টলমলে দুর্বার তার গতিবেগ আর গভীরে থাকে অতল শান্তি। শ্রীঅরবিন্দ প্রেমের পরিপূর্ণ রূপটিকে অতিমানসী প্রেম (Supramental

Love) বলে অভিহিত করেছেন। গম্ভীরায় চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের অদ্ভুত বিবরণে তার কিছুটা আভাস যদি পাওয়া যায়, না হলে মননে বা ভাষায় তাকে রূপ দিতে পারি সে সাধ্য কি! চৈত্যপুরুষের জাগৃতিতে দিব্যকর্মযোগে আহুত হলে সে শক্তিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তার জন্য ভাবসংশুদ্ধির সাধনে গভীরে চাই শান্তির প্রতিষ্ঠা—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সে যেন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়ে ধ্যানের গভীর নিথরতা, ঊর্ধ্বে বৃহতে ব্যাপ্ত অনন্ত প্রশান্ত আকাশ। আর তারই মধ্যে চলেছে বহু বিচিত্র তরঙ্গের উল্লাসিত লীলায়ন—শিবশক্তির সামরস্যে বিলসিত উল্লাসের বিসৃষ্টি।

১৪

যজ্ঞের ঊর্ধ্বায়ন

দিব্যকর্মের তৃতীয় পর্বে এলাম—Works of Life-এ, যাকে আমরা বলেছি প্রাণের কর্ম। পূর্বে প্রজ্ঞার কর্ম ও প্রেমের কর্মে চৈত্যপুরুষের অভিব্যক্তি ও দিব্যকর্মযজ্ঞের ঊর্ধ্বায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা গেল যে, প্রাকৃত স্বভাবের দিব্যায়নের দিকে দৃষ্টি রেখেই এইভাবে প্রজ্ঞা প্রেম ও প্রাণকে পরপর রেখে কর্মযোগে দেখান হয়েছে। আমাদের মধ্যে যখন জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসপিপাসা দুই-ই প্রবল ভাবে সাধনজীবনে জেগে ওঠে, তখন তার শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণশক্তিকেও পুষ্ট করে; আর তা হলেই আমাদের মাঝে সঙ্কল্পশক্তি গড়ে ওঠে। দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করতে আমাকে যে কর্ম করতে হবে, সেটা প্রতিভাত হয়। এমনি করেই প্রজ্ঞা প্রেম ও প্রাণ, এই ত্রিবেণীর শক্তিধারা কর্মে যুক্ত হলে তবেই পূর্ণযোগের সমন্বয়ী সর্বাবগাহী প্রয়োগক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়। আমরা দেখলাম, পূর্ণযোগে শুধু পরাবিদ্যাই নয় অপরাবিদ্যার অনুশীলনেও উত্তম জ্যোতিকে যেমন নামিয়ে আনতে হবে, তেমনই আবার ভগবানকে ভালবেসে মানুষকেও সেই ভালবাসা বিলাতে হবে। তাতে সমাজ-সেবা বা সংসার কোনটাই উপেক্ষণীয় হবে না। আর সব রকম কর্মই অতিমানস শক্তিযোগে প্রজ্ঞায় প্রেমে ও প্রাণে দিব্য হয়ে উঠবে।

আমরা যতই বলি না কেন ভগবানই সৃষ্টিতে সব হয়ে আছেন, সব মানুষে তিনিই অধিষ্ঠিত, তবুও সংসারের সাধারণ এই প্রাকৃত জীবনকে অধ্যাত্মপথের বাধা মনে না করে পারি না। এই লৌকিক জীবনে সংসারের ঝামেলায় ও মানুষের ব্যবহারের বিষে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে নাস্তানাবুদ হয়ে বলে উঠি যে, তাঁকে ডাকবই বা কখন, ভাববই বা কি করে? তখন নিজের খেয়ালে নিজেকে সামলে রাখার মত কোনরকমে এক গর্ত কেটে যেন নিজেকে ঢুকিয়ে রাখতে

চাই সেই বিষয়ে; আর তা না হলে জগৎসংসার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে যাই। তা-ও যদি না পেরে উঠি, তখন ভাল মানুষটি হয়ে ধর্মসম্মত এক কল্পিত জীবনে বাঁধা পড়ি। তাতে চারিদিকটা এলোমেলো হয়েই পড়ে থাকে। তার বেশী করণীয় কিছু আছে বলে মনে করতেও পারি না, শেষ পর্যন্ত আর কিছু যেন পেরেও উঠি না। এই ভাবে সাধনজীবন বা যোগকে জীবনের স্রোত থেকে যদি বিচ্ছিন্ন করেই রাখি, সেটা হবে যোগ-সাধনার এক মারাত্মক ত্রুটি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা বাণীতে এবং Mother তাঁর দিব্য জীবনবেদে এই অখণ্ড সমাহারের (Integration) আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন অহেতুক ভালবাসার অপরাজিতা শক্তি দিয়ে, যাতে এই জীবনেই আমরা দিব্য জীবনকে উপলব্ধি করে, তাকে নামিয়ে এনে মনুষ্যজন্ম সার্থক করে, তাতে উন্নীত হতে পারি। সেই মান ও মর্যাদা লাভ না করা পর্যন্ত যোগসাধনার সার্থকতা নেই। দেবতার অমৃতত্ব লাভ করে নরের মহিমা এখানে দেবধর্মকেও অতিক্রম করে যাবে—এই লক্ষ্যটি ধরে অগ্রসর হতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় করে ঘোষণা করেছেন অতিমানস শক্তির অবতরণ মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাঁর এই নির্দেশেই অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে হবে ওই অতিমানসের প্রসাদেই।

যোগ-সাধনায় জীবনে দু'টি শক্তিই সমানভাবে সক্রিয় থাকে—সাধকের দিক থেকে আকৃতি, আর ভগবৎকৃপা বা তাঁর প্রসাদ। মূলে একই ব্রহ্মবস্তুর দু'দিকের গতিবেগ, আকৃতি চায় উত্তরণ আর প্রসাদে ঘটে তার অবতরণ। এই করে দুই-এর অঙ্গাঙ্গিভাবের সহযোগিতায় উচ্চতর মানস ও মানসোত্তর চেতনার ভূমিগুলি সাধকের কাছে অপাবৃত হতে থাকে। উত্তরণের পথে নির্বাণ মুক্তির তুঙ্গতায় এক চরম নেতিতে অস্তিত্বের বিন্দুটুকু হারিয়ে যায়, তা আমরা শুনেছি। বুদ্ধের জীবনে যে নির্বাণ নেমে এসেছিল, তাঁর অনির্বাণ জীবনেই তিনি সে নির্বাণের শক্তি অধিগত করে জগতে তাকে সঞ্চারিত করে

দিয়েছেন। জীবন থেকে নির্বাণকে বাদ দেওয়া যাবে না, এই দেহ প্রাণ মনের ত্রিবৃতেই সাধনার পরম ফল প্রকাশিত হয়, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। "জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে"—এই হল কবির ভাষায় আমাদের জীবনে নচিকেতার অভীপ্সা (human aspiration)। জীবন সম্বন্ধে ওই বিমুক্তির অনুভবকে বৌদ্ধ দর্শনে ও শঙ্করের মায়াবাদে জ্ঞানের চরম ভূমি বলে দেখান হয়েছে। জ্ঞানবাদীর "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এই অনুভবকে যোগ সাধনায় আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু তা যে অনুভব ও প্রতিবোধের শেষ কথা নয়, এ কথা আমরা শুনেছি ও জানতে পেরেছি। জীবনকে অস্বীকার করে করে অস্বীকৃতির এক চরম পর্যায়ে, ওই সর্বগ্রাসী শূন্যতার গহ্বরে সর্বহারা বিনাশকেও অনুভব করা যায়। মহাশূন্যে উজিয়ে গিয়ে শূন্যতায় পর্যবসিত হওয়া—যাকে বলে "অসৎ", অথবা সেই চরম অসৎকেও এক অস্তিতার বোধে আস্বাদ করা—যাকে বলে "রসো বৈ সঃ", এই নেতি বা ইতিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি সাধনার পূর্ণতাও সেখানে হয়ে গেল, তা বলা চলে না। তাঁর শক্তির তো ক্ষয় নেই! যে শক্তির উত্তরণ হয়েছিল, ঠিক সেই রূপেই সে আর ফেরে না বটে, কিন্তু তাঁর শক্তির অবতরণ তো তা থেকে ঘটেই চলে। তাই তো জীবনের মধ্যে সনাতন সেই যে অংশু—White Immobile Ray, সে ক্ষরকে অতিক্রম করে যে অক্ষর তার চেয়েও উত্তমকে লাভ করে, অমৃতরসে পরিপক্ক হয়ে, আবার এই জীবনেই মৃত্যুকে জয় করে ফিরে এসে জীবনকে অধিকতর অমৃত আনন্দে ভরিয়ে তুলবে—এই তার নিয়তি। কবির ভাষায় তখন—

> "চারিদিক হতে অমর জীবন
> বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
> আপনার মাঝে আপনারে আমি
> পূর্ণ দেখিব কবে!"

এই হল সাধকের ভাব।

সেই চরম নেতির অনুভবে বোঝা যায় এ জগৎ-সংসার স্বপ্নের মত ঘুমের ঘোরে চলে, এ সত্য নয়। তবুও জগতে জীবনে থাকতে হয় ও তা থেকে কর্ম সম্বন্ধে নানারকম ভাব ও মনের সংস্কার তখন এসে পড়ে। কেউ বলেন প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করতে হবে, সেটা কেটে গেল "ন পুনরাবর্ততে"। এ সংসারে আর নয়, প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করে জীবনের মূল বৃন্ত থেকেই সরে পড়া। আর এক দিকের ভাব হল, ওপারে গিয়ে রসবস্তুকে চিনে এসেছি, জেনেছি আনন্দ কি বস্তু। সেই রসেই সব কিছু জারিত দেখছি—"সর্বং খাল্বিদং ব্রহ্ম", তিনিই সব। বৌদ্ধেরা বলেছিলেন শূন্যতাই শেষ কথা—পুদ্গলনৈরাত্মবাদ। আত্মাকেও নেতি করে চরম শূন্যতায় একেবারেই অসৎ হয়ে যাওয়া, কিছুই আর থাকল না। তাই যদি ফিরেও আসতে হয় জাগ্রতে, জগৎ তখন ছায়াবাজির মত থাকে, সে তো শূন্যে অক্ষক্রীড়ার মত দেখা যায়। তাতে তটস্থভাবে আমার থাকা মাত্র, কর্ম থাকে না। এতে জগতের প্রতি যে সুবিচার হয় না, এ তথ্য শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে গোড়া থেকেই আমরা শুনে এসেছি। আবার জগতে থেকে শূন্যতায় সব কিছুকে অনুস্যূত রেখেও যে নির্বাণের কর্ম করা যায়, তাও আমরা এ যুগে প্রত্যক্ষ করেছি মহর্ষি রমণের জীবনে। মরণকে নিয়েই যেন ছিল তাঁর রমণ। তাঁর সমীপে জিজ্ঞাসুরা সেই আকর্ষণে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন, সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁরা দিয়ে গেছেন। ওদিকে লীলারস আস্বাদন করতে লীলাবাদীরা জগতে থেকেও জগতের কর্মের প্রতি বিমুখ ভাব এনে ধর্মজীবনে শুধু রসে বিভোর হয়ে থাকার জন্য নিজেকে যদি আবদ্ধ করে রাখেন, তাতেও যোগ-সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা নেতি বা অসৎকে অস্বীকার তাঁর দিব্য লীলারসেই শুধু ডুবে থাকলে সাধনার পূর্ণতা আসবে কি করে? শ্রুতি শুনিয়েছেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'। ব্রহ্মের আনন্দ জানলে তো কোন কিছুতে ভয় থাকে না, তাহলে অস্বীকার করব কি আর কিসের থেকেই বা ভয় পেয়ে সরে থাকব? তাই

মায়াবাদই হোক আর লীলাবাদই হোক, কোন বাদে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। "আমার মত" বলে শেষ পর্যন্ত কোন কিছু তো থাকে না, এই আমিটা তো আর থাকবে না। জগৎসৃষ্টির মূলে রয়েছে তাঁর অর্থ, তাঁর সৃষ্টি নিরর্থক নয়, একটা দুর্ঘটনা মাত্র নয়। সেই অর্থকে আবিষ্কার করতে গেলে পাই শূন্যতা ও রস, লীলা বা তাঁর এক অসঙ্গ কামনাকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে উল্লাস, আর সেই উল্লাসই প্রাণ—"প্রাণ এজাত নিঃসৃতম্"। তাই জিজীবিষা বা will to live—এই বেঁচে থাকার চাহিদা রয়েছে সৃষ্টির মূলে। সৎ ও অসৎ-এর এক টানা-পড়েনে এই জগৎ-যন্ত্র যন্ত্রিত হয়ে রয়েছে। সেখানে ওই জিজীবিষা সার্থক করে তুলেছে ব্রহ্মের শক্তিরূপ—প্রাণ।

ব্রহ্মের সদসৎকে যখন বলা হয় "অস্তীত্যুপলব্ধিমাত্রম্" তার মধ্যে শুধুই আলো বা শুধুই আঁধার এরকম অনুমান করা ঠিক নয়। কেননা তাকে আলো বা আঁধার কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তখন ভেদক ও নির্দিষ্ট কোন দিকও নেই। কালাতীত অনির্বচনীয় এক উপলব্ধিমাত্র এই বোধ, অনন্ত কালপ্রবাহে তার গতি শুরু হতে দেখা যায়। ব্রহ্মকে ওই শুদ্ধ প্রজ্ঞান বললে তারই মধ্যে আলো ফোটে, তাঁর শক্তির উল্লাস জেগে ওঠে, তাও বলতে হয়। একাকার থেকেই অনন্ত বৈচিত্র্যের সম্ভূতি—আর তখনই আমি তুমি বিষয়ী বিষয় স্রষ্টা সৃষ্টি, এই রকম করে দুই কোটিতে আনন্দ ব্রহ্ম প্রেমে উচ্ছলিত হতে থাকেন। এরকম দেখলে বলতে পারি আনন্দ প্রেম সৌন্দর্য সবই যেন সৎ ও চিৎ-এর বুকেই সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই ভাবে দর্শন সিদ্ধ হলেও আমাদের ব্যবহারিক অসিদ্ধ জগৎ প্রাত্যহিক জীবনে ওই মূল থেকে যেন বাদ পড়েই থাকে। সেখানে আমাকে সকলের সঙ্গে মিলতে হবে, যেমন ভাবের জগতে তেমনি কর্ম-জগতে। সেই কর্মকে প্রাণের কর্ম করে তুলতে হবে।

এই জগৎ-সংসারে যে তাঁর শক্তির প্রকাশ তা দেখলাম বুঝলামও। কিন্তু ব্যবহারে যে এক নেতির দুর্বোধ্য আড়াল রয়েছে; সেই "বিশ মণ পাথরের"

আড়াল সরাতে যে শক্তি-সাধনার প্রয়োজন। তখন এই অসিদ্ধ জীবনে তাঁকে স্বীকার করে নিলে তবেই শক্তি উদ্বুদ্ধ হতে থাকে, আর তাতেই জিজীবিষার সার্থকতা। তখনই ঠিক বলতে পারব, সৎ চিৎ আনন্দ শক্তি সবই ব্রহ্মের বিভঙ্গ। আবার এসব ছাপিয়েও তিনি অসৎ। এই পঞ্চপর্বা মিলনটি জীবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘটিয়ে কর্ম সিদ্ধ করতে পারলে, তবেই জীবন সহজ হতে পারবে। আমরা জানি, তাঁকে এখানে নামিয়ে এনে বাস্তব জীবনে সহজ হওয়াটা কত বড় দায়, তবুও প্রাণের কর্ম সেখানেই পূর্ণতা এনে দিতে পারবে —এই তার পরিচয়। তখন এই বাস্তব জীবনের বৃহত্তম থেকে তুচ্ছতম পর্যন্ত ব্রহ্মের আপন স্বভাব-কর্ম সম্পাদিত হয়ে চলবে।

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি তিন গুণের সমহারে গুণময়। সে গুণগুলি হল সত্ত্ব রজ আর তম। প্রকৃতির নিসর্গ জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে গুণগুলিকে বর্ণিত করতে পারা যায়। ভোরের আকাশে আলো আঁধারের খেলায় আঁধার হয় তমোগুণের প্রতীক, সেই আঁধারের বুক চিরেই আলো ফুটতে দেখা যায়। তাতে প্রথমে রজোগুণের ক্রিয়া, যখন লাল রঙে আকাশ ভরে যায় তারপর আকাশ কত বর্ণবৈচিত্র্যে আলোর খেলা দেখিয়ে আবার রংছুট হয়ে যায় বালসূর্যের উদয়ে। তখন সেই "আলো আমার আলো"কে পেলাম। সেই সোনার আলোর বর্ণ হল সত্ত্বগুণের প্রতীক। দিন এল, সমস্ত দিন পরে আবার সন্ধ্যায় বিপরীত ক্রমে এইভাবে সত্ত্ব রজ ও তম বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়ে আঁধার নেমে এল পৃথিবীতে আকাশেরই বুক থেকে। এই আবর্তনে চলছে জীবন চলছে জগৎ, আর ওপরে স্থির হয়ে জ্বলছে দিনের সূর্য একলা—জঙ্গম ও স্থাবরের তিনি আত্মা। তিনিই আমাদের সাধ্য ও সাধনের দেবতার প্রতীক। কিন্তু সেই আলোকে পেতে অন্ধকারকে অস্বীকার করলে কি তাকে পাওয়া যেত? ওই আলোকে আবৃত করে রাখার জন্য অন্ধ তমিস্রার আবরণেরও প্রয়োজন আছে। অন্ধকারের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে আলোর প্রতীক

করে তুলতে হয়। সঙ্কর্ষণের যোগশক্তিতে শক্তিকে আকর্ষণ করে গুটিয়ে নিয়ে জানতে হয় তাঁর অভীদ্ধ তপকে, জানতে হয় শক্তির নিমেষকে। আলোকে ধরে আছে যে অন্ধকার সেই রাত্রিকে দুই দিক দিয়েই বুঝতে হবে। এক অন্ধ তমিস্রা থেকে যেমন আমার অজ্ঞান, তেমনি জ্ঞানের আলোকে পেরিয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে এক বিরাট অন্ধকারের আলো (Holy Ignorance); আর সেই অ-জ্ঞানই জ্ঞানের প্রসূতি। এই ভাবের ধারণায় অসৎ ব্রহ্ম ও মূল অন্ধতমিস্রা এক হয়ে যায়, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাকে অবলম্বন করেই জীবনের ঋতি প্রকাশিত। নির্ঋতি থেকে অনৃত ও তা থেকে ঋত আমাদের বোধে আসে। প্রাকৃত জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে এই রীতিই লক্ষ্য করা যায়।

জড় বস্তুতে আমরা দেখি তমোগুণের প্রাধান্য। কিন্তু একটা electron-এর গঠনে যে শক্তিবিন্যাস (Pattern) নিয়মিত হয়েছে, বৃহৎ সৌর জগতের গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তনে, এমন কি মানবদেহের জীবকোষে পর্যন্ত সেই নিয়মকে ফলিত দেখতে পাই। এক প্রবল শক্তি নির্ঋতির আলো-অন্ধকারের ভিতরে ওই নিয়মের বশী ও প্রেরয়িতা। জড় থেকে প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হলে, আমরা সেই প্রবল শক্তিপ্রবাহকে একটা দিক নির্ণয় করে লক্ষ্যাভিমুখে প্রবাহিত দেখতে পেলাম। কিন্তু সে শক্তিপ্রবাহের দুর্দমনীয় বেগ থাকা সত্ত্বেও তার লক্ষ্য তখনও তার কাছে স্থির নয়। তার প্রেরয়িতা ও বশীকে সে চেনে না, এক অজ্ঞাত শক্তিবেগে আপন খেয়ালেই সে শক্তি ছুটে চলেছে। এই ভাবে চলতে চলতে প্রাণশক্তির পরে মনোজ্যোতি এসে পড়েছে, আর জড় প্রাণ মনের ত্রিপুটিতে আবির্ভূত হয়েছে মনু—মননশীল মানব। মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগ্রত ও পুষ্ট হয়ে আমাদের পরিচিত জগৎকে পরিচালিত করতে চলেছে, এ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। শক্তির মত্ততায় যারা দাপিয়ে বেড়ায় যাদের বৃত্তিকে আসুরী আখ্যা দেওয়া যায়, তাদেরও ধরে রেখেছে এক বুদ্ধিদীপ্ত মন—

সে নিস্পৃহ। এমনি করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে দেখে অনৃত থেকে ঋতচ্ছন্দের দর্শন পেলাম। তারও পরে দেখি দার্শনিকের অনুসন্ধানের ফলে মননের গভীরে জাগে এক আত্মজিজ্ঞাসা। আসুরী জীবন পর্যন্ত জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি টানতে গেলে, এক অন্ধ আসুরী শক্তির যদৃচ্ছাকেই মানুষের নিয়তি বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু "আমি কে"? এই জিজ্ঞাসা ওখানে অতৃপ্ত হয়ে না থেমে মননের গভীরে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। তখন ব্যাকুল হয়ে সমস্ত দিক দিয়েই সহস্রচক্ষু হয়ে অর্থ খুঁজে পেতে চাই—এ হল গরুড়ের ক্ষুধা। এই দিব্য তৃষ্ণা (divine discontent) থেকেই উর্জিত সত্ত্বের ভূয়ো-দর্শনে অধ্যাত্মজীবন গড়ে ওঠে। সেই ভূমার আবরণ খসে গেলে নব নব বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে অনির্বচনীয় রসে প্লাবিত হতে থাকলে, বাহিরটা হারিয়েও যায়। তবুও সে রসের পরিপাকে জগতের সত্য দর্শনে এই বাহিরকে তারই অঙ্গীভূত দেখতে গিয়ে আর এক নতুন করে জানার দিক উদ্ঘাটিত হতে থাকে। কাজেই দেখতে পাওয়া যাবে, পরিপূর্ণ দর্শন পরিপূর্ণ জ্ঞান পরিপূর্ণ জীবনকে কর্মে ব্যঞ্জিত না করা পর্যন্ত আমরা লক্ষ্যে পৌছতে পারব না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিচিত্র শক্তির লীলায় তার অধীশ্বর হয়ে দেহ প্রাণ মনকে তিলে তিলে সুসমঞ্জস করে গড়ে তুলতে হবে। এই ভাবে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার ও ক্ষণে ক্ষণে হারাবার সাধনাকে পূর্ণ করে তুলতে চাই যে কর্ম দিয়ে, তাকে আমরা নাম দিয়েছি প্রাণের কর্ম।

আমরা দেখেছি যে সাধন-জীবনে নিরালায় চিত্তবিশ্রাম বা নির্জনতায় ছুটি (spiritual holiday) নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকে। প্রাকৃত জীবনেও আমরা সুপ্তির ভিতর দিয়ে জাগ্রত জীবনের শক্তি সঞ্চয় করে থাকি। সেই রকম পরিবেশের অসহযোগিতায় যখন জগৎ-সংসারের সাথে সংঘর্ষ বাধে, তখন নির্জনতায় ডুবে শান্ত হতে চাই। এটাকে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিলে দেখতে শেখা যায়, বাধা আসছে অন্তরের ও বাহিরের

কোন স্তর থেকে, কোন ছিদ্রপথে। তখন এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকৃতির ওই তিন গুণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। গুণবিক্ষোভের ফলেই আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিতে জট পাকিয়ে উঠেছে। সাংখ্যকার বলেছেন, তুমি যে গুণ দিয়ে জগৎকে গ্রহণ কর, তার অধীন আছ বলেই টলমল করে ওঠ, আর তাতে বিভীষিকা দেখে ভয় পাও। যদি ভয় না পেয়ে অটল থেকে জগৎকে ও আত্ম-প্রকৃতিকে দেখতে শেখ, তাহলেই দেখতে পাবে গলদ কোথায় আর কি করতে হবে। কাজেই গীতার ভাষায় নিস্ত্রৈগুণ্য হতে পারলে গুণাধীন হয়ে প্রমত্ত হতে হবে না। কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই একটা মৎলবকে মনের সদরে বা অন্দরে স্থান দিয়ে রাখি, আর ঠিক সেই কারণেই সে চাহিদাটা বিধ্বস্ত থাকলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। ওই মৎলবটির মূলে অনুসন্ধান করলে দেখব আসক্তি বা বাসনার জট পাকানো ছোট বদ্ধ পচা ডোবার মত এক "অংহঃ" সত্তার মধ্যে আটকে রয়েছে। তাই বনে যাই আর আশ্রমে বাস করি, ওই মগ্ন বাসনার অশুদ্ধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। জন্মের সঙ্গে থেকেই ঐ সংস্কার-গুলি চিত্তকে যেন নাগপাশে বেঁধে রেখেছে, এই রকম বোধে আসে। তাই আঘাতের পর আঘাতে জগৎ-সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দেয়, আর আমরা পেতে চাই সাক্ষী দ্রষ্টা পুরুষ খাঁটি মুক্ত আত্মাকে, প্রকৃতির গুণবিক্ষোভের মধ্যে যাতে আর থাকতে না হয়। দুঃখের মূল কারণকে তাহলে এভাবে দেখে পাওয়া গেল, আসক্তি বা বাসনা (desire) আর ক্ষুদ্র অহং (অংহঃ)।

গীতায় আমরা আসক্তি ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করার নির্দেশ পেয়েছি। শ্রীভগবান দেখিয়েছেন জগৎ ও জীবন আছে, থাকবেও। তারই মধ্যে সাবধানে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে যেতে হবে, কর্মত্যাগ করা চলবে না। স্বভাব ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ত কর্ম প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট আছে, সেটা ধরতে পারা যায়, তা আমরা জানি। কিন্তু রুচি অনুসারে অনেকের কর্মে একটা নেশার (hobby) মত একদিকে প্রবণতা দেখা দেয়। সেটা করতে বাধা নেই; কিন্তু

কর্মফলে যেন মত্তত্তা না আসে, তাতে সাবধান হতে হবে। আবার মনের মত কর্মফল না হলে নিরুদ্যম হওয়া চলবে না। এক কথায় কর্মে জড়িয়ে পড়তে নেই, আর ওই ছোট অহংগ্রন্থি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁর হাতের যন্ত্রটি হয়ে অকর্তার ভার রেখে কর্ম করে যেতে হবে। অতীতের চিরকালের সংস্কার যেমন আমাকে তেমনই জগৎ-সংসারকে কর্মপ্রবাহে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তাই দুই দিক সামলিয়ে চলতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আমি করি না, তাঁর কর্ম তিনি করে চলেছেন, এই অকর্তা ভাবনার দৃঢ় ভূমি লাভ করলে এক নিজস্ব শান্তি লাভ করা যায়। আর বাহিরের চাপে কর্ম গ্রহণ করলেও কর্মের মধ্যে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারব। এই রকম অকর্তার কর্ম চালাতে পারলেই ওই প্রাকৃত অহংটির আড়াল সরে গিয়ে চৈত্যপুরুষকে সামনে পাওয়া যাবে। তাঁকে দেখছি রসস্বরূপে এখন আবার তাঁকেই কর্মের মধ্যে দেখছি অবিচলিত তটস্থরূপে, আর তাতে অকর্তা হয়েও নিস্পৃহ থেকেও যা করবার তাই করে যাই। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দর্শন করেছি, সব কর্মের নির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে শক্তি যুগিয়েও তিনি যুদ্ধকর্ম নিজ হাতে না করে অর্জুনকে নিমিত্ত করে যুদ্ধ করালেন। সেই রকম প্রশান্তির ভাবকে চরম করে ধরে ঠিক অকর্তা হতে পারলে নৈষ্কর্ম্য যোগেও সিদ্ধি লাভ করা যায়। আবার ভক্তির জোয়ারে সাধকের সত্তা প্লাবিত হতে থাকলেও তাকে ওই প্রশান্তিতে যুক্ত রাখতে হবে। সাধকের দিক থেকে প্রশান্ত ভক্তির ভাবটিই ভাল ও সাধ্য।

গীতার কর্মযোগের অনুসরণ করলে দেখা যাবে, অকর্তা নিমিত্ত মাত্র হয়েও ভগবানের কর্ম করে যেতে হবে। তিনি বলেছেন "মৎ কর্মপরমো ভব"। তাই তাঁর হাতে বীণা করেই বাজান আর যন্ত্রী হয়ে যন্ত্র চালনাই করুন, কর্মে আর কর্মফলে উদ্বেগ থাকবে না। তখন আধারে শান্তি নামে, আর অন্তঃকরণে রস সঞ্চারিত হয়; তাতে কর্মে আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। শান্ত আত্মায় রসে

বশে থাকলে অন্নময় পুরুষ জেগে ওঠেন। তখন দুরকম ফল দেখা যায়। জগতের প্রকৃতির দিকে আর পুরুষের দিকে। প্রাণময় পুরুষের জাগৃতি ঘটলে সাধকের প্রকৃতিও আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই প্রাণময় পুরুষে প্রাকৃত ভোগ ঐশ্বর্যের সব কিছু সব দিক দিয়ে অব্যাহত থাকে। তাই তখন প্রাণের ও মনের দুটি বৃত্তি—নন্দন-বৃত্তি ও সংকল্পের বৃত্তি উদিত হয়। রস-চেতনায় সম্ভোগ ও ঐশ্বর্য এই দুই রকম প্রকাশই প্রাণময় পুরুষ জাগিয়ে তোলেন। এখানে এক সঙ্কট এসে উপস্থিত হতে পারে। যদি ছোট অহংটি দম্ভে স্ফীত হয়ে ওঠে, তাহলে ভোগও পঙ্গু ও অশুদ্ধ হয়ে আসুরী বৃত্তির কবলে পড়ে যায়। কিন্তু শুদ্ধ প্রাণময় পুরুষ যখন দিব্য সম্ভোগ আস্বাদন করেন, তখন বাহিরের উপকরণ সরে গেলেও অন্তরে দিব্য ভোগের সূক্ষ্ম জগৎ খুলে যায়। তা থেকে ভোগের উপর ঈশনা (mastery) আসে। তখন ভোগের জন্য ঐশ্বর্যের জন্য কর্ম করতে গেলেও প্রাণময়পুরুষ চৈত্যপুরুষ দোসর হয়ে জেগে থাকেন। এই ভাবে কর্ম চলতে থাকলে, কর্ম যেন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রাণময় সত্তাকে চৈত্যপুরুষ প্রাণপুরুষে পুষ্ট করে তোলেন আর তাতেই আত্মপ্রকৃতি—প্রাণের সাড়া মেলে, যিনি সদাজাগ্রত। কর্মফলে নির্বিকার থেকে সাধক বুঝতে পারেন আড়াল থেকে তিনিই ঠেলছেন, তিনিই হয়ে আছেন ও হয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে মিলে তখন আপনাকেই বৃহৎ করে পাওয়া যায়, ব্রহ্মসত্তাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রকম করেই আসক্তি আর অহমিকা (অংহঃ, ego) থেকে মুক্তি পেলে বৃহৎ হয়ে স্বীয়া প্রকৃতির সত্যকে লাভ করা যায়।

গীতার উপদেশ বিশ্লেষণ করে এবার আবার প্রাণপ্রকৃতি ও প্রাণের কর্মের স্থানটি সাধনায় করতে চেষ্টা করব। প্রথমেই শুনেছিলাম তিতিক্ষার কথা। যা কিছু আসুক, সমস্ত শক্তি সংহরণ করে সয়ে যেতে হবে। গুণবিক্ষোভে চারিদিক টলমল করে উঠলেও আপূর্যমান অচল-প্রতিষ্ঠ থেকে জানতে হবে অবিনাশী সেই পরম সত্তাকে, যা সব ছেয়ে সব কিছু ধরে আছে। সেই ব্যাপ্তি

চৈতন্তকে অবলম্বন করে আসক্তির কবল হতে মুক্ত হয়ে কর্ম করতে প্রাণের কর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তাতে প্রেমের কর্ম যুক্ত হলে ওই ব্যাপ্ত আত্ম-চৈতন্ত যে বিশ্বচৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত, সেই দৃষ্টি উন্মুক্ত ও প্রসারিত হতে থাকবে। তখন যে কর্মের কর্তা সে অকর্তা কিন্তু তাঁরই নিমিত্ত, তাই তাঁর শক্তিতে শক্তিমান। হনুমানের মত বজ্রাঙ্গবলী হয়ে সমস্ত বিশ্বকে তার করতলগত করে রাখতে পারে, এমনই সাধিষ্ঠ সেই শক্তি। এই রকম করে বৈরাজ ছন্দে শক্তিকে কর্মের মাঝে নামিয়ে সার্থক করে তুলতে পারলে প্রাণের কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারবে। বাসনা থেকে বিমুক্তি ঘটাতে নেতি নেতি করে সাধনায় উজান গতির কথা বলা হয়েছে, সেখানে ওই ক্ষুদ্র অহং বা কাঁচা আমিটিকে সরে পড়তেই হবে। তখন তাঁর নিমিত্ত হয়ে চৈত্যপুরুষই সামনে আসেন আর কর্মে ভোগ ও ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকৃতি তাঁর বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আত্মপ্রকৃতির শক্তিতেই সব কিছু কর্মযজ্ঞ সিদ্ধ হয়ে চলে। দিব্যকর্মযোগের পূর্ণতার পরিচয় এই প্রাণের কর্মশক্তিতে। প্রজ্ঞা ও প্রেমযোগে কর্ম করেও জগতের এক তুরীয় সত্তাতেই থেকে যাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণের শক্তি তাতে যুক্ত হয়ে যখন তাকে এইখানে নামিয়ে আনতে চায়, তখন সেই দিব্যশক্তির স্ফুরণে দিব্যকর্মের অনুষ্ঠানে আসতে থাকে বিরাট বাধাসমূহ। প্রধান বাধাই হল, এখানকার ক্ষুদ্র অহং তার আসক্তি নিয়ে দ্বৈতবুদ্ধির জগতে এমনভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুদিক দিয়েই অজ্ঞান ও মিথ্যার (Ignorance and false-hood) স্বত্বকে কায়েমী করে রেখেছে যে, সেখানে সত্যের শক্তিকে তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না। দিব্যকর্মযোগের পরিকল্পনাই থেকে গেল, সে শক্তিকে নামিয়ে মিথ্যা মায়াকে অপসৃত করা গেল না, এমনও অনেক ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব। শক্তির প্রয়োগে বার বার তাল কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই মনের ওপারে অতিমানস বিজ্ঞানশক্তির সন্ধান পেলে তবেই মূল অক্ষয় শক্তি-ভাণ্ডারের জোগান পাওয়া যায়; আর তখনই জীবনে শান্ত

ও সুস্থির হওয়া যায়। আবার সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত না হলেও অতিমানস জ্ঞান অবতরণ করতে পারে না, তাঁর দিক থেকে এও এক দ্বিধা। ভগবান নিজেই বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

তাঁর মায়া তাঁরই শক্তিতে পেরিয়ে যেতে হবে এই হল রহস্যের মূল শক্তি। তখন মায়াকে ছাপিয়ে গিয়ে আবার মায়ার অধীশ্বর হয়ে বসতে পারলে তবেই সমস্যার সমাধান হবে।

আত্মাকে কেন্দ্রে রেখেই তো শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়। কিন্তু সেখানে অহং ত্যাগ করতে বলা হয়েছে; আমি বা আমার জীবন থাকবে, তবুও আমি বোধটি থাকবে না। কোন বাসনার গাঁট না থাকাতে চাওয়ার কিছু নেই, কোন প্রত্যাশাও রাখতে নেই। এটা সম্ভব হয় চৈত্যসংস্পর্শে, অকর্তার বোধে। তাঁর প্রসাদই যে আমাকে তাঁর দিকে নিয়ে চলেছে, আমি যে তাঁর দ্বারাই বৃত। তিনি চেয়েছেন বলেই না আমি তাঁর কর্মে নিযুক্ত হয়েছি। আমার চিদাকাশে প্রেমসূর্য হয়ে তিনিই তো জ্বলছেন। এই চৈত্য ভালবাসার অবলম্বনটি চাই, তবেই পরিণামে পূর্ণ অতিমানস প্রেমের অবরতরণ সম্ভব হবে। এই ভাবে প্রেমের মধ্যপথ ধরেই শান্ত হয়ে চলতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ সেই রকম নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু চলতে হবে অন্তরের গভীরের প্রেরণায়, বাহিরের তাড়নায় নয়। তিনিই মূলে শক্তি জোগান দেন, তা থেকেই অন্তরে প্রেরণা আসে। অনেক সময় গহন কর্মের পথে প্রশ্ন আসে মনে খটকা লাগে। তখন পথের দিশারী গুরুকে মূল শক্তি-নির্বাচনের প্রতিভূ বলে বুঝতে হবে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে স্থির হয়ে ধরে থাকতে হবে। তাঁতে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশ নির্বিচারে মেনে চলতে হবে। কর্মপথে তাঁর বশে থেকে চলাই কর্মযোগের ধর্ম। তৈত্তীরিয়োপনিষদে

দেখি, আচার্য শিষ্যকে ব্রত দিয়ে বলছেন—যাও নিজের মধ্যে সাধন করে সমাধান কর : আর সমাধান করতে না পারলে সংশয় হলে আশেপাশে যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁদের কাছে বিনীত ও নম্র হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিও। তাঁরা যে রকম আচরণ করবেন, তোমার কর্মানুষ্ঠান সেই ভাবে চালিত কর। এই রকম উপদেশকেই তাঁরা কর্মের বিধি ও বেদের রহস্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাহলে প্রাণের কর্ম সমাধান করতে গিয়ে পেলাম—ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে বাধা বিপদ সব মেনে নিয়ে, বিরোধী শক্তির স্পর্ধিত আহ্বান (challange) গ্রহণ করে অন্তরেব পবিত্র নির্দেশটি বেছে নিয়ে কর্মপথে চলতে হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি কর্মের গতি আসলে ঘুরে যাচ্ছে বাহিরের বিচারের দিক থেকে অন্তরের মূল্যবোধের দিকে। তাঁকেই পরমাত্মীয় বলে চিনে নিতে হবে। তিনিই আত্মার দোসর বুঝতে পারলে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণে নিজের মধ্যে কোন হীনতা বোধ আসবে না। বরং জাগ্রতে তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে তাঁর মত তাঁর সাথী হয়েই চলতে হবে। পথের বাধায় সংশয় উপস্থিত হলে সম্যক ঋষিকে প্রণিপাত করে পথের নির্দেশ গ্রহণ করে বিনীত নম্র হয়ে পথ চলতে হবে।

*

যজ্ঞকর্মের উত্তরায়ণের পথে প্রজ্ঞার প্রেমের ও প্রাণের কর্ম বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এর পর চতুর্থ পর্বে এসে সবগুলিকে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট করে দেখা যাক। পুরুষ-প্রকৃতি সকলের মধ্যেই একাকার হয়ে আছে। আবার কারও মধ্যে পুরুষ ভাবের ও কারও মধ্যে প্রকৃতি ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। আমরা জানি পুরুষের ধর্ম প্রজ্ঞা আর প্রকৃতির ধর্ম প্রাণ এবং দুয়ের মধ্যে সেতু হলেন প্রেমরূপী চৈত্যপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে সর্বাগ্রে প্রজ্ঞার কর্মের স্থান। চৈত্যপুরুষ দিয়ে সাধনার শুরু, তাই পুরুষের দিক থেকে এই দর্শন, আবার চৈত্যপুরুষের স্থান প্রকৃতির দিকে। সে ভাবে দেখলে, বৈষ্ণব-দর্শন যেমন

বলেছেন, বলা যায় জীব মাত্রেই প্রকৃতি আর একমাত্র পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতি চলেছে পুরুষের দিকে—এই তার উত্তরায়ণ তপস্যা ও পরিণামে দেবায়ন। সেই কারণেই গোড়ায় প্রজ্ঞানের প্রসঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করে প্রেম ও প্রাণকে শোধন করে নিলে তিনকেই সমানভাবে কার্যকরী করে তোলা যাবে। এই রকম সমম্বিত করে কর্মযোগের অনুষ্ঠান আমাদের যোগজীবনের ধর্ম।

ভগবানকে ভালবাসা ও জানা—প্রেম ও প্রজ্ঞা দিয়ে লাভ করলেও যোগ পূর্ণ হয় না। এই পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রেম ও প্রজ্ঞাকে নামিয়ে আনতে হবে, সেটা হল প্রাণের কর্মের দায়। All life is Yoga তখনই বলতে পারব, যখন প্রাণের কর্ম দিয়ে জীবনকে এখানেও যোগযুক্ত করে রাখতে পারব। সে দিকটা এবার এই প্রসঙ্গে বিচার করে দেখা যাক, তার সাধন সংকেত কি কি পেলাম।

আত্মসচেতন না হলে যোগ হয় না—এ হল যোগের প্রথম কথা। জীবনের উন্মেষকে সচেতনভাবে স্ফুরিত হতে দিতে হয়। তাতে প্রাকৃত জীবন বলতে আমরা যেটা বলি ও বাহিরে দেখতে পাই, সে দিক থেকে যোগে জীবনের মোড় ঘুরে যায় ভিতরের দিকে। জীবনের এক পর্ব থেকে অন্য পর্বেই চলে যেতে হয়। কেননা এমন ভাবেই শারীর-ইন্দ্রিয়গুলি সংস্থাপিত যে প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়ে বাহিরের দিকে—"পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। তাই আত্মানুসন্ধানের তাগিদে যখন প্রত্যক্ দর্শনের দিকে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলতে থাকে, সেটাই যোগের দর্শন বলে আভিহিত হয়ে থাকে। সেইজন্য এই বহির্মুখী অহং বা 'কাঁচা আমি'টাকে ভাল করে চেনা দরকার। আর সেই কারণেই বিবেক-বিচারকে ঠিকমত জাগাতেই দুঃখবোধের প্রয়োজন। সাধারণত মানুষ স্বভাবে (অধ্যাত্ম) চলে না, চলে শক্তির তাড়নায় অবশ হয়ে। শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে আর কুলিয়ে ওঠে না আর তাতেই দুঃখ দেখা

দেয়। কিন্তু কামপুরুষ প্রবল থাকলে, দুঃখ পেয়ে অসাড় হয়ে গেলেও দুঃখের কারণ আমরা বুঝতে চাই না, বা তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না। জীবাত্মা (Soul) জাগছে কিন্তু তাতে কামনার মুখোস, আর তার পুঁজি আসক্তি। তাই কামপুরুষের আসক্তির থেকে চাওয়া ভোগের উপকরণ জড় হতে থাকে, উপকরণ বাড়তেও থাকে, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। এই হল জীবনের প্রাথমিক পর্ব ও জীবনের চাহিদা। এই চাহিদাকে অবলম্বন করে জীবনের অভ্যুদয়কে কিছু পরিমাণে সার্থক করা যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, এরপর আরও কিছু চাই, এই অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা থেকেই যোগজীবন শুরু হয়। তাই ভোগ ও ঐশ্বর্যকে প্রকৃতির ধর্ম বলে বিচার করে সাংখ্যদর্শন পুরুষকে তা থেকে বিবিক্ত করার সাধনা দিয়ে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়েছেন। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র হয়ে থাকেন, আর প্রকৃতি ভোক্তা থেকে যান। কিন্তু বৈরাগ্যের পথে চলে এই প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিয়োগে পূর্ণযোগ সিদ্ধ হবে না, প্রকৃতি তাতে বাদ পড়ে যায়। তাই প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিলে প্রথম কর্তা প্রাণপুরুষ (true vital being), তাঁকে চিনে নিয়ে, তাঁর প্রেরণা ও দোসর জেনে চৈত্য-পুরুষকে ধরতে হবে। তখন গভীরের দিব্যপুরুষ, যিনি অন্তর্যামী পুরুষোত্তম তাঁকেই প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা ও মহেশ্বর বলে জানা দেখা ও পাওয়া যাবে।

প্রাকৃত জীবনে কামময় পুরুষের চাই-চাই খাই-খাই ভাবকে সংহৃত করে, চাওয়াটা বুঝে নিয়ে ঠিকমত চাইতে পারলে প্রাণময় পুরুষ জেগে ওঠেন। তাঁর জাগরণের অর্থ এককথায় বলতে গেলে জীবনে উল্লাসের স্ফূর্তি। তা থেকেই রস সৃষ্টি—"রসো বৈ সঃ।" সাহিত্য শিল্পকর্ম সঙ্গীত সবই জীবনের উল্লাস থেকে সৃষ্ট হয়, সবেতে তাঁর রসই প্রবাহিত। কাজেই জীবনের ভোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই তো! কিন্তু সে সবের উপরই ঈশনা থাকা চাই (mastery of circumstances)। সকল রকমের অঘটন ঘটনের মধ্যে জেগে থাকবে শুদ্ধ আত্মার নির্বিকার রাট্‌ত্ব। ভোগের বাধা

আছে কামপুরুষের আসক্তি ও অহন্তার স্ফীতির মধ্যে, এগুলি হল আসুরী ও রাক্ষসী বৃত্তি। এ সবগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক নবজন্ম লাভ করতে হয়। আমরা দেখেছি সাধনায় শিশুর মত হয়ে যেতে হয়, এ হল তা-ই।

পরম পুরুষের শৈশব কল্পনা করলে দেখতে পাই, তাতে ভোগও আছে ঐশ্বর্যও আছে। কিন্তু তিনি যেন বালক-স্বভাব, কিছুতে আঁট নেই। তাতে বাসনার ক্ষুদ্রতা ও অহংএর স্ফীতি থাকে না। "সাবিত্রী" কাব্যে দেবশিশুর বর্ণনায় দেখেছি শুদ্ধ প্রাণ-পুরুষের জাগরণকে। সে হল বালগোপালকে নিয়ে লীলা, যাতে সমস্ত কিছুই সাবিত্রী-দ্যুতিতে উজ্জ্বল করে নিতে হবে। এরই কাছাকাছি হল রসচেতনায় গন্ধর্বলোকের স্থান। তা থেকে রস নির্ঝরিত হয়ে সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে সম্ভবপর করে তোলে শিল্পে কলায় সাহিত্যে সঙ্গীতে। গন্ধর্বলোকেরও দুটি অংশ আছে, দেবগন্ধর্ব ও মনুষ্যগন্ধর্ব। বেদে 'সবিতাই' হলেন দেবগন্ধর্ব। উষার আলোয় জেগে উঠে বালসূর্য উদিত হলেন, এই হল বালগোপালের রূপরেখা। শুদ্ধ প্রাণময় এই পুরুষটি বোধির আশ্রিত, কিন্তু তখনও তার সম্পূর্ণ প্রতিরোধ হয়নি। "আমি তোমার", "মা যাব" এই অস্ফুট ভাব। এর পর কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে আত্মচৈতন্য গভীর হলে তটস্থ হয়ে নিজেকে জানা শুরু হয়। আর রসচেতনার সান্দ্রতায় রসবস্তু হয় রাসবস্তু। গোষ্ঠের পর যেমন দেখি গোপীচেতনাকে। নিজকে জানতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও আভাসে পেতে হয়। প্রেম গভীর হয়, কিশোর চিত্তের আত্মনিবেদন তিনি গ্রহণ করেন। "তুমি আমার" এই দাবীর প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন-ভর্তৃকার কর্তৃত্ব লাভ হয়। তারপর এই দাবীকে স্বীকার করে তিনি আমাকে যখন জড়িয়ে ধরেন, তখনই "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া...." সেই সমভাব পুষ্ট হতে থাকে। তাহলে আমি তাঁর তিনি আমার। আমিই তিনি—এইভাবে লক্ষ্যের দিকে রসচেতনায় আত্মচৈতন্যের পুষ্টিবর্ধন হতে থাকে।

সাধনার কথায় শ্রীঅরবিন্দ একটি করে ধাপ ধরে প্রকৃতি-পুরুষের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সবের মধ্যেই এই তত্ত্ব কেমন করে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সেটা দেখতে পাওয়া সহজ নয়। নিজকে পরিশুদ্ধ করতে বহু সময় লেগে যায়। সদা নির্ঝরিত সোমধারাকে পবমান করে রাখা হল প্রাণময় পুরুষের পরিশুদ্ধি। প্রাণ শুদ্ধ না হলে প্রজ্ঞার দর্শন সিদ্ধ হয় না। বাসনা আর সংকল্পের প্রভেদ বুঝে চলতে হবে। দুর্বলের চাওয়া সংকল্প নয়, তাই সে পায় না। চাওয়ার শক্তি হল ইচ্ছা (Will)—শক্তির (Energy) সেটা দিব্য রূপ। তার ক্রিয়া-সামর্থ্য আছে, সেই ক্রতুই হল সংকল্প। বেদে অগ্নি হলেন কবিক্রতু। অন্তরে অভীপ্সার আগুন জলে উঠল, আর ক্রান্তদর্শী কবিচেতনা পরিস্ফুট হল। তখনই বুঝতে পারা যাবে, কি চাই। চাতকের তৃষ্ণার মত একাগ্র সেই চাওয়া—অন্য আর কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই, তুষ্টি নেই। এইভাবে সকল চাওয়া একমুখ হলে হয় সঙ্কল্প, আর তখনই তাতে দেখা দেয় সৃষ্টিসামর্থ্য। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, God said, Let there be light and there was light. আমরা বাহিরে সেটার সিদ্ধরূপ প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও সত্য সঙ্কল্প অন্তরে সিদ্ধ হয়েই থাকে।

এই রকম করেই বাসনা রূপান্তরিত হয় সঙ্কল্পশক্তিতে। সেটা কামসংকল্প বর্জিত হলে হয় গীতার ভাষায় সমর্পণ; আর তখনই আসে সমত্বের বোধ। তাহলে এদিক থেকে পেলাম, বাহিরের বস্তুনির্ভর কামনা বাসনাকে আমল না দিয়ে তাতে বন্দী না থেকে অন্তরে সত্যসংকল্পে বজ্রশক্তির মত দৃঢ় হয়ে থাকা। বাহির থেকে বাধা যখন আসে, তাতে বিক্ষুব্ধ না হয়ে সহজভাবে গ্রহণ করা শিখতে হয়। মনের ঔদাসীন্য নিয়ে চললে জড়ত্ব এসে পড়ে, তাতে প্রাণ-পুরুষ স্তিমিত হয়ে যান, তাঁর সাড়া মেলে না। আবার বাহিরের সুখের সন্ধানে ছুটে প্রাণের উল্লাসে মত্ত হলেও চলবে না। এ থেকে গীতার অনাসক্ত যোগকে পাওয়া যাবে। বাহিরের ব্যবহারে ও প্রতিক্রিয়ার সমত্বের বোধ

রাখতে হবে—কোন ঘটনাতেই জড়িয়ে যেতে নেই। তাই বলে একেবারে নিষ্কর্মা (inert) থাকলে হবে না। অন্তরে যে সংকল্পের আগুন জ্বলেছে; বাহির থেকে তাতে রস জোগান হলে সেটা সহজ ও শোভনভাবে জ্বলতে পারে। তাই সুখদুঃখ প্রিয় অপ্রিয় সব কিছু থেকেই রসটুকু টেনে নিয়ে স্বাদ পেতে হয়—তাতেই চৈত্যপুরুষ জেগে থাকতে পারেন। বাউল গেয়েছেন—

"ত্রিভুবন জুড়ে তাঁর প্রেমের প্রকাশ
পরমা প্রকৃতি সেই প্রেমেতে উদাস
অন্তরে বাহিরে প্রেম, প্রেম ঘরে ঘরে
ভোগে প্রেম যোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে।"

শুদ্ধ প্রাণময় পুরুষটি এই ভাবেই তখন জেগে থাকেন, আর তাতেই হয় সত্যকার জীবনের স্বীকৃতি। তাহলে দেখছি, সাধনার ফলে আসক্তির ত্যাগ ও অহংএর নিবৃত্তি হয়ে গেলে এই আমিই তাঁর হয়ে যাবে। তাতে সুখদুঃখের আঘাতে বিরহমিলনের দোলায় শুধু যে অটুট থাকতে পারব, তা নয়, তা থেকে প্রাণপুরুষ রস আহরণ করে নেবে। জীবন হয়ে উঠবে "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"।

শিশুর মত সহজ ও সরল থেকে মনন করার ফলে আসবে ভাব; রামকৃষ্ণদেবের জীবনে সেই বালক-স্বভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিবেকানন্দ ধ্যানী ও প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে একটি বালকের ভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি আকুল হয়ে থাকতেন, "কখন তুমি ডাকবে?" এই সিদ্ধ অবস্থাতেও কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল আরও এগিয়ে চলা। কেননা এরও পরে আছে প্রকৃতির ঐশ্বর্যের দিক, শক্তির অক্ষয় সৌন্দর্যের ধারা। তাতে পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত ছন্দে কৈশোরলীলা চলতে থাকে। চৈত্যসত্তার জাগৃতি ঘটলে তাঁর আপনজন পরাপ্রকৃতিও সামনে এগিয়ে আসেন। এই

প্রকৃতি জীবভূত তাঁরই সনাতন অংশ—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। তিনিই চৈত্যের দিশারী। শৈশবে তো ঐ দিশারীর দিশায়ই চলে ছিলাম, কিন্তু কে চালিয়েছে তাকে দেখিনি, জানিওনি। দিব্য চক্ষু খুলে গেলে তবে তো তাঁকে দেখতে পাব। সে সময় বোধির ভূমি লাভ করলে পরে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (Pure Reason) ধীরে ধীরে স্ফুরিত হয়ে রজ তম এই দুই-এর মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বোধির সঙ্গে শুদ্ধভাবে মিলিত হতে পারে। তখনই বুদ্ধির ভূমিও সবটাই উজ্জ্বল ও অগ্র্যা হয়ে ওঠে। এই ভূমি লাভ করলে সাধনায় সাবালকত্বের বোধ (maturity of the soul) আসে। তখন আর পদে পদে বিচার করে চলতে হয় না। প্রতিভ-সংবিৎ আবির্ভূত হতে থাকে আর শুদ্ধ বুদ্ধি প্রতিভাত হয়। বিবেকজ জ্ঞান স্পষ্ট হয়। অন্তর থেকে অন্তর্যামীর চালনা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সংবিতের ভিতর দিয়ে ধরা পড়ে। এই অবস্থার কথাতেই রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে কিছুকাল সাধনা করলে পরে শুদ্ধমনই গুরু হয়। এ তো আর তর্ক বিচারে বোধগম্য হবেনা, শিশুর মত এক সবিশ্বাস জ্ঞান নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হয়। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, ছোট মেয়েটি বলছে যে কাল আমার দাদা আসবে। এ বলা কোন কিছুকে না জড়িয়ে কোন স্মৃতি অবলম্বন করে কিন্তু নয়, এ তার সিদ্ধ দর্শন। সেটা ফলবেই। সিদ্ধেরা যেটা ফলবে, সেটা বলেন। তাঁদের মনে মিথ্যা জাগতেই পারে না। ভবভূতি বলেছিলেন, "তখন বাককে অর্থ অনুসরণ করে।" বাকের সেই শক্তি আছে। কোন মতলব না রেখে দেখতে শিখলে ওই 'কন্যা কথয়তি…"-এর মত সত্য সরলভাবে বাক্ উচ্চারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন যে, সাধনা তখন করতে হয়না, তিনিই হাত ধরে নিয়ে যান।

এরপরে আরও গভীরে গেলে যাকে দেখা যাবে, তিনি হলেন অন্তর্যামী পুরুষ। পৃথিবীর অন্তরে থেকে তিনি তাকে ঘোরাচ্ছেন কিন্তু পৃথিবী তাঁকে

জানতে পারে না। সে হল এক চিরতারুণ্যের টলমলে সমর্থভাব—কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢোকার মত তাঁর শক্তির আয়তন, তাকে বহন করাই দায়। তিনি তো আর সহজে ছাড়েন না। একদিক থেকে সেটা একটা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। যোগের গতিতে সেটা গভীরের বোধশক্তির পরিণাম। সেখানে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যেতে হয়, সঙ্গে আছে ব্যপ্তির আনন্ত্য, আবার ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে তার তুঙ্গতার পরাকাষ্ঠা—সবগুলিকে মিলিয়ে এই বোধ। এর মধ্যে যে কোন দিকে ন্যূনতা থাকলে তা পূর্ণযোগ হবে না। তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যদি লক্ষ্য হয়, তিনিও পরিপূর্ণ করে ভরে দিতে চান। এ সবের প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখায় দিয়ে গেছেন। মহাজন সাধকদের অনুভূতির বিবরণেও এ সবের আভাস পাওয়া যায়। আধারে যেন এক ভূমিকম্প শুরু হয়। অলৌকিক আনন্দের ভার আর অপার বেদনাবোধকে একসঙ্গে বহন করাই হয় দায়। বারাহী শক্তিতে তল বিদীর্ণ হয়ে "আমি"র আবরণ একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে উড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই। এই দেহটাকে নিয়েও যে তিনি কি করেন, তাকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। এমনই তীব্র সেই আবেশ ও তার পরিণাম। শাস্ত্রে বলা হয়েছে জড় উন্মত্ত পিশাচবৎ সিদ্ধের অবস্থা। সে এক ভাবের পাগলের অবস্থা এসে যায়। বাহিরের কৃচ্ছ্রসাধন তো নয়, এ হল গভীরে তাঁরই তপস্যা। যে আধার নিয়ে তিনি তার বাঁধেন, তার ব্যাথা যে বড় বিষম। বিরহমিলনের দোলায় দুলছে সমস্ত সত্তা সমস্ত পৃথিবী, আর মন্থন চলছে আধারের সমগ্র বোধ নিয়ে। তাতে উঠে আসছে অমৃত, উঠে আসছে হলাহল দুই-ই। সিদ্ধ জীবনে সেই বিষামৃত পান করে অমর হতে হয়। আধারের জড় কণিকাগুলি পর্যন্ত আলোড়িত করে করে তাঁর চিন্ময় আসন তৈরী করা হয়। এই পিণ্ডই তখন হয় ব্রহ্মাণ্ড। তাই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সংস্কারসাধনে অবচেতনের অনেক পুঁজি কুণ্ডলিত শক্তিসমূহ বেরিয়ে পড়তে থাকে। তাদের শক্তিও মুক্ত হয়। এভাবে একের সাধনায়

বংশপরম্পরা অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। সেই মহাপ্রাণ শামুকের খোলে বহিয়ে দেন সমুদ্রের কল্লোল, শুক্তিকে করেন মুক্তার ধারক।

এই রকম করে অবচেতন (Sub-conscious), অধিচেতন (Subliminal-consciousness) ও অতিচেতন (Super-conscious) হয়ে যোগী পরা গতি লাভ করেও চলতে থাকেন। এ তো গেল সিদ্ধ সাধকের জীবনের দিক। যে কোন সূত্র অবলম্বন করে তখন আবার যোগীর দর্শনে বিশ্ব সব দিক দিয়ে খুলে যেতে থাকে। সিদ্ধ সাধক দেখতে পান, তাঁর মণিপুর তিনি জয় করেছেন, কিন্তু বিশ্ব (cosmic) মণিপুর তো এখনও বিজিত হয়নি। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুচৈতন্যে তাঁর সত্তার শক্তি মিলে তখন চলে আবার এক মহা-সংঘর্ষ, জগতের মূল বিরোধী-শক্তির সঙ্গে—এই রূপান্তরের যোগ (Yoga of Transformation)। অসিদ্ধ অবস্থায় প্রবর্ত সাধক ধারণাও করতে পারে না, তার পক্ষে সেটা কত ভয়াবহ হতে পারে। বুদ্ধের মার, শয়তান ইত্যাদি নাম দিয়ে বিশ্বব্যাপী বিরুদ্ধ শক্তিকে দেখান হয়েছে। অধিচেতনায় তাদের কায়েমী স্বত্ব অধিকৃত হয়ে রয়েছে। তাদের সমূলে পরাবর্তিত করে যে বিজয়, সেটাই অতিমানস লোকের ভূমি। সেখানে সব বিষই অমৃত, সব ছায়াই আলো। অতিমানসের শক্তিতে যুক্ত থাকতে হবে সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে আত্মসাৎ করে নিয়ে; পরিশেষে তাদের দিব্য রূপান্তর ঘটে যাবে।

তাহলে রূপান্তর-যোগের প্রথম ভাবনাতে পাব—"আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম"....। এই দেহই আত্মা আকাশ-শরীর ব্রহ্ম। প্রাণারাম ও মন-আনন্দ সেই সত্যাত্মতন্ত্রতে অন্বিত। "সাবিত্রী" মহাকাব্যে শ্রীঅরবিন্দ বৃহত্তর প্রাণ ও বৃহত্তর মনের বিকাশ ঘটিয়ে যেমন চিত্রিত করেছেন, সেইরকম ওই যোগ-তন্ত্রকে ঘিরেই বৃহতের পটভূমিকায় একদিকে প্রাণের তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়ছে উঠছে, অপর দিকে আবার জ্ঞানের সিদ্ধির তুঙ্গভূমির পরও তুঙ্গভূমির সুউচ্চ চূড়াগুলি দেখা দিচ্ছে। প্রাণের বিক্ষোভে অমৃত তরঙ্গও যে

জীবনের কূলে কূলে এসে উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে, তাকে গ্রহণ করাও সেই মহান্ সিদ্ধজীবনের দায়। শিবের মত নীলকণ্ঠ হয়ে, মন্থন-জাত হলাহলকেও অমৃতের শক্তিতে গ্রহণ করতে হবে, তবেই পূর্ণতা। তিনি যেমন বিশ্বের সঙ্গে, পূর্ণযোগীকে বিশ্বব্যাপারে সেই রকমটিই হতে হয়। এইভাবে অতিমানস-যোগে ব্যক্তি বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ লোকোত্তর—তিনটি অবস্থাকে একসঙ্গে নিয়ে পূর্ণ হয়ে পূর্ণযোগে চলতে হবে। অতিমানসের শক্তিসম্পাত ছাড়া তাই এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অধ্যাত্ম-সাধনার শৈশব কৈশোর পেরিয়ে নিত্য তারুণ্যের টলমলে দুর্বার শক্তি নিয়ে অতিমানসের ত্রি-পর্বা রূপান্তর ঘটিয়ে যিনি পৌঁছবেন, তিনিই হিরণ্ময় বিজ্ঞান-ঘন পুরুষ (Guostic Being) তিনি বিষ্ণুচৈতন্য তিনি যুবা, অতিমানস স্বরূপ শক্তির যুগনদ্ধ পুরুষ তিনিই। তাঁর সাবিত্রী শক্তির অবন্ধ্য প্রচোদনার জ্যোতিঃশক্তি ছড়িয়ে পড়বে পার্থিব জীবনের পরে, বিদ্ধ হবে তার মর্মমূলে,—দিব্যজীবনের ভাস্বর মহিমায় ঘটাবে তার রূপান্তর।

অতিমানস রূপান্তর লক্ষ্যে রেখে বিজ্ঞান-ঘন পুরুষের মহিমা ও প্রাপ্তি পর্যন্ত আমরা যজ্ঞকর্মের প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম। এই চরম অবস্থার পরম প্রাপ্তিতে প্রজ্ঞা প্রাণ ও প্রেমের মিলিত সমর্থ কর্মের সার্থকতা। ওই অবস্থা মনে রেখে কর্মযোগে হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। বিজ্ঞান-ঘন চেতনা লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই লোকায়ত হয়ে প্রাকৃত চেতনাকে আপন স্বভাবে রূপান্তরিত করবে, তাতেই পার্থিব জীবনের সিদ্ধি। অহংটিকে সমূলে উপড়ে ফেলে বাসনার ভারমুক্ত হয়ে সমর্পিত হয়ে চলা শুরু করেছি। শুধু নিজকে খুলে দিতে দিতে তাঁর কাছে লুটিয়ে পড়া—এইভাবে কর্মযোগের পূর্ণাহুতিতে ষোড়শকল সৌম্যপুরুষ এসে দাঁড়াবেন ষোড়শী তনুতে—তা-ই পূর্ণতা।

১৫

সদাচার ও স্বাতন্ত্র্য

ধর্মক্ষেত্র এই জীবনের কুরুক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞসাধনার প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম, পূর্ণযোগের সাধককে তার উপলব্ধ জ্ঞানসমূহ সেই একবিজ্ঞানে বিধৃত রেখে বিচার করে চলতে হবে। সেই অখণ্ড সমগ্রের জ্ঞান উপলব্ধি করতে না পারলে দেবরথ কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করে উত্তরায়ণের অধ্বর গতি লাভ করা যাবে না। সর্বব্যাপী অনন্ত সত্তার এক চৈতন্যে সমত্বকে বজায় রেখে কর্ম করার মূলে তাঁরই ইচ্ছা উল্লসিত হয়ে চলেছে, এটা বোধে আসা চাই। তা না হলে কর্মের আদর্শ আচরণ ঠিক করা যাবে না। কেননা কর্ম যে সকলকে করতেই হবে তা তো বোঝা গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্মের ভাল মন্দ কর্তব্য অকর্তব্যের বিচারও করতে হয়। সেই বিচার-বোধ দিয়েই মানুষ কর্তব্য কর্মের একটা আদর্শ গড়ে নেয়। সেই আদর্শ অনুযায়ী আচরণকে আমরা বলে থাকি ধর্মাচার বা সদাচার। আবার মানুষের মধ্যেই থাকে দেব-স্বভাব ও অসুর-স্বভাব। অসুর-স্বভাবেরা স্বেচ্ছাচারী। তারা তাদের কর্মপথে চলতে গিয়ে বাধা পেলেও প্রকৃতির পরিবর্তন করতে রাজী হয় না। কিন্তু মানুষের মনে আদর্শ-বোধ যখন উজ্জ্বল থাকে, তখন নিজের মধ্যে সে লোকোত্তরের আলো দেখতে পায় ও তার মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। তাই মহাপুরুষ দর্শন করে ও তাঁর বাণীতে বড় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন সে চলতে চায়, তখন সাধারণ ভোগ জীবনের উর্ধ্বে সে বিচরণ করে। কিন্তু সেই মহামানবের জীবন-বেদ অনুসরণ করতে গিয়ে সে যদি বাঁধা-ধরা এক প্রথামাত্রেরই দাস হয়ে পড়ে, তখন সে এক নৈতিক ধর্মের নিজেরই গড়া মোহ-জালে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। ধর্ম সদাচার এ তো চাই, না হলে চলবে না। কিন্তু সে ধর্মাচরণ

যদি যান্ত্রিক সীমাবদ্ধ এক নীতিতেই পর্যবসিত হয়, তা থেকে বৃহৎ হওয়া যায় না। তাই ধর্মের বন্ধন থেকেও শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে হয়। যে কোন নিয়ম, তা সে যত বড় আদর্শকেই বহন করুক না কেন, তা যদি চাপে পড়ে অনুকরণ করতে হয়, তাহলেই সেটা বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু সেই ধর্মের প্রেরণা অন্তরে অনুভব করে, তার আদর্শ অনুসরণ করে চললে ব্যক্তি হয় স্বতন্ত্র; প্রাকৃত ধর্মের নিয়ম তাকে আর তখন বেঁধে রাখতে পারে না। অন্তর্যামীর প্রেরণা তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে, তার গতি হবে আকাশ-বিহারী হংসের মত স্বচ্ছন্দ, আর তা হতেই সে তার স্বভাব ও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দ তাই যোগ-প্রস্থানে কর্মযোগের প্রসঙ্গেই সদাচার ও স্বাতন্ত্র্য (Standard of conduct and spiritual freedom) যে একই সঙ্গে অন্বিত, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কর্ম করতেই হবে, কর্ম না করে উপায় নেই। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানে আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞান এই তিন জ্ঞানেই সিদ্ধ হয়ে কর্ম করতে হবে, এ প্রসঙ্গ প্রজ্ঞার কর্মে আলোচিত হয়েছে। এই আমি বৃহৎ হতে চাই, আর তার আদর্শ হল ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। আমার চারিপাশে যে বৃহৎ বিশ্ব, সেখানে আমি ও বহুর সমাহার। আবার সব ছাপিয়ে উর্ধ্বের এক তত্ত্ব আমাকে ও বিশ্বকে একই সঙ্গে ধরে আছে, সেই উর্ধ্বের তত্ত্বকেই বলতে পারি ঈশ্বর। কেননা এই যে আমি আছি, জগৎ আছে, একই ছন্দে সমন্বিত হয়ে সবার সঙ্গে সব কিছু নিয়ে যে চলেছি, সে ছন্দের নিয়ামক কে? কার ঈশনায় সেই ছন্দ প্রবর্তিত, কার শক্তিতে তা বিধৃত? সে তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, কর্মে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। এমন করে অনন্তের বোধে বিধৃত থেকেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিশ্বের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে সান্ত সসীমের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। তাই আমি (আত্মা) জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিনের সমীকরণ হয় যে সমন্বয়ী অনুভবে, তারই তিনটি মুখ (aspect) প্রকাশ পেয়েছে তিনটি

মহাবাক্যে—"মদাত্মা সর্বভূতাত্মা", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। তখন ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মমহিমার বোধ স্ফুরিত হতে থাকে, তার পরিপাকে সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপী বিভুত্বের প্রকাশ ঘটে এবং "পরাঞ্চিখানি" এই ইন্দ্রিয় পথেও সেই মহিমাঘন ব্রহ্মজ্যোতিই বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই ভাবে অনন্ত সত্তা বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্ত বিশ্বদেবশক্তিতে যুক্ত হয়ে ব্যষ্টির মাধ্যমেই আবার কর্মে নেমে আসেন, তাতে তাঁর কর্মযজ্ঞ শান্তি সমৃদ্ধি ও অমৃত ফল দান করে।

আমরা জানি মন সান্ত খণ্ড দৃষ্টিতে অনন্তকে সীমিত করে। তাই সাধনার উদ্দেশ্য হল, সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ যাতে পরিবর্তিত হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগে পরাবিদ্যা দ্বারা অপরাবিদ্যাকে উদ্ভাসিত হতে দেখিয়েছেন। সেই বিদ্যার প্রয়োগে কাব্য সাহিত্য শিল্প দর্শন সবই দিব্য সৌন্দর্যের ধারক ও বাহক হয়ে থাকে। "সাবিত্রী" কাব্যে যোগের দর্শন ও বিজ্ঞান জ্ঞানের সব ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে সৌন্দর্য ও সুষমায় রূপায়িত হয়েছে এক মহান সঙ্গীতে। কবির প্রাতিভ-সংবিৎ মহান থেকে অণু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্র ও বস্তুর হৃৎকেন্দ্র উন্মোচিত করে দিয়েছে এক দিব্য মহিমময় উপলব্ধির আলোয়। সেই মহিমার বোধটি সাধককে লাভ করতে হবে, ভূমার আলোয় জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি উদ্ভাসিত করতেহবে। এই ভূমার সঙ্গে আবার আমার আছে এক প্রেমের সম্বন্ধ ; না হলে সেই বৃহতের মধ্যে আমার অল্প গলে যায় কি করে আর নিজেকে হারায় বা কি করে? তাই বলতে পারি অণু ও মহানের সম্পর্ক হল প্রেমের সম্পর্ক। চৈত্যসত্তা তাঁর প্রেমের যোগে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির শুদ্ধ চেতনা—শুদ্ধ শান্ত আমি। তার প্রথম ভালবাসা স্ফুরিত হয় কৈশোরে। সেই কিশোর চিত্তের ভালবাসা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সে আপন হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধতে পারে—"বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কি গো বিস্ময়!" এমনই সেই সহজ আবির্ভাবের শক্তি। এই কিশোর চিত্ত

নিয়েই অনন্ত-স্বরূপের প্রেমে অবগাহন করতে হয়, গলে যেতে হয়। এই ভাবে প্রেম ও জ্ঞান নিয়ে যে কর্ম তাতে বিশ্ব সমাজ আত্মীয় পরিজন কেউ তো বাদ পড়তে পারে না। কৈশোরের পরিপাকে আসে তারুণ্যের বল, আর তখনই জীবনে বীর যোদ্ধার ভূমিকা দৃঢ় হয়। জ্ঞানের ও প্রেমের বীর্যে কর্মের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় সমগ্রের ব্যাপ্তিতে ও চৈতন্যে। তাই জীবনের কুরুক্ষেত্রে সাধকের আচরণের আদর্শ হল সদাচার কিনা সত্যের আচরণ, আর বিশ্বের অন্তর্যামীর স্বতন্ত্র প্রশাসনেই তার স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা।

বিচার ও আচারে সমস্যা দেখা দেয় অহংকে কেন্দ্র করেই। যতই সাধক জ্ঞানের ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ করতে থাকে, ততই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। তার কর্মেও যে জ্ঞান ও শক্তি স্ফুরিত হয়ে চলেছে, তাও সে উপলব্ধি করে। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে তাঁকে জানলে বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু তবুও কর্মজীবনে নামতে গেলে কতবারই তালভঙ্গ হয়, ঠেকে শিখতে হয়। কেন না মানুষের মধ্যে সুখদুঃখের দ্বৈতবোধ থাকেই; শ্রেয় ও প্রেয়ের সংস্কার থেকে যা ভাল লাগে না, বা যা শ্রেয় বোধ হয় না, তাতে বিরক্তি আসে। এই ভাললাগা বা না লাগার দ্বন্দ্ব, একটা শিশুরও আছে। প্রথম দ্বন্দ্বই হল জীবন-বোধের দ্বৈত, বুদ্ধির ক্ষেত্রের বিচারণা থেকে বেছে নিতে হয় অশুভ থেকে শুভ, পাপ থেকে পুণ্য, প্রেয় থেকে শ্রেয়। দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব দেখা দেয় অনুভবের দিক দিয়ে, কোনটা ভাল লাগে, কোনটা লাগে না, কোনটা প্রিয় কোনটা অপ্রিয় বোধ হয়। মনস্তত্ত্বের এই সব সমস্যাংখুব গভীর এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সদাচার পালনে অনেক বাধা উপস্থিত হয়। জীবনের রীতি নীতি ও প্রীতি বিড়ম্বিত হয় তখনই, যখন দেখা যায় যেটা কল্যাণকর তাকে বিমথিত করে যে বিরুদ্ধ শক্তি, সেই অন্যায় সেই প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় কর্তব্য কর্ম কোনটা হবে, তা নিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়তেও হয়। কেন না বাহিরের দিক থেকে সমাজবদ্ধ মানুষের চেতনা বনের বাঘের চেয়ে উন্নত

হয়েছে, সে সোজাসুজি প্রতিপক্ষের ঘাড় মটকাতে পারে না। আবার এক সূক্ষ্ম ধর্মবোধও তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে। শিকাগোর ভাষণে বিবেকানন্দ "প্রতিবেশীকে ভালবাসতে হবে", এই নীতি নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে সেই ভালোবাসার ভিত্তিটা কোথায় হবে? প্রতিবেশীকে ভালবাসব, তার সর্বনাশই বা করব না কেন? তার মধ্যে ও আমার মধ্যে এক আত্মা, এই আত্মবোধ না জাগলে ভালবাসা থাকে কেমন করে? কাকে ভালবাসব? এ অবস্থায় ধর্মবোধ জানিয়ে দেয় এই ভালবাসাই ধর্ম, এটা কর্তব্য কর্মও বটে। মানুষ তার সহজাত সংস্কার নিয়ে বনের পশুর মত একার কথা শুধু ভাবেনি। তার পরিবার সমাজ দেশ ও শেষে সমগ্র বিশ্ব নিয়েই তার কারবার। এইভাবে তার মধ্যে ধর্মবোধ জেগেছে। যেটা আমি করব, সেটা আমার করা উচিত বলে আমাকে করতে হবে, এই শ্রেয়বোধ কর্তব্য কর্মের বিবেক জাগিয়ে তোলে। আমার খেতে ভাল লাগে বলে আমার খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি আর দশজনকে তার খাবার থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তখন আমার ধর্ম-বোধ বলে এটা ঠিক নয়। আবার আমার দাবী বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার অহং (ego)-ও জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। তখন ব্যক্তির সুখদুঃখের সঙ্গে সমাজের সুখদুঃখের সংঘর্ষ বেধে যায়। স্বার্থবুদ্ধিই প্রথমে মানুষকে অধিকার করে; তারপর স্ব বিস্তৃত হলে, স্বীয় প্রয়োজনেও মানুষ পরার্থপর হয়। শিশু খেলা করতে গিয়েও দলের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে শেখে। পরে আরও বড় হলে সে অহং ত্যাগ করতেও শিখবে—এই ত্যাগের বোধ থেকে যজ্ঞ-ভাবনা আসে। অধ্যাত্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে ভালবেসে ত্যাগের মহিমা মানুষ তখন উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নিয়ে তারপরেও আবার দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। সমষ্টির জন্য আত্ম-বিসর্জন নিশ্চয় একটা বড় ধর্ম। কিন্তু ব্যষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠাও ধর্ম। যে আত্মপ্রতিষ্ঠ, সে আত্ম-সচেতন হয়ে যখন আত্ম-বিসর্জন করতে পারে, সেই হল সত্যকার ধর্ম।

ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই অন্যোন্যনির্ভর। যুগে যুগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কখনও ব্যক্তিতন্ত্র কখনও সমাজ-তন্ত্র একটাকে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজই ব্যক্তিকে লালন ও পালন করে কিন্তু সমাজকে বেগবান করে ব্যক্তির উদ্বুদ্ধ চেতনা। এ যুগে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবাদ আর সমাজতন্ত্রবাদ এই দুটি মূল ধারণা নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেননা এখনও এ বিষয়ে দ্বৈত ও দ্বন্দ্ব রয়েছে মানুষের বুদ্ধিতে মানুষের মনে। সমাজতন্ত্রীর মতে ব্যক্তি সমাজদেহের একটি কোষ মাত্র। সমাজের দায়িত্বে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে স্ফুরিত করতে হবে ব্যক্তিতে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চান ব্যক্তির জন্যই সমাজ। শিশুকে যেমন বড় করতে গেলে তার স্বভাব ও স্বধর্মকে পুষ্ট করার সুযোগ দিতে হবে, তাতেই সে নিজকে ছাপিয়ে বড় হতে পারবে। কিন্তু তার ওপর শুধু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে তার স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হবে। ব্যক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলাই সমাজের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রবল হতে দিলে তখন ব্যক্তিতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে আবার বিরোধ বেধে যাবে। কাজেই মারামারি লাঠালাঠি বাদবিসম্বাদ বেড়েই চলবে, দুই মতের বিরোধে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই দুদিক দিয়েই বিচার করে সমগ্র মানব-জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে যে ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণই হল প্রকৃতির লক্ষ্য। ব্যক্তি ও সমাজের ঊর্ধ্বে তাদের ধরে রেখেছে সেই চৈতন্য এবং তার স্ফুরত্তার একটা ক্রম আছে। দেহের চেয়ে প্রাণে বেশী স্ফূর্তি, তার চেয়ে বেশী মনে, আর তার চেয়েও বেশী আত্মবোধে। তখন ব্যষ্টি আর সমষ্টি, ব্যক্তি আর সমাজে ভেদ-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিতে প্রসারিত হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত ও সব ছাপিয়ে লোকোত্তর বৃহৎ অনন্তের স্ফুলিঙ্গ; কাজেই যেমন জনগণের প্রতি সমাজের প্রতি তেমনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার প্রাণের দাবী। সে সবের প্রতিই দায়িত্ব আছে। এদেশের ধর্মশাস্ত্রে মানুষকে পিতৃঋণ ঋষিঋণ দেবঋণ সব

পরিশোধ করার নীতি গ্রহণ করে চলার বিধান দেওয়া হত। সমাজে থেকেই দেহ-প্রাণ-মনের ভূমির ভিতর দিয়ে চৈতন্যের ক্রমিক প্রসার ঘটিয়ে আত্ম-চৈতন্যের বিশ্বময় ব্যাপ্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রকৃতি-পরিণামের নিগূঢ় লক্ষ্য। সমাজ-ধাত্রী ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এইভাবে পুষ্ট করে তুলবে আর ব্যক্তিও যা পেয়েছে তার দশগুণ সমাজের পুষ্টির জন্য দিয়ে দেবে, যজ্ঞ-ভাবনায় ত্যাগ করবে। "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"—এই উদার বোধে ব্যক্তি আর সমাজের দায় একাকার হয়ে যায়। এই দৃষ্টি দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিই হল সমাজের পথিকৃৎ—সমষ্টির চোখে সে-ই আলো জ্বেলে দেয়, দৃষ্টি দান করে। Individual consciousnessকে তিনি বলেছেন Cosmic consciousness-র spearhead। এ খুব গভীর কথা, আর সেখানেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের সার্থকতা।

আমি বা আমার বোধ নিয়েই মানুষের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সূচিত হয়। আমি আছি এই বোধই সর্বাপেক্ষা প্রবল। আর কিছু চৈতন্য আছে কিনা জানি না, আমার বোধে যা কিছু আসছে ভাসছে উদ্ভাসিত হচ্ছে, তা থেকেই আমার জ্ঞান। শিশু জন্মগ্রহণ করে একটি অতি সুকুমার নমনীয় কাঠামো নিয়ে। তার পরিবেশ থেকে লোকাচার দেশাচার স্ত্রী-আচার ইত্যাদি অনেক রকম আচরণ সেই কাঠামোতে অনেক সংস্কারের ছাপ ফেলে। সে যদি একটা সদাচারের নিয়ম না পায় তাহলে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকলে কোন কিছুই দানা বাঁধতে পারে না। এ জন্য একটা শৃঙ্খলা চাই, একটা ছন্দ চাই। কিন্তু একটা যান্ত্রিক নিয়মের ভার যদি আবার তার' পরে শুধু চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে সমাজের ভিতর থাকলে দুষ্ট ক্ষতের মত আচরণ করবে, না হলে সমাজত্যাগী হয়ে অনধিকারী সন্ন্যাসী হতে চাইবে। কোন পথেই তার আত্মবিকাশ পূর্ণ হতে পারবে না। একটা

জমিতে চাষ করতে গেলে মাটিতেই বীজকে অঙ্কুরিত করতে হয়। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ভূমির উৎপাদনশক্তি ও বীজের অঙ্কুরিত হবার সামর্থ্যকে সার্থক করে তুলতে হয়। সেই রকম সমাজ বা গোষ্ঠী ব্যষ্টি-চৈতন্যকে স্ফুরিত করে, সেই সঙ্গে সমষ্টিচেতনাও পুষ্ট হয়। এইভাবে অভিব্যক্তির দিক দিয়ে দেখলে বুঝতে পারি সমাজ বা সমষ্টি-চৈতন্য হল সার্বভৌম সমতল (horizontal) চেতনা, আর ব্যক্তির চৈতন্য হল বর্ষাফলকের মত উর্ধ্বমুখ বা উল্লম্ব (vertical)। সাংখ্যের ভাষায় সমাজ যেন প্রকৃতি বা ক্ষেত্র তার অধিষ্ঠাতা পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারা শাসিত হয়েও আত্ম-চৈতন্যের আবেশে প্রকৃতিকে চিন্ময়ী করে তোলে। সাধারণত একটা নিয়মের আদর্শ যখন সমাজে প্রথাগত হয়ে ভোঁতা হয়ে পড়ে, আর সমাজ-চেতনা মূঢ় আচ্ছন্ন যান্ত্রিকভাবে সেটার আচরণ করে, আঘাত দিয়ে তার মূঢ়তা ভাঙে এক ব্যক্তিরই উচ্চতর চেতনা। একটি দুটি সচেতন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সমাজ-চেতনা দীপ্ত হয়ে ওঠে আবার স্তিমিত হয়ে যায়। আঘাত দিয়ে আবার তাকে দীপ্তিমান করে তোলে ব্যক্তিই, প্রথাগত নিগড় বিদীর্ণ করে তার সত্য প্রকাশিত হয় আর মালিন্য মুক্ত হয়ে তার আচরণও নব কলেবর ধারণ করে। সমষ্টি-চেতনাও তখন একটা উন্নততর পরিণতি লাভ করে, ক্রম-অভিব্যক্তিতে সমাজ এক পদ অগ্রসর হয়ে যায়।

সমাজ-সচেতনতা এখনও ব্যক্তির ধর্ম। সমাজের সব ব্যক্তি আত্মসচেতন হয়ে উঠবে, সে সিদ্ধি এখনও অনাগত। সেদিন যখন আসবে তখন ব্যক্তি আর সমাজের দ্বৈতও থাকবে না। আজকের দিনে সমাজের জনগণকে উন্নত করার ও জনমতকে প্রাধান্য দেবার জন্য নেতাদের ভাবনা ও গবেষণার অন্ত নেই। সেক্সপীয়র তাঁর "জুলিয়াস সীজার" নাটকে অপ্রবুদ্ধ জনমতকে উদ্বুদ্ধ করার বিপরীত দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যে উজ্জল চিত্রটি নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে উপস্থাপিত করেছেন, আজও সেই রীতিতেই সাধারণ মানুষ বা

জনগণ তাদের নেতাদের বাচনভঙ্গীতে বা উদ্দীপ্ত ভাষণে অভিভূত হয়ে পড়ে ও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ম করে থাকে। ওই দৃশ্যে রোমের অধিবাসীদের সামনে ক্রটাস্ সীজারের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করছে এই বলে—যে দেশের মানুষের জন্য, তাদের মঙ্গলের জন্যই সে তার প্রিয় বন্ধু সীজারকে গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এতে সে কারও কাছে অপরাধী হয়েছে কিনা এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জনতার একবাক্যে রায় হল যে, না কেউই তা মনে করছে না। কিন্তু এই ভাষণের অল্পক্ষণ পরেই সিজারের মৃতদেহ নিয়ে মার্ক অ্যাণ্টনীর প্রবেশে মৃতুশোকের যে ছায়া পড়ল, তারপরে অ্যাণ্টনীর ধীর যুক্তিপূর্ণ ভাষণ শ্রোতাদের এমনভাবেই মুগ্ধ করে দিল যে তারা সীজারের গুণাবলী ও অপ্রতিহত ক্ষমতা স্মরণ করে তাঁর হত্যাকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে উন্মত্ত ও উচ্ছৃখল হয়ে উঠল। সীজারের মহিমা তারা উপলব্ধি করে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করতে আবার প্রবলতর বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। উচ্ছৃঙ্খল জনগণকে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করার জন্য ও শিল্পসংস্থাতে দলগত সাফল্য (team-work) কার্যকরী করে তুলতে এখন অনেক চেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখা গেছে ত্রিশ জনের বেশী হলে একটি দল আর কার্যকরী হতে পারে না। সমষ্টির চাপে ব্যষ্টির গতি হয় নীচের দিকে। গণচেতনা তখন আর গণেশের চেতনায় বিধৃত থাকতে পারে না, তার বাহন মূষিকের চেতনায় নেমে যেতে চায়। সমষ্টির চাপে ব্যক্তির চেতনার অধোগতি নিরুদ্ধ করতে না পারলে আত্মার মহিমাকে খর্ব করা হয়। সমাজ-চেতনা যখনই এইরকম করে নীচের স্তরে তলিয়ে যেতে চায়, তখনই এক ব্যক্তি (individual) নেতা বা দলপতিরূপে আবির্ভূত হন। তাঁকে সকলে মেনে চলে এবং সমাজের দায়িত্ব পড়ে ঐ ব্যক্তি-চৈতন্যের 'পরেই। সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভবও হয়েছে এইরকম করে। সমাজচেতনা তার মতেই সায় দিয়ে চলে বা চলতে তাকে বাধ্য করা

হয়। সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা নেতাকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সেই ব্যক্তির চৈতন্যে বিশ্বচৈতন্য প্রভাসিত হয়। রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাণী ও স্পর্শ দিয়ে যেমন 'চৈতন্য হোক' বলে জনে জনে চেতনার আলো জেলে দিয়েছিলেন ফুল ফোটানোর মত করে। সেইরকম করে প্রতিটি ব্যক্তি-চৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মহান নেতাকে অনুসরণ করবে। তা যখন সম্ভব হবে তখন আচ্ছন্ন মূঢ় ও ঘোর গণচেতনা অন্ধ তামস থেকে আলোয় উত্তীর্ণ হবে। সেখানে ছলনা জুয়োচুরি রেষারেষির স্থান কোথায়? ভারতের ধর্মপ্রবক্তাগণ তাই সমস্যার সমাধান করেছেন এই ভাবেই। প্রতিটি জীবকে অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় তুলে নিয়ে প্রবুদ্ধ মানবসমাজ গড়ে উঠবে। মহামানব যখন জাতির পুরোধা হয়ে আসেন, তখন তিনি বর্শা-ফলকের মত সুতীক্ষ্ণ তাঁর ক্রান্তদৃষ্টি ও মনীষা দিয়ে দীর্ঘকালের সঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণ বিদীর্ণ করে বিশ্বের উর্ধ্বগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, অজ্ঞানের চাপে তাকে একেবারে তলিয়ে যেতে দেন না। মানব জাতির সমগ্র চৈতন্যের 'পরে সেই তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের আলোর ছটা সমাজ-চেতনাকে এক স্থায়ী দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই সমষ্টি-চৈতন্যকে মান দিতে গেলে প্রতিটি ব্যষ্টিকে চৈতন্যের ঐ ভূমিতে তুলে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করতে হবে। তখন সকলের মুক্তি হলে তো কথাই নেই। ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নকে রূপায়িত করতে অপ্রবুদ্ধ সমষ্টিকে ব্যষ্টি-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর তাই হবে অতিমানস শক্তির অবতরণের ভূমিকা। একজন প্রবর্ত পুরুষও যদি সেই শক্তির ধারক ও বাহক হয়ে তাকে নামিয়ে আনতে পারেন, সর্বমানব বা সমগ্র মানবজাতি তাতে ক্রমে উন্নীত হতে পারবে। প্রতিটি ব্যক্তি-চৈতন্যে তার ক্রিয়া হবে। তাই মহাপুরুষ তাঁর সাধনার সিদ্ধিতে যখন এইভাবে শক্তি-সঞ্চার করে দিয়ে যান, তখনই সমষ্টিচেতনা সেটা সচেতন ভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রতিটি আধারে চেতনার সব স্তরেই তার শক্তি স্ফুরিত হতে থাকে,

কয়েকটি ব্যক্তির গোষ্ঠী বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কিছু কিছু প্রাণকেন্দ্র তার মর্ম বুঝতে পারে ও ক্রমে ক্রমে ব্যাপক ভাবে তার সচেতন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

তাহলে দেখতে পেলাম সদাচারের আদর্শ মোটামুটি চারটি আছে, বলা যেতে পারে। প্রথম আদর্শের নিয়ামক ব্যক্তি ও তার স্বার্থ, দ্বিতীয় আদর্শ সমষ্টির হিতকল্পে সামাজিক নিয়ম, তৃতীয় আদর্শ অন্তরের ধর্মবোধ থেকে বিবেক ও বিচার, আর সর্বশেষে বলা যায়, সর্বভূতের অন্তর্যামীর প্রশাসন। সেখানে সদাচারের মূলভিত্তি সমাজের অনুশাসনও নয়, ধর্মের অনুশাসনও নয়। প্রাকৃত মানুষের কাছে স্বার্থসিদ্ধিই আগে, পরার্থপরতা আসে তার পরে। পরার্থপরতায় তার চেতনা অহংএর সঙ্কোচ থেকে খানিকটা মুক্তি পায়। ব্যক্তির অহং প্রসারিত হয় সমাজের অহংএ, দেশের অহংএ, এমন কি বিশ্বমানবের অহংএ। তা থেকে আবার এক নতুন ধর্মবোধের সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক কালে যার নাম মানবতাবাদ (humanism)। কিন্তু মন যদি জীবনের আদর্শ নিরূপণের ভার নেয়, তাহলে যে-কোনও আদর্শের অনুশীলনকে একান্ত করে তোলে। কোন আদর্শই নিরর্থক নয়, কিন্তু তাই বলে যতই কল্যাণকর আদর্শ হক না কেন, তার একটা মনগড়া খোপে জীবনকে পুরে দিলে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হয় না। জীবনের একটা দিকের বিশেষের প্রতি নজর দিতে গিয়ে গোটা জীবনটা বাদ পড়ে যায়। কেন না মনের দৃষ্টিতে অখণ্ডকে দেখা সম্ভবও নয়। তার জন্যেই যেতে হবে মনের উজানে অতিমানসভূমিতে, যেখানে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়েছে এক পরম সৌষম্যে। খৃষ্টানদের দশটি নৈতিক আদেশ, বৌদ্ধের শীলপালন, মনুসংহিতার নির্দেশ ইত্যাদি সব দেশের শাস্ত্র থেকেই মহাপুরুষের আচরণ বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যে বাণীরূপ গ্রহণ করেছে, সাধারণ মানুষ সেগুলিকে ধর্মজীবনের সদাচারের আদর্শ বলে মেনে নেয়। কিন্তু সে প্রথা যদি প্রাণহীন আচার-সর্বস্ব হয়ে স্বার্থকে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ না হয়, মানুষের বুদ্ধি তাতে বিড়ম্বিত

হয়। একনায়কের একচ্ছত্র সংবিধান এইরকম জনগণের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে অনেক সময় তাকে প্রাণহীন কাঠামোতে পরিণত করে, আর তা থেকে আসে মহতী বিনষ্টি। সেই কারণেই আচরণকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে আত্মার মহিমাবোধে তুলে নিতে না পারলে একদেশী দর্শনের সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে যে সব মহৎ ভাব আছে, ন্যায়বিচার বিবেক ভালবাসা সত্য বীর্য পরার্থপরতা—এগুলি সব বোধে পেয়েও বলতে বা আচরণ করতে নিজের মনোমত এক ছাঁদে পরিণত হতে পারে। আচরণের এ সমস্যা অবশ্যই দেশাচার লোকাচার এর চেয়েও জটিল বা উর্ধ্বস্তরের সমস্যা। ন্যায় অন্যায়ের বিচার এখানে ব্যক্তি আর তার সংসার ও সমাজেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, বৃহত্তর মানব-সমাজ নিয়ে গোষ্ঠী গঠন করে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পর্যন্ত এখানে গ্রহণ করতে হয়। তাই একদিকে বৃহৎকে লাভ করে অপর দিকে সমাজের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে অনুশীলন করে যে মহামানব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনিই জনগণের কল্যাণ ও সমাজ রক্ষার গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারেন।

কিন্তু প্রায় মানুষের মধ্যেই ধর্ম ও নীতি বিগর্হিত বহু রকমের আচরণ, সেগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না; পরস্পরের সঙ্গে আচার ব্যবহারে সেখানে ঠেকে যেতে হয়। আমাদের মধ্যে ধর্মনীতিবোধের ধারণা (ethical ideas) থেকে আমরা সুন্দর ধর্মপরায়ণ মানুষকে দেখে ও তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সহজেই তার বিধান মেনে নিতে পারি। কিন্তু সৌর কলঙ্কের মত ও চাঁদের কলঙ্কের মত মানুষের অবচেতন ও অচেতন গহ্বরে যে-সব জট পাকিয়ে থাকে, তাদের নিরাময় করার শক্তি লাভ না করা পর্যন্ত মহাপুরুষের বাণীই হক, আর দেশনায়কের নেতৃত্বই হক, তা মানুষের চেতনাকে সমগ্রভাবে যথার্থ উন্নতি এনে দিতে পারে না। মহাপুরুষের উদার দৃষ্টিতে মানুষের সবটাই যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন চেতনার প্রতিটি স্তরের সিদ্ধ ও অসিদ্ধ দুদিকই তাঁর কাছে খুলে যেতে থাকে। তাই যোগসাধনার শুরুতেই আচার-

বিচার শুদ্ধির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, এই রকম নির্দেশ যেমন থাকে ; সে শুদ্ধীকরণের প্রয়োজন শুধু মাত্র মন ও বুদ্ধির স্তরে আবদ্ধ থাকে না। পাপ ও পুণ্য, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, ধর্ম ও অধর্ম এইভাবে সাজিয়ে সব সময় তার বিচার করা চলে না। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ সর্বদাই এই সব সমস্যার সমাধানে অধ্যাত্মবোধের সমগ্র ভূমি উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। মানসিক শিক্ষা ও আদর্শ নৈতিক আচরণে মানুষের চেতনার শুদ্ধি সম্পূর্ণ হতে পারে না। আচারের ভাল-মন্দ নিশ্চয় আছে, কিন্তু সে ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে। যাতে দিব্যচেতনার উন্মেষ হয় তাই ভাল, আর যাতে সেটা বাধা পায় তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। একেবারে চরমে না পৌছানো পর্যন্ত একটা দ্বন্দ্ব থাকেই। অবশেষে লোকোত্তরে উত্তীর্ণ হয়ে উদাসীন ভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বাতীত হতে হবে। সে অবস্থায় "ন পুণ্যং পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং....", আর তখনই দ্বৈতের মালিন্য থেকে মুক্তির কৌশল আয়ত্ত হবে। এর অর্থ এ নয় যে বেপরোয়া পাপাচরণের অপরাধ রইল না। পুণ্য দিয়েই পাপাচরণকে নির্জিত করতে করতে এগিয়ে যেতে হয় ও তারপরে বিজয় সম্পূর্ণ করতে পুণ্যের সংস্কারও বর্জন করতে হবে। এই শিবচেতনায় অধিষ্ঠিত হতে না পারলে রাষ্ট্রনেতা বা সমাজের নেতাও মানুষের পথ প্রদর্শক হয়ে তাকে আলোর পথে নিতে পারবেন না। উপনিষদের মধ্যে আমরা বহু আখ্যান পেয়েছি যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করেও ঋষি নেমে এসেছেন ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কাছে, জগৎজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য। আচরণের চতুর্থ ভূমিতে এই আদর্শ রাখা হয়েছে। চেতনা সেখানে স্বচ্ছ, সর্বভূতাধিবাস কর্মাধ্যক্ষের প্রশাসনে সমর্পিত হয়ে ব্যক্তি তার স্বভাব ও স্বচ্ছন্দ অনুযায়ী আচরণ করে তার কর্মে। যোগের ভাষায় সে হয় "ধর্মমেঘ"—অর্থাৎ যা সে ঢেলে দেয় তাই ধর্ম, সেখানে অধর্মের আভাসটুকুও থাকে না। কিন্তু সে ধর্মকে কোনও লোকধর্মের

ছাঁদে ফেলা যাবে না। কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রচোদিত করতে তার বুদ্ধিকে যেখানে তুলে ধরলেন, সে ওই দ্বন্দ্বাতীত যোগভূমি। তাই গীতার ধর্মনীতি অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন হলে সবাইকে মেরেও মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ মানবধর্মের ওপরেও আছে ভাগবত ধর্ম। সে ধর্ম একদিকে ব্যক্তি-স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে, অপর দিকে বিশ্বের গতিচ্ছন্দ অনুবর্তিত করে। এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সনাতন ভারত ধর্ম ও সদাচারের আদর্শ বুঝতে হবে। এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীর মূল ভিত্তি হল "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ব্রহ্মই সব হয়েছেন। তাই পাপ ও পুণ্য প্রবৃত্ত ও নিবৃত্তি এই সব দ্বৈতবোধের ধারক তো তিনিই। এ থেকে আমরা বলতে পারি ভগবানই ভাল ভগবানই মন্দ হয়েছেন (God is good, God is bad); তা থেকে সিদ্ধান্ত হল, ভগবান ভালও নয় মন্দও নয়, (God is neither good nor bad)। সেই অবর্ণ সমত্বের বোধ হয়ে সবই ধরে আছেন তিনি।

শ্রীঅরবিন্দ অবিদ্যার মূল (origin of evil) দেখাতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ওই দ্বৈতবোধ হল মানব-চৈতন্যের মাঝে মধ্যবর্তী এক অবস্থা মাত্র। অচেতনেও দ্বৈতবোধ নেই আবার পূর্ণচৈতন্যের মহিমা অদ্বৈত-বোধেই প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা ও অবিদ্যার টানাপোড়েনে অবিদ্যাকে বিদ্যায় রূপান্তরিত করবার যে ধারা (process) প্রকৃতিতে স্ফুরিত হয়ে চলেছে, তারই মাঝে "ব্যক্তমধ্য" মানুষের চিত্তে এই দ্বৈতের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। কিন্তু সেই দ্বৈতকে পূর্ণ অদ্বৈতবোধে মুক্তি দিতে হবে, তবেই তার সার্থকতা। যেমন আমরা দেখেছি কাঠে আগুন ধরলে প্রথমে ধোঁয়া গ্যাজলা এ সব বেরিয়ে দৃষ্টিও আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, আবার আগুন প্রথমটা জলে নিভে যেতে চায়। কিন্তু কাঠের সব ময়লা ও জলীয় অংশ বেরিয়ে গিয়ে শুষ্ক কাঠ যখন অগ্নিময় হয়ে জ্বলে ওঠে, তখন সেই অগ্নিদাপ্ত কাঠ আর আগুনে তো কোন প্রভেদ দেখতে পাই না। এই রকম প্রতিটি জীবের মধ্যেই তো চিদগ্নি

ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে চৈত্যসত্তা বীজভাবে নিহিত রয়েছে এইভাবেই। তাই শুষ্ক কাঠের মত দেহপ্রাণ মন সবটাই অগ্নিঘাত্ত হয়ে প্রজ্বল হয়ে উঠবে ভর্গজ্যোতিতে। প্রেম দিয়ে জ্ঞান দিয়ে শক্তি দিয়ে সেই অগ্নি-সত্তার বীজকে অঙ্কুরিত করে, সমগ্র সত্তাব্যাপী চিদগ্নিময় বোধকে বহন করে চলতে হবে। এই হল চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ; এতে প্রয়োজন হলে অনেক কিছু বিনাশ করতেও হবে। তখন পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় চরম সত্তার মহিমাতে। সেখানে দ্বৈতবোধ নেই, কাজেই ঘৃণাও নেই। সেই অদ্বৈতবোধ থেকে দ্বৈত ও তা থেকে বহুকে নিয়ে আচরণ করবার শক্তি পূর্ণ হয়। সে আচরণে অনেক সময় আঁকা বাঁকা পথে চলে শঠের সঙ্গে শাঠ্য ও স্পর্ধিতের প্রতি বিদ্রোহ করে চলতে হয়। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের সঙ্গেও যুদ্ধ চালাতে তাঁরই হাতের যন্ত্র নিমিত্তমাত্র হয়ে যেতে হয়। সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বুদ্ধির চালক ও সারথি হয়েও দুর্যোধনের বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষীও তো তিনি; "ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব"—তাঁর হাতে পূর্বেই নিহত হয়ে আছে তারা সব।

অতিমানসের নীতিধর্ম (Supramental ethics) বুঝতে আমাদের গীতার ওই যোগকৌশল কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। আজকের দিনেও কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাপপুণ্যের দোলায় বারবার নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কালাগ্নি রুদ্রের চরণে আহুতি দিতে হয় জীবনের সব-কিছু অশিবকে নির্মম হয়ে। তখন সেই জীবন ও মরণের দ্বৈতকে পেরিয়ে অমৃতকে ছিনিয়ে আনার বীর্য লাভ হবে। সেখানে শিব এবং কেবলম্—সেই এক জগদীশ্বর, আর তার বিভূতি হল এই জগৎ। কাজেই কি ব্যক্তি কি সমাজ কি রাষ্ট্র, সকলেরই চালক তিনি। আমার কর্তব্য কর্ম ধর্ম সদাচার পরস্পর-বিরোধী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিলেও তখন বুঝতে পারব অন্তর্যামীর পরিচালনা।

"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—

এই হল সেই চরম সন্ধিক্ষণের গভীর মর্মবাণী এর অর্থ হল, "আমি জানি ধর্ম কি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই ; আমি জানি অধর্ম কি, কিন্তু তা থেকেও আমি নিবৃত্ত হতে পারছি না। হে আমার হৃদিস্থিত হৃষীকেশ! তুমিই যে আমাকে কর্মে নিযুক্ত করে নিয়ে চলেছ।" এই রকম করে ধ্যানে ও কর্মে তাঁরই ইচ্ছাকে ঠিক মত অনুসরণ করতে পারলে তবেই ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে পরম একত্বে স্থিত হয়ে বুঝতে হবে উত্তমকে, শ্রেয়কে। উপনিষৎ বলেন, সেই পরম সত্যকে যে দেখেছে তার জ্যোতিও অম্লান। ভালমন্দ পাপপুণ্য এ সব দ্বন্দ্ব-বোধের ওপরে তিনি অবস্থিত, তাই দ্বৈতবোধ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে সবের মধ্যে থেকেও একত্বেই থাকে।

এ এক বিপজ্জনক অনুশাসন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই শুদ্ধিসাম্যের অবস্থা আসবে সাধনার পরিপাকে। সাধনার শুরুতে ধর্মাচারণ না করেই সেটা ছাড়া যায় না। মানুষের অনেক রকম প্রবৃত্তি থাকে, যাকে ধর্মাচরণ দিয়েই রুখে দাঁড়াতে হয় ; কেন না সেসব বৃত্তি মানুষের পরম অনিষ্টকারী অকল্যাণকর। কিন্তু দেখা যায় ধর্মাচরণ অনেক সময় যেন একটা বন্ধন হয়ে পূর্ণকে আড়াল করে রাখে। অনন্তের পথিককে কোন বাঁধনেই তো বেঁধে রাখা যায় না। তাই জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন পূর্বজীবনের ধর্মাচরণ সব ফেলে দিয়ে উত্তর জীবনে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ ধর্মের সদাচার প্রসঙ্গে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুশাসন আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে অষ্টাদশ পর্বের যোগ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সমূহ উপদেশ বিশ্বরূপ দর্শন সব করিয়েও শ্রীকৃষ্ণ শেষে বলেছেন—"সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—", কিনা

"সব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ কর"। এই ধর্ম ছাড়ার অর্থ হল এই ভগবৎশক্তিতে সম্পূর্ণ সমর্পিত অথচ এক স্বাতন্ত্র্যবোধ, তার নিজের কর্মফলে আর তখন নিজের দায় থাকল না। রামপ্রসাদের গানও এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে হয়, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি"।

পথ চলতে প্রাণের তাগিদে এগিয়ে চলার সময় ধর্মের বন্ধনও যে ভেঙে ফেলতে হয় বলা হল, এটা কিন্তু খুব সহজে হতে যায় না। এ নিয়ে অনেক সমস্যাও দেখা দেয় যে কোনটা ধরি আর কোনটা ছাড়ি। তাই বিশেষ একমুখী লক্ষ্যের 'পরে ঝোঁক দিয়ে সাধককে অনেক সময় যে আঁকাবাঁকা ভাবের শাখানদীগুলিকে গুটিয়ে এনে প্রাণের স্রোতে ফেলে দিতে হয়, পরিণামে সেই সংস্কারগুলিই আবার দেখা দেয় অন্যভাবে। চিত্তে নির্বেদ এসে এক অবর্ণের অবস্থা এসে গেল, তখন সব পানসে লাগে আর কর্মে কোন স্ফূর্তি থাকে না —এমন ভাব আসতে পারে। অহং কুণ্ডলী পাকিয়ে তখন যেন বলতে চায় 'আমার কোন দায় নেই, কোন কর্ম নেই।' এই কুণ্ডলীকে তীব্র আঘাত হেনে সত্তার গভীরে অন্তর্দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখতে পারলে বোঝা যাবে যে, কর্ম করছিলাম যে আদর্শ নিয়ে তাতে আমার মনগড়া একটা উদ্দেশ্য ছিল, আর তাতেই ঠেকে গেছি। মনের সেই মৎলবই আমার সদাচারকে ধর্মের আবরণ দিয়ে রেখেছিল। সেই আবরণটি খসিয়ে ফেলতে হবে, তখন দেখা যাবে ধর্মপথের লক্ষ্যে পৌছতে পথ আর গন্তব্য এক হয়ে গেছে। সেখানে ব্যষ্টির ধর্ম সমষ্টির ধর্ম সব উত্তীর্ণ হয় আর এক পদবীতে, আর তাই হল ভাগবত ধর্ম। সেই ভাগবত ধর্মকে বুঝে নিতে পারলে তখনই স্বধর্ম ও সদাচার পালন করা যায়। সচ্চিদানন্দের সৎ ভাব ধরতে পারলে বুঝতে পারব, কর্ম করতে পারি কিন্তু কর্মফল আমার হাতে নেই, তার দায়িত্বটাও আমার নয়। তখন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা সহজ হয়, চিত্তে নির্বেদ আসে, অহং প্রসারিত

হতে থাকে ও মন মুক্ত হয়। সৎ কর্মও যখন আমরা গ্রহণ করি, তখন প্রথমে ভাল মন্দের দ্বৈতবোধ থাকেই। শ্রীঅরবিন্দ এখানে দেখিয়েছেন যে, কর্ম করারও স্তর ভেদ আছে। মন্দ বা অসৎ থেকে ভাল বা সৎ-এ যেতে কর্মই তো পথ। এইভাবে জড় থেকে চৈতন্যের অভিযান চলেছে বলেই আমাদের প্রকৃতিতে প্রথম দিকে দৃষ্টি থাকে মোহাচ্ছন্ন, আর সেই কারণেই কর্মের ভালমন্দের বোধচিত্তকে আলোড়িত করে মথিত করতেই। কিন্তু এই মন্থনের ফলে কর্মও ক্রমশ পরিশুদ্ধ হতে থাকলে দেখা যায়, চৈতন্য লাভের উদ্দেশ্যেই কর্ম এবং সে কর্মও স্তরে স্তরে উন্নীত হয়ে চলে যোগকর্মে।

আচরণে বা কর্মে শক্তিই প্রকাশিত হয়। মানুষের স্বরূপশক্তি হল চিৎশক্তি। পূর্ণযোগীর আচরণে সেই চিৎ-শক্তিই বিচ্ছুরিত হবে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও প্রেমের শক্তিতে। তাই বাইরের অনুশাসনের কোন আড়ষ্ট আচরণের ছকে তিনি বাঁধা পড়েন না। অন্তর্যামীর প্রশাসনে স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে তাঁর গতি হয় নিরঙ্কুশ। কেন না তখন তো আর নিজের ইচ্ছা আলাদা বলে কিছু থাকে না—সমস্তই তাঁর ইচ্ছা। বিশ্বের মূলে রয়েছে পুরুষোত্তমের সত্যসঙ্কল্প আর সেই সঙ্কল্পের বাহন হলেন পূর্ণযোগী। তিনি আত্মাকে জানেন, জানেন বিশ্বেশ্বরকে আর সেই সঙ্গে বিশ্বকে জেনে জানেন তাঁর স্থান কোথায়, তিনি বিশ্বেশ্বরের কোন সঙ্কল্পের বাহন? বিশ্বের ধারা ধ'রে চলে তখনই মানুষকে সত্যকার সাহায্য করা সম্ভব হয়, মানুষকে সত্য করে ভালবাসাও সার্থক হয়। সকলকে চৈতন্যের আলোয় জ্বালিয়ে দিয়ে দিয়ে চলা—তাতে অন্তরের প্রেম উথলে উঠে সব কিছু বিরোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে অবস্থায় জগাই মাধাই মহাপুরুষকে আঘাত করেও উদ্ধার হয়ে যেতে পারে।

একজন সিদ্ধসত্তাকে কেন্দ্র করে আবার গড়ে ওঠে একটি দিব্যসঙ্ঘ। সঙ্ঘ অবশ্যম্ভাবী সত্যযুগ-চেতনার হিরণ্যগর্ভ দিব্যবিগ্রহ, ব্যক্তি সেই বিগ্রহেরই

একটি চিন্ময় কোষ। এই অনুভব থাকে অতিমানস কর্মের ভিত্তি রূপে, আর পূর্ণযোগীর আচরণ হবে তারই অনুগত। তার ভাবনায় বেদনায় এবং আচরণে তখন বৃহৎ সত্যসঙ্কল্পের প্রকাশ। তাই বৃহতের সত্যসঙ্কল্প বা ব্রহ্ম-সঙ্কল্পকে (Supreme Will) জীবনের কর্মে ধরতে পারলে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে ব্যক্তি হয় স্বতন্ত্র, আর তার সদাচারের আদর্শ সব কর্মে ফলিত হয়ে সকলকে যুক্ত করে অন্তরের সত্যধর্মবোধে।

১৬

ব্রহ্ম-সঙ্কল্প—ত্রিগুণা প্রকৃতি

কর্মযোগের প্রসঙ্গে দেখলাম, দিব্যসঙ্কল্পকে জীবনের কর্মে ধরতে হবে এবং তা থেকে দিব্যকর্ম সংঘটিত হবে আর সাধকের হবে দিব্যজন্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্ম-সঙ্কল্পকে জীবনের কর্মে ধরা তো সহজ কথা নয়। নিষ্কাম কর্ম আরম্ভ করে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়েও পদে পদে ধরা পড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার (Supreme Will) সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরোধ কতখানি। কত অনুতাপ ক্ষোভ বিবেক-দংশন ইত্যাদিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও এই মলিন আমির আবরণটি খসতে চায় না। তাই গীতার উপদেশ মত অকর্তার ভাব নিয়ে চলতে পারলে ইচ্ছার দ্বৈতবোধ থেকে মুক্তি ঘটে। আমার আমিকে সমূলে বিনষ্ট করে কর্মে অকর্ম আর অকর্মে কর্ম, এই রকম করে যে দেখতে শিখেছে, সেই হল কৃৎস্নকর্মকৃৎ। আর এই হল কর্মের মূলে কর্মকর্তার যে সমগ্রবোধ (total view)—তাই। গীতায় এই কর্মের পরিণত ভাবটি নিজের মধ্যে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন···ইত্যাদি। তিনলোকে আমার কর্তব্য বা করার মত কিছু নেই।" তবুও কর্ম করছি, না হলে কর্ম লোপ পেয়ে, জীব উৎসন্নে যাবে—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ। ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্····" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ভগবান তাই অকর্তার কর্ম করে দেখালেন। যাতে যুদ্ধ না ঘটে, সে চেষ্টাও করলেন; তারপর যুদ্ধ ঘটিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। এ থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করা যায়। তিনি অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন যে প্রকৃতিই সব কিছু করে চলেছেন, তোমার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে যে বিপুল কর্মতরঙ্গ, তা দিয়েই প্রকৃতি কর্ম করিয়ে নেবেন। এইভাবে দেখতে শিখলে ও পরে অহংকে সরাতে পারলে নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস

সহজ হয়। কর্তাও যেমন আমি নই, কর্মও তেমন আমার নয়। যে কর্ম এসে পড়েছে, তাকে গ্রহণ করেছি, করে চলেছি। এ থেকে কর্মে উল্লাস আসে। কর্মযোগের প্রথমভাগে অহং কর্ম করছে, এভাব থাকে, কিন্তু গভীরে পুরুষ প্রকৃতির ক্রিয়া ধরতে হবে। সেখানে পুরুষের দৃষ্টিতে বা ইচ্ছায় প্রকৃতির কর্মস্রোত তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে, প্রাণের তটে ভেঙে ভেঙে আছড়ে পড়ছে। এই বোধের পর আরও গভীরে গেলে ওই নিমিত্ত অহং টিই তাঁর প্রকৃতি এই বোধে বোধ হবে। তখন তাঁরই শক্তি "পাকা আমি"কে পেয়ে তিনিই আমার উদ্দেশ্য ও কর্মের প্রেরয়িতা, এই ভাবে আবিষ্ট হতে পারলে তিনিই সাক্ষাৎভাবে কর্ম করে চলেছেন, এই দিব্য ভাবের আবেশে দিব্য কর্ম অভিসম্পন্ন হবে। তখন অহং নিমিত্ত প্রকৃতি শক্তি সবই তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত-বোধে পর্যবসিত হবে। এই দিব্য কর্ম কর্মযোগের সাধকের আধারে বিদ্যুৎ ঝলকের মত সহসা আবির্ভূত হয়ে সম্ভূত হয়, তখনই সাধক যেন দিব্যজন্মে ভূমিষ্ঠ হয়। এই জ্ঞান লাভ করলে সাধক কর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করে, অথচ দিব্যজন্মের দিব্য কর্ম সে উপলব্ধি করে, যেমন করে কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরে অর্জুনের দিব্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম প্রতিভাত হয়েছিল। আর তখনই ভগবানের উক্তি "সম্ভবামি যুগে যুগে" কি অর্থ বহন করে, সেটা ধরা পড়ে। এই দিব্য শক্তিসম্পাত (Divine Intervention) ঘটলেই নিশ্চিতভাবে প্রত্যয়ে আসে ব্রহ্মসংকল্পের পরিচালনা। তা না হলে দিব্যজন্ম বা দিব্যকর্ম ধরতে পারা সম্ভব নয়। তন্ত্র এই শক্তিসম্পাতকে বলেন অনুগ্রহ-শক্তি, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন Grace—ভগবৎ-প্রসাদ। দিব্য সংকল্পই (Supreme Will) ভগবৎ-প্রসাদ বা দিব্য করুণা (Supreme Grace) রূপে অবতরণ করেন। সে এক অনির্বচনীয় তত্ত্ব, কোন নিয়মের ধারা ধরে একে ধরা যায় না, অথচ এর চেয়ে পরম সত্যও আর কিছু নেই।

সাধারণত অহংকার বা মনের সংকল্প (egoistic will) নিয়েই মানুষ কাজ

করে। যোগকর্ম শুরু করে সাধক দেখতে শেখে যে অহং সরে যায়, তাকে সরে যেতেই হয়। গভীরে তার সর্বাবগাহী দৃষ্টির নির্দেশে কর্ম হয়ে চলে—অকর্তার কর্ম। তা থেকে সহসা ভগবৎপ্রসাদ বা তাঁর অনুগ্রহশক্তির অবতরণে দিব্যকর্ম সম্ভাবিত হয়। কাঁচা আমিটি সমূলে বিনিষ্ট হওয়া সহজ হয় না, অগণিত তার সংস্কার অভ্যাস ও ধর্মাধর্মবোধের নিগড়; কত সূক্ষ্মভাবেই যে তার মৎলব ভগবৎ-ইচ্ছার রূপ ধরে তাকে বিড়ম্বিত করে, তা আর বলার নয়। ওই বিদ্যুৎ ঝলকের মত অনুগ্রহশক্তি বা ভগবৎ-প্রসাদের অবতরণ যখন যন্ত্রটির ধাতুবদল পর্যন্ত করে দেয়, তখনই আত্মমহিমার বোধ আসে, না হলে কিছুতেই কিছু হয় না। তখন নিজের ওই কাঁচা অহংটিকে নিজেই আর সহ্য করা যায় না। কবির ভাষায়—

"এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহঙ্কার।
দিনের কাজে ধূলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি
এমন তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহঙ্কার।

আমার সব কর্মের মাঝে ওই মলিন প্রতপ্ত অহঙ্কার এসে যে তাপ সৃষ্টি করে, তাতে তাঁর সঙ্গে আমার আড়াল আর ঘুচতে চায় না। যখন আমি নিজেই তাকে সইতে পারি না, আর তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখনই সত্যকার সমর্পণ শুরু হয়। প্রাণে আশা জাগে যে তাঁর আসার সময় হল, এবার তাঁর সঙ্গে মিলনের লগ্নে মলিন বস্ত্রটি পরিত্যাগ করে স্নান করে প্রেমের বসন পরে শুচি শুদ্ধ হতে হবে। তাঁর

প্রসাদই যে আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে, সেটা প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর ওই অনুগ্রহ-শক্তির অবতরণেই (Divine Intervention)।

কিন্তু ওই মলিন ও প্রতপ্ত অহংটিকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারা সহজসাধ্য নয়। কর্ম সিদ্ধ হলে কর্মফলের ক্রিয়ায় সূক্ষ্ম অহংবোধ এমনভাবে গর্বে ফুলে থাকে যে সেটা ধরতে পারা সহজ হয় না, সেজন্য গীতা বলেছেন সুখেও বিগতস্পৃহ হওয়ার কথা। অহং ফুলতে ফুলতে অতিকায় হয়ে বেলুনের মত ফেটে পড়ে বা চুপসে যায়, সে ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু তাতে জীবনে ও সাধনে অনেক দেরী হয়ে যায়। আবার কর্মফলে যদি সিদ্ধি না আসে, তাতে ঐ মলিন অহঙ্কারকে আর জমতে দিলাম না, সার্থকতা থেকে দূরেই আছি। তবুও মনের মধ্যে গভীরে আছে প্রশান্তি—প্রসাদমধিগচ্ছতি"। চিত্ত প্রসন্ন থাকলে এই ভাবের পরিপাকে সত্যকার প্রেমের আবির্ভাব হয়। শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে দেখিয়েছেন যে সত্য (Truth) আর প্রেম (Love) মূলত একই বস্তু। পুরুষসত্তা শান্ত আকাশবৎ, তাতেই প্রেমরূপে তাঁর প্রকৃতি ফুটে উঠছেন, আবার তাতেই মিলিযে আছেন। তাই কর্ম করার ফলে যে চিত্তের প্রসন্নতা, সেটা দিনের বেলাকার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম সম্পন্ন করে কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় কোন দাগ বা মলিন ছাপ রেখে গেল না। যখন মিলনের লগ্ন এল তখন সব ভার হাল্কা হয়ে গিয়ে চিত্ত ভরে উঠল প্রসাদে, তাঁর প্রেমে। এ তো তাঁরই শক্তি হয়ে যাবার (নিমিত্ত) পরিণাম। মীরাবাঈ গেয়ে উঠেছিলেন "মহাঁনে' চাকর রাখো জী।" অষ্টপ্রহর তাঁর দাস হয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, দেহ প্রাণ মন সব ভেঙে মথিত হয়ে যেন নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। তবুও সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজকে একেবারে রিক্ত করে শূন্য করে দিচ্ছি তাঁরই কর্মে, কেন না এ তো তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর সর্বনাশা দৃষ্টিই এই রকম করে নিঃশেষে শূন্য করে উজাড় করে নেবে আমার সব শক্তিকে তাঁর সর্বশক্তিমত্তায়, আর তখনই সেই মহাশূন্যবৎ পরমব্যোমে হবে চৈতন্যের

সূর্যোদয়। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিষ্যের এই রকম চরম ত্যাগের ও পরম প্রাপ্তির স্থান ছিল। উপনিষদে আমরা এরকম বহু আখ্যান শুনেছি। শিষ্যের ভাব হল ভালবেসে নিজেকে পূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া। "গুরু! তোমার জন্যই তো আমার সব কর্ম, তোমার আলোই যে দেখি সবার মাঝে, আমি যে তোমারই!" এই ভাবের কর্মের ফলে চিত্তে প্রথমে আসে প্রসন্নতা, তার পরেই আসে প্রেম। তাতেই সত্যের ঝলকে ঝলকে অবতরণ সম্ভব হয়। এ-ই হল সিদ্ধির ক্রম। নিজেকে রিক্ত করে করে নিঃশেষে তাঁর কাছে হারিয়ে যাই, আর তাঁর যে সৌম্য প্রসাদ আমার চিত্তের লাবণ্য, তা আবার তাঁকেই মাখিয়ে দিই। এই ভাবে বিদ্যুৎ ঝলকের মত ছিল যে শক্তিপাত, সেটা ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধে হয় স্থিরা সৌদামিনী। আর তখনই বোঝা যায় পৃথিবীতে এই জীবনে আসার অর্থ। তিনিই এই আধারে উন্মেষিত হবেন—এই তাঁর সঙ্কল্প। অপরের সঙ্গে ব্যবধানও তখন ঘুচে যাবে। যে ভাবেই কর্ম করি না কেন, এই হল সেবাকর্ম।

চাতুর্বর্ণ সৃষ্টির মূলে ছিল এই সেবাকর্মেরই বিভাগ। বিবেকানন্দ সবংকমে সেবাকর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—"জীবে সেবা করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এই বোধে সেবাকর্ম হয় বৃহতের কর্ম। সে কর্ম এমনভাবে হবে যেন আলো ঢেলে চলেছি, এই রকম নিজকে স্বচ্ছন্দ করতে হবে। কোন রকমেই আমার মধ্যে তাঁকে আর আড়াল করতে না পারি। এই ভাবে কর্ম চলতে থাকলে তবেই সত্যসঙ্কল্পের শক্তিতে অতিমানসের পরমতায় পৌঁছানো যাবে তাঁর দিব্যকর্মের শরিক হয়ে। বৈষ্ণবেরা বলেছেন শ্রীভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন তাঁর দিব্যকর্মের সঙ্গী হয়ে আসেন তাঁর পার্ষদগণ। সেই রকম ভাবে বিজ্ঞানঘন পুরুষ ও তাঁর দিব্যসংঘের অন্তর্গত হবেন পূর্ণযোগের কর্মী সাধক, দিব্যগুরুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হবেন। উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ঋষিসঙ্ঘজুষ্ট গুরুসঙ্ঘের পথ ধরতে দেখিয়ে গেছেন। তন্ত্রে তাকে বলে "ওঘ"।

যেমন আছে দিব্যোধ তেমনি আছে মানবোধ। শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন Colony of souls। বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তভ রূপে তাঁর হৃদয়াকাশে এই জীবঘন দিব্যসঙ্ঘ শতসহস্র সূর্যের মত দেদীপ্যমান। তাঁর সঙ্গে সেখানে এক বাঁধনে বাঁধা পড়লে কর্মের সার্থকতা সেখানেই লাভ হয়। কর্মের সেই কৌশলই হল যোগ-শক্তির ফল। বেদে তাকে বলা হয়েছে ক্রতু— সৃষ্টিসামর্থ্যের দক্ষতা। দিব্যকর্ম সম্পাদন করতে তাঁরই কর্মের সঙ্গী হয়ে পূর্ণযোগী ঐ দক্ষতা লাভ করেন।

কর্মে নিজের দক্ষতা লাভ করলে জীবনের নিজস্ব যেটা স্থিতি, সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তখন সে ভূমিতে থেকে কর্ম করা সহজ হয়, তা সে যে কোন রকমের কর্ম হক না কেন। পরমপুরুষের ইচ্ছা বা সেই সত্যসঙ্কল্পের বাহন হয়ে শুধু চলা; কাজেই তাঁর সালোক্য থেকে পতিত করবে, এমন দুরাগ্রহ আর কারও কোথাও থাকতে পারে না। তখন বাহিরের রূপটা হয়ে যায় গৌণ, কিন্তু তা প্রতিফলিত করে অন্তরের সত্যধর্মবোধকে। কবীরের সহজ সমাধির কথা আমরা জানি। সেই কবীর তাঁর জীবনে জীবন-ধারণের কাজ করে গেছেন তাঁত বুনে। তিনি যেমন জোলা (তন্তুবায়) হয়ে এসেছিলেন, তেমনি জীবনভর জোলার কাজ করতে তাঁর বিঘ্ন ঘটে নি। তাঁর পুত্রসন্তানের জন্মলগ্নে তিনি বলেছিলেন :—"অহদ্ মুসাফির পহুনা আয়া, ধরো মঙ্গলথার"—"ও যে অনন্তের মুসাফির, এবার আমার ঘরে এসেছে। ওকে আরতি কর, বরণ কর!" তার নাম রাখলেন কামাল, যার অর্থ হল পূর্ণ। তেমনি কবীরের কন্যাসন্তানও ছিল, তাকে নাম দিলেন কামালী। এই ভাবে তাঁর সাংসারিক জীবনও অতি সাধারণ ভাবে সহজে কাটিয়ে তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথা হল যে এবার তাঁর আসনে বসবে কে? তাঁর পুত্র কামাল? কিন্তু কবীরপুত্র তাতে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর পিতার মতই সহজ উত্তর দিলেন :—আগুনকে কি কেউ কাপড়ে বেঁধে রাখতে পারে? আগুন নিবে ছাই হলে তবেই তা দিয়ে পুটুলি বাঁধা

চলে।" এই আগুন হয়ে জলাই হল পরিপূর্ণ জীবন; সিদ্ধের বা কামালের জীবন। জীবনের যেটা স্থিতি বা আসন, তার বাহিরের দিক ভিতরের সত্যকে বহন ও লাসন করে বলেই তার সার্থকতা। তাই সত্যকে লাভ করলে যে অবস্থায় যে ভাবেই থাকা যায়, তাই হল জীবনের সহজ স্থিতি—তাঁরই সঙ্গে তাঁর লোকে সর্বদা অবস্থান করা। আর যে কর্মই তখন আসে, তাকে সহজে গ্রহণ করে স্বধর্ম পালন করা যায়। ধর্মাধর্ম রক্ষা করা বা সদাচার পালন করা, সে সবের মধ্যেই আছে তপস্যার যোগ। কিন্তু সে সব সহজ ও ভাস্বর হয়ে উঠবে পূর্ণযোগের সিদ্ধ সাধকের জীবনে, আর সেই জীবন হবে ব্রহ্মসঙ্কল্পের মূর্তিমান বিগ্রহ। সে যোগী যে ভাবেই বাস করুন বা যে কর্মই করুন তিনি পরম সত্যেই স্থিত থাকেন, এই কথা শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—"সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।"

এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্রহ্মসঙ্কল্পকে জীবনে ধরা যাবে কেমন করে? সেই সত্যে বর্তমান থাকার অর্থ কি? প্রথমে দেখতে হবে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা অনুস্যূত হয়ে আছে বলে কর্মে রূপ ধরছে সেই সত্যসঙ্কল্প। সেই ইচ্ছার সঙ্গে যোগ রেখে চললে বুঝতে পারব, তাঁর কর্মই সম্পাদিত হয়ে চলেছে, কর্ম আমার নয়। তাই সমতা ও অহং-বর্জনকে (annihilation of ego) কর্মযোগের প্রাথমিক ও প্রধান ভূমিকা রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। ঐ কাঁচা আমিটা না থাকলেই বেশ একটা শূন্যতার বোধ আসে, চিত্তে এক ফাঁকা ভাব। শূন্য ডালির মত সত্তাটা শুধু তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে; আর তখন তাঁর ইচ্ছার প্রকাশই শুধু পারে সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে আবার বহিয়ে দিতে। তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হবে আমার কর্তব্য কি এবং যজ্ঞভাবনায় কর্ম করা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও আবার ভালমন্দের বিচার আসে। কেননা যজ্ঞভাবনা তাঁরই উদ্দেশ্যে, সেটা শুধু নিজের জন্যও নয় .আবার শুধু পরের জন্যও নয়। তিনিই আমার যজ্ঞেশ্বর প্রভু কর্মাধ্যক্ষ। তিনি বৃহৎচৈতন্য, আর আমার

চেতনা তাতে ব্যাপ্ত করতে পারলে হবে আকাশের মত বিস্তারের বোধ, আর সেই সঙ্গে থাকবে রিক্ততার মধ্যেও পরম প্রশান্তির ভাব। এই রকম আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্য আত্ম-চৈতন্য স্থিত হয় আকাশভাবনার পরিণামে।

কিন্তু তখন আবার এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে কর্ম করবে কে? মননের দ্বারা আকাশভাবনাকে ধরতে গেলে এই চিন্তাই আসা স্বাভাবিক যে সেই ধ্যান-চেতনায় কর্ম থাকে না। কিন্তু ওই ভাবনার পরিপাকে স্থিতি দৃঢ় হলে দেখা যায় যে, চৈতন্যের একদিকে যেমন প্রশান্তি অচল অটল সুমেরুবৎ স্থির নিঃশব্দ ভিত্তি, আবার তা থেকেই প্রাণ উৎসারিত হয়ে পর্বে পর্বে কর্ম ঘটিয়ে চলেছে। বৈদিক ঋষি আকাশ-প্রাণের দিব্য মিথুন দেখিয়ে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেছেন। শ্রীঅরবিন্দদর্শনে ঈশ্বর-শক্তির যুগলতত্ত্বে উপনিষদের আকাশ-প্রাণের ভাবনা ভরা আছে। ব্রহ্ম-মায়া পুরুষ-প্রকৃতি এসব যুগল ভাবের পূর্ণতা ঈশ্বর ও তাঁর শক্তির দিব্য-মিথুন তত্ত্বে তা আমরা দেখেছি। প্রকৃতির বশে অবশ হয়ে তাড়নার চোটে বাধ্য হয়ে যদি কর্ম করতে হয়, তাহলে সে কর্মে রস পাওয়া যায় না। কিন্তু দিব্য-প্রেরণার শক্তিতে সেই কর্ম যখন স্বতঃ উৎসারিত হয়, তখন তা হয় রসনিবিড়। সেজন্য সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে যে তেজ যোগকর্মে সেটা থাকা চাই। আর তাই হল ঈশ্বরের শক্তির প্রেরণার উৎস বা তাঁর প্রচোদনা। তাই কি রকম প্রেরণা কর্মের উৎস হবে, এ সব কার্যকরী সমস্যা তুলে গীতা জীবনের কর্ম-সঙ্কটের পর্বগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন। যোগস্থ হয়ে কর্ম করার নির্দেশ প্রথম সঙ্কট-মুহূর্তেই ভগবানের মুখ থেকে শোনা গেল। প্রকৃতির বশীভূত হয়ে যান্ত্রিক কর্মস্রোতে পড়ে নিস্তার নেই, শান্তি নেই। কিন্তু তার মধ্যে যোগদৃষ্টি খুলে গেলে দেখা যায় যে শরীর-যাত্রার যে সার্বভৌম জৈব কর্ম, সেটা বাধ্যতামূলকভাবে সম্পাদিত করার পরও মানুষের নিজস্ব শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে। পশুর মধ্যে তো তা থাকে না। তাই মানুষ দশের জন্য কাজ করতে চায়, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে—এ হল সমাজনীতির

গোড়ার কথা। এ থেকে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করার কথা আসে। আমরা পূর্বে কর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যে লোকসংগ্রহার্থে কর্মও বৃহত্তর সমাজ থেকে বৃহত্তের বোধে নিয়ে যেতে পারে, তখন সেটা হয় যোগকর্ম। আবার সামাজিক এক বৃহত্তের বোধ এলেও সে কর্ম প্রাকৃত চেতনায়ই থেকে যেতে পারে। লোকসংগ্রহার্থে কর্মে অনেক বিক্ষোভ এসে উপস্থিত হয়। তখন আদর্শের একটা যান্ত্রিক ছাঁচ বজায় রাখতে গিয়ে যখন সমস্যার সমাধান করতে হয়, তখন মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ থেকে কর্মের প্রেরণা অনেক সময় এত নীচে নেমে যায় যে, তা থেকে উদ্ধার লাভ করতে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এজন্য গীতা সেখানে যোগকর্মের প্রেরণা ধরিয়ে দিয়ে বলছেন অকর্তা হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম থেকে নিজকে একটু আলাদা করে রেখে অর্থাৎ তটস্থ উদাসীন থেকে কর্ম করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ ওই অকর্তার ভাব ধরতেই নির্দেশ দিয়েছেন। ওই ভাবের মূলে আছে কিন্তু ত্যাগ। কেননা কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না বলে নৈষ্কর্ম্যের সাধনা করা চলবে না। যোগদৃষ্টিতে ফলের দিকে নজর রেখেই যতটুকু সাধ্য কর্ম করতে হবে, কিন্তু বোকার মত বা অবুঝের মত নয়। তাই নিষ্ফল বোধ হলেও অবিচল থাকতে হবে আবার ফল সিদ্ধ হলেও উল্লাসে মত্ত হওয়া চলবে না। সিদ্ধি অসিদ্ধি জয় পরাভব দুরকমেই সমান প্রতিক্রিয়া হলে পরে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের সাধনা সার্থক হয়। এর পরে কর্ম সম্বন্ধেও ত্যাগের বুদ্ধি আনতে হবে। স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী কর্মে একটা তুষ্টির ভাব থাকে। সাধারণতঃ মানুষ স্বভাবের অনুকূলে তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম করে থাকে। বর্ণাশ্রম বিভাগে প্রাচীন ভারতে সেইরকম ব্যবস্থা ছিল। সমাজ যখন সুস্থ ও বলিষ্ঠ তখন বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর প্রয়োজন বুঝে স্বভাবকর্ম ও নিয়তকর্ম বেঁধে দিয়ে এক প্রাণের সুরে সনাতন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ রকম স্বভাবানুযায়ী নিয়ত কর্ম পেলে কর্মে ছন্দ থাকে, মানব সমাজের স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

কিন্তু তা থেকেও বিকার এসেছে। এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তি তার কর্মের প্রেরণা পেয়েও কর্ম বেছে নিতে গিয়ে স্বভাবের অনুকূল কর্ম যদি না পায় তাহলে সে কি করবে? আশ্রম-জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। এ অবস্থায় সে যে কর্ম পায়, সেই কর্মের মধ্যেও এক ত্যাগ-বুদ্ধি (renunciation of work itself) তাকে নিয়ে আসতে হবে। কেননা সেখানে তো বাছাই করার কিছু আর রইল না, যা সামনে আসে সেই কর্মই করে যাবে। কর্মের প্রকারে ও প্রকাশে সমত্ব এনে সিদ্ধি যদি নাই হল, তাতেও ক্ষতি নেই। আমাকে যে কর্মের দায়িত্ব তিনি দিলেন, তাতে আমার রুচি আছে কিনা, আমার স্বভাবে সেটা খাপ খাবে কিনা, এ সব বিচার অনাবশ্যকবোধে তুলে রেখে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে সে কর্ম গ্রহণ করতে হবে। যাই ঘটুক না কেন, সে ঘটনায় আমি উদাসীন থাকতে পারব। এই রকম করে ঘটনার ওপরেও যখন সমত্ব এসে যায়, সে অবস্থা লাভ করা অনেক বড় কথা। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐ রকম প্রতিকূল অবস্থায় কর্ম করাটা বড় কঠিন। আবার যাদের কর্ম করতে হয়, তাদের প্রতি সেক্ষেত্রে সমত্ব আনতে পারা (equality towardr all beings) আরও কঠিন। কিন্তু তা পারলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্তে আলো জলে ওঠে ও পূর্ণতার ভাব আসে, যা কিনা সেই প্রসাদের লক্ষণ—"প্রসাদমধিগচ্ছতি"। সে কর্ম তো আর ভূতের ব্যাগার খাটাও নয় আবার নিছক চাকরী রাখতে কর্ম করাও নয়। "সমনস্ক সদাশুচি" থেকে প্রতিটি বিষয়ে সচেতন হয়ে কর্ম করা চাই। দেখা যায় যে ঘটনা সম্বন্ধে যদি বা অভ্যাস করে সমতা আনা যায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষের বিরুদ্ধ ভাবের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ও নির্লেপের ভাব কিছুতেই যেন আনা যায় না। আমরা তাদের বিচার করে ন্যায়মতের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ নিজের বিরুদ্ধ ভাব আঁকড়ে থাকতে চাই। কিন্তু কর্মযোগে কর্ম যাদের নিয়ে, তাদের প্রতি বিরূপ থাকলে চলে কি করে? সমত্বের ভাব তো আনতেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,

এই অবস্থায় সমত্বের ভাব রেখে চলতে পারলে এক উদাসীন ভাব দেখা দেবে। প্রথমে সেটা তটস্থ ভাব থাকে, কিন্তু সেই তটস্থ ভাবের পরিপাকে দিব্য উদাসীন দ্রষ্টার ভাবে (Supramental Indifference) চেতনায় প্রতিষ্ঠা হয়।

সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গে গ্রীকদেশের স্তোয়িক দর্শনের (Stoic) সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তে এক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য" পরিত্যাগ করার শিক্ষা লাভ করা যায়। ভাগ্য বা অদৃষ্ট জীবনে যে আঘাতই নিয়ে আসুক, যে বিপর্যয় ঘটুক না কেন, সেটা বীরের মত বুক পেতে নিয়ে সহ্য করতে হবে। তা থেকে আসে তিতিক্ষা, যখন স্থির ও অটল থেকে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ হবার সাধনায় অবিক্ষুব্ধ যেন পাথরের মত এক সহ্যশক্তি লাভ হয়। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শক্তি নিয়ে সহ্য করার অভ্যাস করতে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"তিতিক্ষস্ব"। তিতিক্ষার শক্তিতে অভ্যস্ত হলে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উপেক্ষার ভাব নিয়ে যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কর্মের গতি হয়, কাউকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলা যায় না। উপেক্ষা সহযোগে এ ভাবে চলতে পারলে অন্তরের অবর্ণ সমতায় এক রংছুট অবস্থা আসে, যাতে চিত্ত স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং তা থেকে বীর্য লাভ হয়। সেই কারণে বৌদ্ধেরা এই সাধনাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। এ থেকে আশেপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়ায় ও সবরকম ঘটনায় পাথরের মত দৃঢ় এক বজ্রশক্তি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বলভাবে আধারে আহিত হয়। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলা হয়েছে যতমান বৈরাগ্য। প্রযত্নসহকারে এই বৈরাগ্যের সাধনে স্থিতি লাভ করতে হলে কৃচ্ছ্রসাধনের এক পর্ব আসে। তাই একে চরম বলে সাধনায় গ্রহণ করলে সেটা আবার নৈষ্কর্ম্যে নিয়ে যেতে পারে। অন্তরে সচেতন থাকলে সর্বত্র এবং সর্বথা চেতনায় অনিবাধ বৈপুল্যে আত্মদৃষ্টি খুলে যায়। সে আত্মার কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে স্থিত, তাই সমগ্র বিশ্বে সেই আত্মজ্যোতি ব্যাপ্ত।

"আত্মদীপো ভব" বলে এই ভূমির নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্তরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অধূমক জ্যোতির যে দীপটি প্রজ্বলিত, সেই দিকে চেতনার মোড় ফিরে যায়। সে অবস্থায় শান্তির প্রবাহ যেমন সচেতন হয়ে অনুভব করা যায়, তেমনি সেই শান্তির অচল অনড় দৃঢ় শান্ত ভিত্তিটি ধরা চাই। সে সম্বন্ধে সর্বদা হুঁশে থাকা চাই। এই কারণে আকাশভাবনা শ্রীঅরবিন্দযোগের বড় কথা। Silence, Void, Nothingness, এই ভাবগুলির অনুশীলন সুদৃঢ় না হলে যোগে রূপান্তর আসে না, ব্যামোহ সৃষ্ট হয়। আকাশের মত ভূমার একরসপ্রত্যয়ের বোধ এই পাথরের মত সুদৃঢ় আধারেই সম্ভব। ওই পাথরেই পরে প্রাণ জাগে। সূর্যের আলো পড়ে বজ্রমণিতে যেমন রংএর ফুলঝুরি দেখা দেয়, তেমনি সেই বজ্রনিথর আধারে নানারকম দিব্য ভাবের উদয় হয়। সত্তা থেকে এক কল্যাণের প্রবাহ আলোর ধারার মত বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এর পর পর অবস্থাগুলি গীতায় বর্ণিত উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, এই পাঁচ রকম ভাবে কর্মযোগীর সিদ্ধিতে ক্রমগুলি দেখা দেয়। উপদ্রষ্টা শূন্যবৎ শুধু দেখে যান, কিন্তু সেই সাক্ষীপুরুষের দৃষ্টির সম্মতি না পেলে প্রকৃতিতে কর্ম হবে কি করে? তাই অনুমন্তাও তিনি। সে সাক্ষীপুরুষ প্রকৃতিতে জড়িয়ে থাকেন না, তফাতে থেকে তাঁর দর্শন ও সম্মতি দিয়ে যান। তখন প্রকৃতির 'পরে যে নিয়ত কর্ম এসে পড়ছে, তা যদি স্বভাবের অনুকূল নাও হয় তবুও তা করে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আকাশভাবনা ও আত্মতুষ্টি দুই-ই একসঙ্গে যোগের বনিয়াদরূপে পেতে হবে, আর তা হতেই যোগের উপায়-কৌশল খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি যা কর্ম দিলেন, তার উপকরণ নেই, যন্ত্রগুলি সব কাণা খোঁড়া; তবুও তাই নিয়েই যতটা সম্ভব স্বভাবের অনুকূল করে প্রাণ দিয়ে তাঁরই কর্ম করে যেতে হবে। এই রকম করে চলতে পারলে অন্তর থেকে শুভ প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে প্রথম দিকে যে আকাশবৎ উদাসীনতা, সেটা দার্শনিকসুলভ জীবনদর্শন।

কিন্তু ঐ ভাবনার অভ্যাসে চিত্ত ফাঁকা হয়ে গেলে তাতে রসচেতনা স্ফুরিত হয়। গীতা যেমন বলেছেন যে সাধারণ লোকে আসক্তি নিয়ে কর্ম করে, কিন্তু যোগযুক্ত বিদ্বান তাদের সঙ্গে কর্ম করে তাঁর নিজের যুক্তকর্ম হতে তাদের কর্মেও রসের প্রবাহ বহিয়ে দেন। অনেক ক্ষেত্রে এ রকম দেখা যায় যে, কারও কোন বিষয়ে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তার জীবনে সেদিক থেকে কিছু করবার সুযোগই যেন এল না, ইচ্ছামত কিছুতেই সেটা করা গেল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবনের অন্য দিক দিয়ে যে ধরণের কর্ম এসে পড়ল, সেটা সে প্রাণপণ করে যথাসাধ্য সম্পন্ন করে রসের সন্ধান পেয়ে নিজকে সার্থক মনে করল—এ রকমও হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখা যায় যে, তিনি কি না করেছেন! মহাযোগেশ্বর যোগযুক্ত না হলে কি এরকম হতে পারে? তিনি নিজে কর্ম করেছেন বৃন্দাবনে আর সেই সঙ্গে সকলের কর্ম হয়ে উঠেছে মধুর। তেমনি আবার মহাভারতের পটভূমিকায় তাঁর ঐশ্বর্যের মাধুরী! সেখানে তাঁর কর্ম ঘোর যুদ্ধকর্মেও তাঁর সহকর্মীদের রসের জোগান দিয়েছে। এই ভাবের অনুশীলন করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে স্বয়ং গৃহকর্তা যদি ওই আদর্শের অনুসরণে সকলকে নিয়ে রসে বশে চলে কর্ম করেন, তাহলে গৃহকর্মের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব ছন্দে সাধিত হয়। সকলেই সেই পথ ধরে চলতে পারলে দেখবে চেতনার আত্মদীপই বিকীর্ণ হয়ে চলেছে। কর্ম হয়ে চলেছে, কিন্তু অকর্তার ভাব। এই অকর্তার কর্মই নিয়ে যায় নিমিত্ত কর্মে। সেখানে উদাসীনতার দর্শনই নিয়ে যাবে অতিমানস চেতনার দিব্য উদাসীন দ্রষ্টার ভূমিকায়—আর সেটাই তো চরম ভাব।

গীতার ক্রমগুলি আবার মিলিয়ে নিলে দেখতে পাব, প্রথমে প্রকৃতির বশ হয়ে চলাটা দেখতে শিখতে হবে। সেটা দেখতে পারলে তা থেকে আসবে বিবেক-জ্ঞান। তখন দেখা যাবে প্রকৃতিই কর্ম করে চলেছে, দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান করছি, শুধু দেখে যাই। আমারই ভিতরে প্রকৃতির কর্ম ও প্রতিক্রিয়া

কি ভাবে হয়, তারও সাক্ষী হয়ে আছ। চৈতন্য কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে, আর কর্মের প্রবাহ আসা যাওয়া করছে। তখন অকর্মেও কর্ম আর কর্মে অকর্ম দর্শন করতে পারলে হয় অকর্তার কর্ম বা কৃৎস্নকর্মকৃৎ, আর তা হতেই সর্বকর্ম-বিশারদ হওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থা খুব ভাল করে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যেমন—কর্ম তুমি কর না, তবুও তোমাদের দিয়ে কর্ম করিয়ে নেওয়া হয়, বা কর্ম হয়ে যায়। শান্ত শুব্ধ আকাশের বুকে যেমন বয়ে চলে প্রাণের মুক্ত ধারা, ঠিক তেমনি করেই সত্যসঙ্কল্প "একোঽহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" কর্মের মধ্যেই সম্পদ্যমান হয়ে চলে—সকলের জন্য নিজেকে দিয়ে কর্ম হয়ে বয়ে চলব, এই হল আত্মোৎসর্গের মূল ভাব। শ্রীঅরবিন্দ শক্তির ওই অক্ষীয়মাণ ধারা ও তার উৎস যে নীরবতা (Silence) ও শূন্যতা (Void) সেই ধ্যানচিত্র কতবার কত ভাবেই তাঁর বাণীতে তুলে ধরেছেন। এ থেকে সাধকের প্রতি উপদেশ হল, প্রকৃতিতে উৎসারিত কর্মস্রোত দেখে, সে ধারা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে অকর্তা হয়ে অন্তরের কেন্দ্রস্থলে গভীরে তাঁরই সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত হও। অর্জুন নিজের বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে সদাচার ও সৎসঙ্কল্পের দোহাই দিয়ে পশ্চাৎপদ হতে চাইলেন, তিনি নৈষ্কর্ম্যের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর টুঁটি চেপে ধরে তার স্বভাবজ ক্ষাত্রধর্ম দেখিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ তাকে করতেই হবে, প্রকৃতি তার আপন শক্তিতেই যুদ্ধকর্ম করিয়ে নেবে। কেননা এ কর্ম অবতারের আপন কর্ম—তাঁর কল্যাণ কর্ম। "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—আমার শক্তিতে মায়ার বিকার উৎপন্ন হলে, তা থেকে আসে ধর্মের গ্লানি; আর তখনই নতুন করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি নিজেই আবির্ভূত হই"। এই হল ভগবানের নিজের মুখের কথা। আমরাও জীবনে সেই কল্যাণকর্মকেই খুঁজে বেড়াই। আমরা যে শিবকে শিবতরকে চেয়ে চলেছি, এও সেই ভগবানেরই কর্ম। তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না, সে প্রৈতি, সে তো কেবল এগিয়ে

চলতে চায়। সে যা হয়ে আছে, তার উর্ধ্বে উঠে যেতে চায়; সে-ই তার এষণা, সে-ই তার সনাতন কর্ম।

কিন্তু এগিয়ে চলতে গিয়েও মানুষের চলা দুভাবে সিদ্ধ হয়, যেমন একদিকে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সেপথে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন যে কর্ম না করেই নৈষ্কর্ম্যের পথে গেলে অনেক সময় ঘোর তমে ডুবে যেতে হয়। সেটা কিন্তু সিদ্ধি নয়—পরাভব। আবার অপর দিকে যজ্ঞ দান তপস্যা এ সব সৎকর্ম করলেও সে সব কোন কর্মই ব্যক্তিগত ফল লাভের জন্য নয়, তাই মূলে চাই ত্যাগ। যদি শিবের পথে কল্যাণের পথে শ্রেয়োলাভের জন্য চলতে চাও, এক সার্বভৌম কল্যাণের আদর্শ ফুটিয়ে চলতে হবে। তাতে সর্বজনেরও কল্যাণ। যোগীই জানেন তাঁর দিব্য প্রেরণায় তিনি যে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন, নিমিত্ত হয়ে কর্ম করেন, সে সব তাঁর যোগযুক্ত কর্ম—ঈশ্বরশক্তিরই কর্ম। তাই তিনিও তখন হয়ে যান ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ চৈতন্য, আর তার মধ্যে প্রাণ আন্দোলিত—সেই হয় তাঁর দিব্য কর্ম। "আমি তাঁর নিমিত্ত, যাদের নিয়ে কর্ম যাদের সঙ্গে কর্ম আর কর্মের ফলাফল, সব সম্বন্ধেই এক উদাসীন ভাব। এক দিকে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে তাঁর হাতের যন্ত্র হয়ে তাঁর দিব্যকর্মের শরিক হতে পারলে, ঐ পাথরে খেলে যায় রামধনু রং। তখন সে আর সাধারণ পাথর নয়, বজ্রমণি হয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে সে দেখে বুঝে নিয়েছে। তার আর কারও সঙ্গে বিচারের সম্পর্ক নেই, সে ঘটনাতেও (happening) যেমন, ঘটিত ও ঘটকেও (beings) তেমন চরম উদাসীন। তা থেকে অহং সমূলে উৎখাত (annihilation of ego) হয়ে যায়, আর তাঁর নিমিত্ত হতে পেরে যা হবার জন্য বিশুদ্ধ রসবোধ জাগে। এ সব গভীর অনুভূতির বিষয়, শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার বস্তু (logical) নয়।

কূটস্থ আত্মা (Self) ও চৈত্যপুরুষ (Psychic being) একই সঙ্গে

আছেন ঈশ্বরশক্তির সম্বন্ধের মত। তাই তাঁর কর্মের জন্য বিপদের মধ্যেও আনন্দ পাওয়া যায়। তাতে চৈত্যপুরুষ উন্মেষিত হতে থাকেন, আর তারও ভিতরে শক্তির নিমেষের মধ্যে সাক্ষী আত্মা শূন্যবৎ হয়ে আছেন। ঐ চৈত্যপুরুষই জীবনরসের রসিক, জাগ্রতে মধ্বদ পুরুষ। স্বয়ং ঈশ্বরই সাক্ষী হয়ে আছেন—আত্মা পুরুষ। তাঁরই শক্তিতে চৈত্যসত্তায় রূপান্তরিত হয়ে জীবন সহজ হয়ে এল, কোন ক্ষোভ সঞ্চিত রইল না, এই জীবন-দর্শন কর্মে প্রতিফলিত হয়। চৈত্যপুরুষেরই কর্ম, তাই রসের সঙ্গেই কাজ করে চলেছি। মীরাবাঈ সিদ্ধ হয়ে গান করেছিলেন "আমাকে তোমার চাকর করে রাখো"—এই হল সিদ্ধের কর্মযোগ। আবার সেই সঙ্গে সাক্ষী চৈতন্য নিয়ে প্রকৃতিতে সকলের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভালমন্দ, এই রকম সব কিছু অপূর্ণতা বা দ্বৈতও দেখা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে কর্মযোগের পূর্ণতা আসে।

১৭

সমত্ববোধ ও অহন্তার বিলয়

সদাচারের আদর্শ ও সত্যসঙ্কল্প নিয়ে কর্মযোগে কর্ম করার প্রসঙ্গে অহন্তার বিলয় ও সমতা রক্ষা করার আলোচনায়, বহু রকমের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকৌশলের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। তবুও কর্মের গতি গহন বলেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন থেকে যায় যে আমাদের কর্ম কি। আমরা কি করব যাতে কর্ম যোগকর্ম হয়ে উঠবে? দেহ প্রাণ মন এই তিন নিয়েই আমাদের জীবন এবং এদের আশ্রয় করে শক্তির প্রকাশ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি; যে পুরুষ তার ভর্তা ভোক্তা প্রশাস্তা ও দ্রষ্টা। তবুও যে দুঃখ পাই, তার কারণ প্রকৃতির ওপর আমাদের প্রশাসন নেই; আমাদের কর্তৃত্ব ও আমাদের জীবনে ভোক্তৃত্ব বারবার ব্যাহত হয়। আমাদের মধ্যে যে পুরুষের বিবিক্ত দৃষ্টি অপাবৃত হয় নি, দুঃখের বীজ সেইখানেই। কি করে প্রকৃতি পুরুষের এই স্বাতন্ত্র্য হরণ করে তাকে বাঁধে, আবার কি করেই বা সে বাঁধন কাটিয়ে পুরুষ বিবিক্ত হয়, দুঃখের হাত থেকে বাঁচে, তা বুঝে দেখতে গেলে গুণময়ী প্রকৃতির তিনটি গুণের আলোচনা করে দেখতে হবে। সে তিনটি গুণের কথা আমরা শুনেছি যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে, তমঃ রজঃ আর সত্ত্ব। প্রকৃতিতে এ তিনটি গুণ থাকবেই, না হলে শক্তির বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় গুণলীলা না হলে সৃষ্টিতে ক্রম-অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু গুণসাম্য ও গুণবৈষম্য কি ভাবে চিৎ-প্রকাশের অনুকূল ও প্রতিকূল হবে— সেটাই আমাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যখন আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কর্মযোগ শুরু করতে চাই, তখন পুণ্যকর্মের বোধই আমাদের ওপরে ভর করে থাকে। তাই এক কল্যাণবুদ্ধিতে "বহুজনহিতায়" "বহুজনসুখায়" যে সব বৃহৎ কর্ম ও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পাদিত করতে

লেগে যাই, সে তো কল্যাণকৃৎ-এরই ধর্ম। কিন্তু সেই সব কর্মের পথেই বিপরীত ভাবের অশুভ মন্দ পাপ এই সব বোধও তখন প্রতিযোগীরূপে দেখা দিতে থাকে। এই দ্বৈতবোধ মানুষেরই বুদ্ধিতে বিবেক-বিচারের ফল, পশুর মধ্যে এ দ্বৈতবোধ নেই। যদিও সাধারণ মানুষ জৈব কর্মে পশুরই উন্নততর এক জীবনযাপন করে এবং বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষের জীবনের কর্ম শুরু হয়, তা আমরা জানি। কিন্তু তাতেও ভালমন্দের বোধই তার কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। বেঁচে থাকার তাগিদটা মিটে গেলেই কোন এক আদর্শ বোধ মানুষকে জৈব প্রয়োজনের গণ্ডী কাটিয়ে সৎ কর্ম করাতে চায়। সেই আদর্শ বোধ যে একটা অনড় বস্তু নয়, তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জীবনের পথে চলতে গিয়ে ঠেকে শিখতে হয় আদর্শ বোধ কি আর কিভাবে সে সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হতে থাকে। ভগবানকে প্রেমময় মঙ্গলময় করুণাময় বলে আমরা যেন তাঁকে ওপরে তুলে রেখেছি। তাঁর জগতে তাঁর সৃষ্টিতে এত অশুভ পাপ দুঃখ এল কি করে—এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না বলে তাঁরই কাছে আমাদের এই সমস্যার যেন জবাবদিহি চাই। কেননা দ্বৈতের জগতে এর সোজা কোন উত্তর মেলে না, বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যাও চলে না। এই দ্বৈতবোধের ওপারে চেতনাকে তুলে নিতে পারলে দেখা যায় যে অশুভকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার ঐ অশুভ শক্তিকে অসুর শয়তান (evil) যে নামই দিই না কেন, তার সঙ্গে ভগবানের এক দ্বন্দ্বও দেখা যায়। তাহলে ভগবানের ভগবত্তা কি রকম হল? বেদান্ত তাঁকে বলেছেন "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।" কথাটা তাহলে দাঁড়ায় যে, পাপ আছে, কিন্তু পাপ তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না। তাহলে পাপেরও একটা স্থান রয়েছে, জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে তাকেও একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। তখন এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর ইচ্ছা-শক্তি বা সত্যসঙ্কল্প কি ভাবে জগৎ পরিচালনায় কর্ম করছে, সেটা বুঝে দেখার কথা আসে। আমার ইচ্ছা দিয়ে

তাঁর ইচ্ছা বুঝতে যাই, তাহলেই গোলযোগে পড়তে হয়। কিন্তু তাঁর ঐ বৃহৎ ইচ্ছাশক্তির ধারা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখলে বোঝা যায়, দ্বৈত না থাকলে, আলোছায়ার সৃষ্টি না হলে জগদ্‌ব্যাপারই সম্ভবপর হয় না। জীবন তো শুধু যান্ত্রিক আবর্তন মাত্র নয়, তার পিছনে একটা বাস্তব ছন্দের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, তার একটা লক্ষ্যও আছে। শিল্পী যখন তার শিল্পকলায় আলো-ছায়ার খেলা বহু বিচিত্র ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তখনই সেটা সার্থক সুন্দর শিল্পসৃষ্টি হয়। শুধু আলো বা শুধু ছায়া কোন কারুশিল্প সার্থক করতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতির পরিণামী ধারা দেখিয়ে ওই দ্বৈতবোধকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অসৎ থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় ও মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যে চলা, তারই এক মধ্যবর্তী অবস্থায় চেতনার এই মিশ্রিত ভাব, যেখানে আলো-ছায়া হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ এই রকম সব বিপরীতধর্মী দ্বন্দ্ববোধ দুদিকে চেতনাকে আকর্ষণ করতে চায়। প্রকৃতি-পরিণামের এই মধ্যবর্তী অবস্থায় যে দোলা, তার দুদিকেই অব্যক্ত, যেন দুই মেরু। যেদিকে অভিব্যক্তির লক্ষ্য, সেদিকে শুধুই আলো অমৃত সত্য। সেখানে কোন সংঘর্ষ নেই, তাকে আমরা বলে থাকি সুমেরু। সেখানে পুরুষ বা শুদ্ধ আত্মা, তিনি দ্বন্দ্বাতীত চিৎ-স্বরূপ। অপর দিকে প্রকৃতির অব্যক্ত দশায় হল কুমেরু; সেখানে একেবারে নিরেট জড়, যেখানে এক অনড় অবস্থায় চৈতন্য মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। সেখানেও দ্বন্দ্ববোধ নেই, সবটা যেন এলিয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে। সেই জড়ের কুমেরু থেকেই প্রাণের ক্রিয়া শুরু হতে দেখা যায়, আর তারই মধ্যবর্তী ব্যক্ত অবস্থায় আমরা এক বিষমের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। কিন্তু প্রাণ একা ঐ বিষমকে সুষম (Cosmos) করে গড়ে তুলতে পারে না, যদি না তাতে মনের আলো পড়ে ছন্দ ও সুষমা গড়ে ওঠে। কিন্তু মনোজ্যোতিতে পৌছালে দেখা যাবে, সেখানেও এক শুষ্ক উদাসীন ভাব।

এইরকম করে গুণাত্মিকা প্রকৃতির তিনটি স্তরে প্রধানত তিন গুণের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, যথাক্রমে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, গুণাতীত অবস্থায় সৎ ভাবে যে পুরুষের স্থিতি, তা গুণাত্মিকা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। কিন্তু সেই ঊর্ধ্বে অবস্থিত থেকেও পুরুষ যখন দ্রষ্টা থেকে প্রকৃতির গুণসকলকে কর্ম করতে দেখেন তখন সাধক ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন।

সাংখ্য বলেছেন প্রকৃতি গুণাত্মিকা তাই পরিণাম হয় প্রকৃতিরই। দুই মেরুতে দুই অব্যক্তের স্তব্ধতা, আর তারই মধ্যে প্রকৃতির পরিণামী ধারা বয়ে চলেছে; সেই চলার এক ছন্দ ও এক নিয়মও আছে। যেমন আমরা দেখি প্রতিদিনই জীবকে ঘুমের মধ্যে হেলে পড়তে হয়, আবার জেগে উঠে কোলাহল করতে হয়, সেই তার প্রবৃত্তি। এটা প্রকৃতিরই নিয়ম আর সেভাবে তার তিন গুণের খেলায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃকে চিনে নিতে হবে। ব্যক্তি তার কর্মস্রোতে যখন থেমে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, সে অবস্থা হল তমোগুণের অধিকারে। এতে তার শক্তি নতুন করে সঞ্চিত হয় ও আবার সে কর্ম শুরু করে। প্রাণের আলোয় জেগে উঠে মনোজ্যোতির নির্দেশে সে চলে যথাক্রমে রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়ায়। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে সাংখ্য দর্শনে তিনগুণের লীলা সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে অন্ধকার আকাশ ও পৃথিবীকে মৃতের মত নিরেট করে রাখে, সেটা তমোগুণের প্রতীক। তারই মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্রমে অন্ধকার তরল হয়ে তার আলো এসে পড়বে, তারই সূচনাস্বরূপ আলো-আঁধারের এক মিশ্র ছায়া এসে পড়ে। তারপর লাল রঙে দিগন্ত প্লাবিত হয়—সেটাই রজোগুণ। তা থেকে সূর্যোদয়, আর তারপর থেকে আলো ক্রমেই বেড়ে চলে। তখন শুধুই আলোর প্রকাশ, সেইটা সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণ চিৎ বা প্রকাশ সূচিত করে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, অব্যক্ত থেকে কর্মের চাঞ্চল্য আসে—কেনোপনিষৎ বলছেন "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। কে যেন

মনকে ঠেলে দিচ্ছে"। আর তখনই দেখা যায় যে আপনা থেকেই কর্ম হয়ে চলে। গীতা যেমন বলেছেন "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"। সব প্রাণী প্রকৃতি অনুযায়ী চলেছে, সেখানে নিগ্রহ করে কোন ফল হবে না। এইভাবে চলতে চলতে আবার থেমে যাচ্ছে অব্যক্তে, সেটাই তার বিশ্রামের স্থান। যোগদৃষ্টি ফেলে এই চাঞ্চল্য ও মূঢ়তার মধ্যে দেখতে শিখলে অব্যক্তের অন্ধকারকেও দেখা যায়। যিনি তা দেখতে পারেন, তিনিই গীতার ভাষায় সংযমী—"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"। যে অবস্থায় সাধারণ মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে, যোগী সেখানেও তাঁর দৃষ্টি মেলে দিয়ে জেগে থাকেন। এই রকম করে ঘুমের মধ্যেও সচেতন থেকে সেই জাগ্রতকে উজ্জ্বল করা, এটা যোগের সাধন। সাধারণত প্রকৃতিতে প্রেরণা বা একটা ঠেলা আসে, কর্ম করা হয় আবার সে শক্তি ঢলে পড়ে, এই আবর্তন চলতে দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে দেখানো হয়েছে, ঐ আবর্তনের মধ্যেই ক্রমশ জেগে উঠে সত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়, কেননা মূল শক্তি তো তারই। অন্ধতমিস্রায় সেই সত্ত্বই ঠেলে দিচ্ছে; রজোগুণ দিয়ে সে শক্তিলাভ হয়, কিন্তু তা দিয়ে শক্তিকে ধরতে পারা যায় না। অব্যক্তের অন্ধকার হল সুষুপ্তির ভূমি সেখান থেকেই আবর্তন শুরু হতে দেখা যায়। সে আবর্তনের শুরুতে তামসিক মূঢ়তা ও রাজসিক চাঞ্চল্য যেন জড়াজড়ি করে আছে, এ রকম বোধে আসে। তার মধ্যেই সত্ত্ব জেগে ওঠে, কিন্তু সেও ঐ ঘোর (রজঃ) ও মূঢ় (তমঃ) শক্তির কবলে পড়ে যায়। জগতে এই ভাবেই শক্তির বিক্ষোভ ঘটতে দেখা যায়, যেন এক হুল্লোড়। কিন্তু তারই মধ্যে একটা অবিক্ষুব্ধ দৃষ্টি আছে বলে তা নিজকে পেতে চায়, ছন্দ চায় সুর চায়। অনৃতি (disorder, chaos) থেকে যে একটা তন্ত্র (system) সৃষ্ট হয়ে চলেছে, তা প্রাণেরই (life) শক্তিতে। কিন্তু প্রজ্ঞার দৃষ্টি বা চৈতন্যের আলো না পেলে প্রাণ তার শক্তি সামলাতে

পারে না। জড়ের রাজ্যে জীবজগতে ও মনোভূমিতে প্রাণশক্তিই চেষ্টা করে চলেছে সমগ্র প্রকৃতিকে ছন্দ দিয়ে সুর দিয়ে তন্ত্রিত করতে। কিন্তু সে সার্থক হয় তখনই, যখন সে প্রজ্ঞা-শাসিত হয়ে প্রজ্ঞাসহযোগে চলতে পারে। প্রাণের ঐ ঋতায়নী শক্তি একটা পরমাণুর ছাঁচের (structure) মধ্যেও আমরা দেখেছি। কিন্তু ঐ ছাঁচেও চৈতন্যের আলো এসে না পড়লে সেটি প্রাণবন্ত হয় না। রজোগুণের ক্রিয়া আধারের রাজ্যে সেই আলোর পিপাসাই ফুটিয়ে তোলে।

সূর্যোদয়ের লাল বিম্ব শুদ্ধ রজোগুণের প্রতীক। মধ্যরাত্রি (0-hour) থেকেই আলোর অভিযান শুরু হয়, যেখানে অন্ধকার সব চেয়ে গাঢ় হয়ে আসে। বেদে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান ঐ মধ্যরাত্রি পেরিয়েই যে শুরু হয়, তার প্রথম দিকের অংশকে বলা হয় তমোভাগ অশ্বী আর শেষ রাতের অংশকে বলা হয় জ্যোতিভাগ অশ্বী, তখন রজোগুণের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়েছে। তারপর উষার আবির্ভাবে সত্ত্বগুণের ক্রিয়ায় যে আলো জেগে উঠল, সেই আলোই হল বোধের শক্তি—তা মৃতকে প্রাণ দান করে। সেই শক্তি বরণীয় সবিতার ভর্গদ্যুতি, সেই শক্তিই সাবিত্রী শক্তি। তমোগুণে আধার গড়ে ওঠে, রজোগুণে সেই আধার হয় প্রাণচঞ্চল আর সত্ত্বগুণে তাতে চৈতন্যের আলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষকে যে বলা হয় thinking living body, তার ছাঁচ এইভাবে তৈরী হয়। উপনিষৎ পুরুষকে বলেছেন মনোময় প্রাণশরীর নেতা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন প্রকৃতিতে মানুষের ছাঁচ সৃষ্টিতে তিনগুণের সমাহারে এক বিশেষ ক্রম-অভিব্যক্তি দেখা যায়। তার দেহে তমোগুণের ক্রিয়া প্রাণশক্তিতে রজোগুণের ও মনোজ্যোতিতে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। মানুষের মধ্যেই আবার যাদের দেহের টান প্রবল, সেখানে সব কিছুই অত্যন্ত নিরেট—স্থূল। সংসারে পনের আনা লোকই সেই রকম টানে অভ্যস্ত, খাওয়া-পরা ও গতানুগতিক ঐ স্থূল জীবন ছাড়া আর যেন কিছুই তারা জানে না। মনের

দিক থেকে সেখানে এমন এক তামসিক শক্তি (inertia) জোট পাকিয়ে আছে, ঠিক যেন জগদ্দল পাথর। তা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। সেখানে নতুন ভাব তো নেই-ই, কোন নতুন আলো পড়লে এক বিরাট বাধার প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের এই জগদ্দল পাথর চাপার মত মনের অবস্থা দেখে বিবেকানন্দ ভাল করেই বুঝেছিলেন যে সর্বপ্রথম এই তামসিকতা থেকে প্রাণের জাগৃতি চাই। তাই তিনি তাঁর বীর্যের দ্বারা দেশের লোকের রজোগুণ উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিলেন—কিছু কর, প্রাণ জাগুক। শুধু প্রাণ জাগল আর তাতে প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটল না ; এমন হলে তাতেও আবার বিপদ। নিত্য নতুন কিছু চাই, কর্মে ও ধর্মে ধৃতিশক্তির অভাব। আহার-বিলাসীদের যেমন আহার নিয়ে নিত্যনতুনের চাহিদা আছে ; তাতেও অবশ্য নিয়মের নিগড়ে যে তামসিক আবরণ, তা নাড়া পায় এবং তা থেকে প্রাণ মুক্তি চায়, তাই বৈচিত্র্য খোঁজে।

কিন্তু প্রাণ যে আবার নিজের রাজ্যে হানাহানি শুরু করে দেয়, সেটাই তার স্বভাব। উনিশ শতকে ডারুউইনের যে ক্রম-অভিব্যক্তিবাদ, তাতে হানাহানির ফলে প্রাণশক্তির যে বিজয় (survival of the fittest), তাকে ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাণের বুভুক্ষা রজোগুণের পরিণাম মাত্র। মহাপ্রকৃতি বুভুক্ষা জাগিয়ে তুললেও হানাহানি তাঁর লক্ষ্য নয়। তাই জড়-প্রকৃতির তামসিক বাধাকে বিদীর্ণ করে প্রাণের যে ক্ষুধার অভিব্যক্তি, তা আলোর পিপাসাই সূচিত করে। আয়তন বা পরিমাণের দিক যেমন আছে (Law of quantity), তার মূল্যবোধের বা উৎকর্ষের (Law of quality) দিকও তেমনি আছে। সংসারে যেমন দেখা যায় বার আনা লোক তামসিক, তার তিন আনা লোক রাজসিক ও এক আনা লোক মাত্র সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভক্তিশাস্ত্র বলেন "কোটিকে গোটিক হয়"। গীতা বলেছেন "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি

তত্ত্বতঃ ॥” সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে দুই একজন হয়তো সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে। আবার সেই সিদ্ধদের মধ্যে বড় জোর দু' একজন ভগবানের সকল তত্ত্ব জানতে পারে। তাই পরিমাণগত মূল্যবোধ থেকে গুণগত মূল্যবোধ বুঝতে না পারলেই বিপদ। পুরুষের যেন শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ও প্রকৃতির তমোগুণ, এইভাবে দেখলে চৈতন্য ও জড়ের মাঝে রজোগুণ দুদিকেই ওঠা নামা করে। কিন্তু সত্ত্বগুণের অধীনে রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে না পারলে রজোগুণের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় ও তার নিত্যনবীনতাও ভ্রান্ত করে দেয়। প্রশান্তি সত্ত্বগুণেরই ফল, তাকে আশ্রয় করে রজোগুণকে সংযমিত করতে হয়। আবার রজোগুণকে সংযত করতে না পেরে, শক্তিকেই যদি বাদ দিয়ে বসি, তা হলে নির্বীর্যভাব বা ক্লৈব্য এসে গ্রাস করে। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। সাত্ত্বিক ভাবের যথেষ্ট স্ফুরত্তা থাকা সত্ত্বেও তামসিকতা যেন জাতির মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদার মতবাদের আবরণে অনেক সময় তামসিক ভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যেমন অভ্যাসের দাসত্ব করা বা গুণের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গতানুগতিক আবর্তনের পথে চলা। গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় আমরা শুনেছি যে সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ হয়। অন্যান্য গুণের মত মানুষকে তা বাঁধে সুখের সঙ্গে, সেজন্যে সে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মাশ্রমের নিশ্চিন্ত জীবনে সাধকদের মধ্যে ঐ নিশ্চিন্ত আরাম এসে তাদের বাঁধে। সেই কারণে জ্ঞানও যদি বন্ধনের কারণ হয়, তাহলে আর আলোর পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি সাত্ত্বিকতার এই অভিশাপ যে তা রজোগুণকে দাবিয়ে রাখতে যায়, আর তখন তমোগুণ এসে অজগরের মত সত্ত্বগুণকে গ্রাস করে।

তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিসে? যদিও সাত্ত্বিক বাসনা ও সত্ত্বের অহং শুদ্ধতর ও মহত্তর, কিন্তু যতক্ষণ ঐ বাসনা বা আসক্তি ও অহন্তার বিলয় না ঘটছে ততক্ষণ মুক্তি নেই, সমতাও রক্ষা করা যায় না। এজন্য সমস্ত আচার

ব্যবহারের ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র দৃষ্টি অধিগত করা চাই। সেখানে ক্ষুদ্র অহং-এর স্থান নেই। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যে আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মায় স্বাস্থভাবে বৃহৎ হতে হবে। সেই চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা হয় "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" এই বোধের পরিপাকে। তখনই প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় ও সেই সঙ্গে তিনগুণের ক্রিয়াকে সংযমিত করা যায়।

আমদের মূল সমস্যা হল এই যে, মানবপ্রকৃতিতে তিনটি গুণই মিশে রয়েছে জড়াজড়ি করে। তাই আমরা প্রায়ই সমতা রক্ষা করে জীবনে চলতে পারি না। সদাচারের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে পুণ্যকর্ম নিয়ে অযথা হৈ চৈ করে ফেলি। তাতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অধীন হয়ে পড়ে ও রাজসিক ভাব বেড়ে যায়। তখন শক্তির অপচয় ঘটতে শুরু করে, ভাব বিহ্বলতার এই এক মারাত্মক ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা মনে পড়ে:

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস ;···ইত্যাদি।

সমিধ যদি আগুন হয়ে সবটাই না জ্বলতে পারে, তবে ধোঁয়া সৃষ্ট হয় ও আত্মহোমের ঊর্ধ্বমুখী শিখাও স্তিমিত ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই রকম সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে চললেও সাধকের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে রজোগুণ ও তমোগুণ সেই সত্ত্বগুণের অধীনে ক্রিয়া করতে পারে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ঊর্জিত হওয়া চাই ; তখন রজোগুণ ও তমোগুণ তার বশে থাকবে ও আপন আপন শুদ্ধাবস্থা ফিরে পাবে। এ বিষয়ে সাধনায় করণীয় আচরণগুলি (চর্যা) সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান যেমন আছে, সিদ্ধ আচার্যগণ তাঁদের আচরণ ও উপদেশে

যারা জিজ্ঞাসু সাধকদের চিরকাল পথ দেখিয়েও যাচ্ছেন। প্রাচীন উপনিষদে আহার-শুদ্ধি থেকে সত্ত্ব-শুদ্ধি ও তা থেকে ধ্রুবাস্মৃতি বজায় থাকে, এ নির্দেশ আমরা পেয়েছি। কিন্তু এ সত্ত্বশুদ্ধির ফলে যে প্রশান্তি আসে, তা কিছু তামসিক প্রকৃতির স্থৈর্য মাত্র নয়। যেন কোন বোধ নেই, এমন এক নিরেট অসাড়তাকে আমরা শান্তি বলে ভুল করে থাকি। আলো চাই, এবং তা জ্বলবে অধূমক জ্যোতি হয়ে। সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়েও আমরা বুঝে দেখতে পারি যে, যখন আলো জ্বালানো হয়, তা থেকে কালি (carbon) উৎপন্ন হয়; কিন্তু আলোকে উজ্জ্বল রাখতে হলে তাতে কাঁচের আবরণ দিয়ে ঐ কালিকেও পুড়িয়ে আলো করে দিতে হয়, এই নিয়ম। তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রজস্তমোলেশশূন্য হলেও তা নিম্ন অপরা প্রকৃতির কবলে থাকলে বিশুদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, তা হবে বিশুদ্ধ সত্ত্ব। তার আলোতে রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষেপ ও মূঢ়তা পরাবর্তিত হয়ে বীর্য শক্তি শান্তি ও স্থৈর্য আধারে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

প্রাচীন যোগশাস্ত্রে ঐ সব শুদ্ধির প্রক্রিয়া ও করণ নিয়ে অনেক সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কারণ তাতে প্রবর্ত দশায় অনেক ভুল করা ও ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণের ঊর্ধ্বে ওঠার অর্থ এ নয়, যে এক নিরেট নির্বোধ অবস্থায় চেতনা চাপা পড়ে যাবে; তা হলে তাকে কোন মতেই যোগ-চেতনা বলা যায় না। চিত্তের মধ্যে এক অনুস্মৃতির দহন অনুক্ষণ চিত্তকে সজাগ ও সমনস্ক করে রাখে, আর তারই মধ্যে জ্বলছে চিত্ত-দীপের অধূমক জ্যোতি—এই ঊর্ধ্বমুখী স্মৃতির অনুগমন করে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত সেই জ্যোতি দর্শন করতে হবে। তার বদলে শূন্য বা ফাঁকা চিত্তাধারে নিরেট নির্বোধ ভাব চেপে বসে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে না পারে এজন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর প্রমাদ আসে তমোগুণ থেকে। গীতায় তিন গুণের প্রসঙ্গে তিন গুণের ক্রিয়াকে সাজিয়ে দেখানো হয়েছে।

প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দেহীদের বিভ্রান্ত করে দেয়, এগুলি সবই জ্ঞানকে আবৃত করে তমোগুণের ক্রিয়ায়। ভ্রান্তি ও নিষ্ক্রিয়তা তখন সাধককে পেয়ে বসে। রজোগুণের ক্রিয়া তাতে আরম্ভ হলে এক ছটফটানি দেখা দেয়। তাতে অনেক শারীরিক অস্থিরতা মুদ্রাদোষের মত শরীরে দেখা দেয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা অজ্ঞানের আবেগে রজোগুণের ক্রিয়ায় লোভ থেকে কর্মের আরম্ভ হলে কর্মের নেশায় নানা রকম দুঃখ ও অশান্তিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। তীব্র বাসনার আকর্ষণে অন্ধ হয়ে চললে প্রকৃতভাবে চাওয়া পাওয়া ও ভোগ করার রহস্য জানা যায় না। কারণ রজোগুণে জ্ঞানের অভাব থাকে। রাজসিক ও তামসিক কর্মের ফল হল দুঃখ ও অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাই সাত্ত্বিক কর্মের নির্মল ফল হল সুখ। কিন্তু সেই সুখময় ফলে বাঁধা পড়লেও চলবে না। সুখের আসক্তি পুণ্যকর্মের লোভে সাধককে বাঁধে। শ্রীঅরবিন্দ গীতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাই বলেছেন যে নিস্ত্রৈগুণ্য হও, গুণের ওপরে উঠে গুণাতীত থেকে অন্তরে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে এক সমত্বের ভূমি আছে। সেই সমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে যদি গুণের থেকে একেবারে অব্যাহতি চাই, হঠযোগ ও রাজযোগের ক্রিয়া নিরুদ্ধ ভূমিতে একেবারে গুণাতীত করে দিল, তাও আসতে পারে। কিন্তু জীবন থাকলে দেহ প্রাণ মন স্তব্ধ হয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। নেমে এসে নিম্ন প্রকৃতিতেই ব্যুত্থান হলে এক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নাড়ীতন্ত্র সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্মভাবে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়াশীল (hypersensitive) হয়ে ওঠে। বাহিরের কোন শব্দ বা বিকৃতি সহ্য করতে না পেরে সাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা তখন হয় ঐ গুণাতীতে ডুব দেওয়া ও সেইভাবেই থেকে যাওয়া। বলা বাহুল্য পূর্ণযোগের আদর্শ তা নয়, কিম্বা এও বলা যায় যে যোগ তাতে সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য লাভ করে না।

এরকম অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভক্ষতি বিবেচনা না করে প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা দরকার। সমাধির স্মৃতি ব্যুত্থানে ধরে রেখে চলতে হবে।

তা থেকে ছিটকে পড়ে বা লাফ দিয়ে এসে বাহিরকে আঁকড়ে ধরার দরকার নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন "ভাবা লাগার মত ভাব," সেই আবেশ নিয়েই চলতে হবে। কেননা সে সংস্কার তো নষ্ট হবার নয়। বাহিরের অভিঘাতগুলি তাকে "যুদ্ধং দেহিং" বলে যেন প্রতিযোগিতায় আহ্বান করতে চায়। তখন আকাশবৎ ভাবনাকে প্রসারিত করে দিয়ে ওই দুই সংস্কারকে মুখোমুখি রেখে নিজকে দেখতে হবে। একদিকে অনন্তে প্রসারিত আকাশ-শরীর, আর একদিকে তীব্র সংবেদনশীল বাহিরের অভিঘাতে চঞ্চল বৃত্তিসমূহ। এই ভাবে মুখোমুখি হওয়ার ফলে গুণগুলি ক্রমশ রূপান্তরিত হয়; গুণ নষ্ট হয় না। উর্ধ্বে পুরুষের অব্যক্ত ও নিম্ন প্রকৃতির অব্যক্ত, এ ভাবে আমরা দুটি অব্যক্তের কল্পনা করেছি। সেখানে উর্ধ্বে অতিচেতনায় (Superconscient) সুমেরুতে যেমন কোন গুণের ক্রিয়া নেই, তেমনি নিম্নে এক নিরেট নিশ্ছিদ্র জড় (Inconscient) কুমেরুতেও কোন গুণের ক্রিয়া নেই। নীচের অব্যক্তেও থাকে এক গভীর প্রশান্তি সুষুপ্তির সুখানুভবে তার আবেশের ক্রিয়া হয় থাকে। তখন রজোগুণের ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু সেখান থেকে কে ঠেলে দেয় যাতে স্বপ্ন দেখা দেয় ও আবার জেগে উঠতে হয়?

স্বপ্নভূমি দুদিকেই আছে, ওপরের দিকে ও নীচের দিকে যেমন বিজ্ঞান-ভূমির স্বপ্ন বা দেবস্বপ্ন ও মনোভূমির সাধারণ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়, যাতে তা সাধনার কাজে লাগে ও ঘুমের মধ্যে অযথা সময় নষ্ট না হয়। এ বিষয়ে শ্রীমা তাঁর অনেক বাণীতে নির্দেশ দিয়ে আলোকপাত করেছেন। ঘুমের মধ্যে যদি সচেতন থাকা যায়, তা হয় যোগ-নিদ্রা; তখন সমগ্র চিত্তভূমিই জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে যায়। তারও গভীরে যে সুষুপ্তির ভূমি, তা হল শুদ্ধ তমোগুণে প্রশান্তি; তার ওপরেই জগৎ ভাসছে। তাকেও ছাপিয়ে রয়েছে তুরীয় ভূমি। শুদ্ধ গুণগুলি সেখানে জেগে ওঠে। সে অবস্থায় এই তিনগুণ রূপান্তরিত শুদ্ধ ভাবে থাকে। গভীর নিদ্রায় তো সব

হয়ে যেতেই হয়, সেই নিদ্রা যদি যোগনিদ্রা হয় তো শব হয়ে যায় শবশিব। বাহিরটা নিরেট জড় তমোগুণের অভিব্যক্তি হলেও শুদ্ধ তমোগুণের প্রশান্তি তাকে রূপান্তরিত করে। আবার রজোগুণের চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপকে সংহত করে গুটিয়ে এনে যদি জ্যোতির অধূমক দীপশিখার মত জ্বালিয়ে রেখে ধারণ করে রাখা যায়, তবে তা হতে এক দৃঢ় ধৃতিশক্তি বা যোগবীর্য সঞ্চারিত হয়। তাই যোগীর চেতনা হয় প্রশান্ত কিন্তু বীর্যে উদ্বুদ্ধ। তিনি সবটাই দেখেন প্রজ্ঞায় উদ্দীপ্ত, তাই তিনি সমতায় প্রতিষ্ঠিত থেকে গুণের খেলা দেখে যান। এই ভাবে চেতনার গভীরের দিকের ভাব রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তখনও বাহিরের দিকের কাজ বাকী থাকে। সে ক্ষেত্রে চৈতন্যের প্রতিক্রিয়া দুরকম ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা হীনযানী, তাঁরা বলেন যে অন্তরে রূপান্তর ঘটলে জগৎ শূন্য বলে বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা মহাযানী, তাঁরা আরও উজানে গিয়ে বলেন তা তো হবে না, তা হলে যে এক দিকে ঝোঁক পড়ে যায়। ঐ শূন্যবৎ জগতেও অন্তরের রূপান্তরের বোধ আনতে হবে। পূর্ণযোগীর দায় হল ঐ সামগ্রিক রূপান্তরিত চেতনাকে অন্তরে ও বাহিরে সব দিক দিয়ে লাভ করা। তাই তাঁর আদর্শ হল নিস্ত্রৈগুণ্য থেকে তারই মধ্যে তিনটি গুণের শুদ্ধীকরণ। তখন রূপান্তরিত তিনটি শুদ্ধ গুণের ক্রিয়াই শুদ্ধিসাম্যের অবস্থা। গীতা থেকেও আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করেছি, জোর করেও যদি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি, সেই শুদ্ধা চিন্ময়ী শক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, তাহলেও জগতে রূপান্তর আসবে। তখন, সব রকম ঝুঁকি দিয়েও কর্ম করা সম্ভব হয়, এক যৌগিক প্রশান্তি মনের সঙ্কল্পকে ধরে থাকে।

তাহলে নিস্ত্রৈগুণ্য থেকে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ থেকেও যোগীর কর্ম উৎসারিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের সাধনশাস্ত্র থেকে পাওয়া গেছে যে তাঁরা এক দৃঢ় সঙ্কল্প ধরে রেখে নিস্ত্রৈগুণ্যের মধ্যে যেন ঝাঁপ দিতেন যে এত সময় পরে ব্যুত্থিত হবেন। ঘড়িতে সময় সঙ্কেত স্থির রেখে যেমন এলার্ম দিয়ে রাখা হয়, ঠিক

তেমনিভাবে নিজের ধ্যানচেতনার গভীরে সঙ্কল্পশক্তিকে গুটিয়ে রাখতে হবে। রামকৃষ্ণদেবকে দেখা গেছে যে তিনি বারবার মহাশূন্যে ঝাঁপ দিতেন, আবার তাঁকে কে যেন ঠেলা দিত, বলতেন "নেমে যা নেমে যা"। তখন একটা প্রাচীন সংস্কার ধরে তাঁকে নেমে আসতে হত, একথা তিনি বলতেন। কিন্তু বারবার নিরোধ সমাধিতে গিয়েও সর্বদা শক্তি-সঞ্চার হয় না বা জগৎকেও বদলানো যায় না ও বোধসত্ত্বের চর্যাও হয় না। কাজেই শুধু তটস্থ থাকলে হবে না, চাই রূপান্তরিত চেতনার বিকাশ। শ্রীঅরবিন্দ বারবার বুঝিয়েছেন শূন্যের অর্থ একেবারে ফাঁকা বা অন্ধকার নয়। সেই মহাশূন্যেই আলো ছড়িয়ে পড়ে, যে আলো জগতের প্রথম প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে মৃতশরীরে বোধসঞ্চারের মত। সেই প্রাণই জীবজগতে আমাদের মধ্যে স্পন্দিত। তাই গুণাতীত শূন্য হয়ে তবেই তাকে অধিগত করতে হবে কিনা গুণের অধীনে অবশ হয়ে না থেকে গুণের অধীশ্বর হয়ে বসতে হবে। গুণময়ীর গুণগুলিকে বশীভূত করে রেখে তাদের লীলা চলতে দিতে হবে। নিত্যজাগ্রত ও তটস্থ থেকেও তখন গুণগুলি নিয়ে কর্ম করা অনায়াস ও সহজ হবে। গুণের এই রূপান্তরের জন্যই নিস্ত্রৈগুণ্যের সাধনা। প্রাকৃত চেতনার যে গুণবিক্ষোভ তা হল অপরা প্রকৃতির মধ্যে, সেই প্রাকৃত গুণের ঊর্ধ্বে যেতেই হবে। পরা প্রকৃতিতে শুদ্ধ গুণের দর্শন পাওয়া যায়। আর পরমা প্রকৃতি সেই শুদ্ধ গুণগুলি স্ফুরিত করেন আধারে তাঁর গুণসাম্যের ভিত্তিতে। চেতনায় সেই গুণসাম্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব হয়। তমঃ তখন রূপান্তরিত হয় সত্তার ধৈর্য ও প্রশান্তিতে, রজঃ রূপান্তরিত ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত বীর্যে আর সত্ত্ব রূপান্তরিত হয় চিৎপ্রকাশের অনিবাধ সৌষম্যে। গুণের সঙ্গে গুণের কোন বিরোধ নেই অথচ দিব্য ভাবে গুণগুলি স্ফুরিত হতে থাকে, এই হল পুরুষের গুণসাম্য বা সত্তার সুমেরু। অপরা প্রকৃতির গুণলীলায় এতদিন যে অরিচ্ছন্দ ছিল সত্তার কুমেরুতে যার জন্য বিবেক সাধনায় তাকে ছাপিয়ে ঊর্ধ্বে যেতে

হয়েছিল, তা এখন মিত্রচ্ছন্দে রূপায়িত করে তোলে দেহ-প্রাণ-মনকে। সাধকের আধারে তখন আর স্বচ্ছন্দ চিৎপ্রকাশের কোন বাধা সৃষ্ট হতে পারে না। ঊর্ধ্বের বিশুদ্ধ প্রকাশ এই প্রাকৃত ভূমিতেই নেমে আসে তুরীয় চিৎ-শক্তির আবেশে।

ওই মহাশক্তির আবেশই পারে বিজ্ঞানকে আধারে সক্রিয় করতে, ব্যক্তির নিজের চেষ্টায় বা দেহ-প্রাণ-মনের শক্তিতে তা কিছুতেই হবার নয়। তাই ব্যক্তির অহং থেকে মুক্তি পেতে হবে শুদ্ধ আত্মায়। যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে ওই তিন গুণের বিক্ষোভে জড়িয়ে আছি, ততক্ষণ আমরা নিজেদের বলতে গেলে কিছুই চিনি না। শক্তির প্রবাহে ভেসে চলি কিন্তু তাতে বুঝতে পারি না, নিজকেও সামলাতে পারি না। এই 'আমি'কে মরতে হবে, আমি গেলে তবেই তিনি আসেন। তখন দেখি আমি যেন কোথাও নেই, শূন্যবৎ—শুধু সত্তা মাত্র। কিন্তু সত্তার গভীরে এক পরম প্রশান্তি, আকাশের মতই আধারকে ব্যাপ্ত ও লঘু করে গ্রন্থিগুলি শিথিল করে দিয়েছে। দুঃখে অবসাদে হর্ষে উদ্বেগে কোন তরঙ্গই সেই উদাসীন শুদ্ধ চেতনায় হিল্লোলিত হয় না। এই শূন্যের বুকেই নামে লোকোত্তর জ্যোতির প্লাবন। বারবার নামে আর আলোয় আলোয় শূন্যতাকে ভরে তোলে। সে আলোর তেজ আছে, আর সেই তেজক্রিয়া সৃষ্টিধর্মী। সৌরালোকের মতই তা নেমে আসে আর তার তেজে আধারকে নতুন করে গড়ে তোলে। এই ভাবে তিনি নেমে আসেন রূপান্তরিত 'আমি' হয়ে। দেহের অণুপরমাণুতে চিৎশক্তির বিচ্ছুরণে আধারে আগুন ধরে যায় কয়লাতে আগুন ধরার মত। শক্তির প্রচণ্ড চাপে সে কয়লা হয়তো হীরা হয়ে যায়। এই রূপান্তরের ফল। তাই পরমা শক্তির গুণ-সাম্যের ভিত্তিতেই অতিমানস যোগের আশ্রিত সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব হবে।

১৮.

কর্মাধ্যক্ষ

কর্মযোগের শেষ পর্বে এসে এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে কর্মাধ্যক্ষকে (Master of the work) নিয়ে। এর আগে ব্রহ্মসংকল্প ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও সদাচারের আদর্শ নিয়ে যে বিশদ আলোচনা করা হল, তাতে আমরা দেখেছি কর্মের মূলে রয়েছে এক সঙ্কল্প—বলতে পারি তাঁরই সত্য-সঙ্কল্প। কর্ম করার মূলে যে কামনা—সে তাঁরই ইচ্ছা। সে কিন্তু আমাদের কামনা নয়, অথচ আমাদের কর্মযোগের ফলস্বরূপ তাঁরই সত্য সঙ্কল্প রূপায়িত হয়ে উঠবে, এ তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের কামনায় আমরা জড়িয়ে পড়ি বলেই আমাদের কামসঙ্কল্প সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর সঙ্কল্প বা সত্য সঙ্কল্পে সেই "সোঽকাময়ত", "তদৈক্ষত", তাঁরই কামনা তাঁরই ইচ্ছার কথা ঘোষিত হয়েছে। তারপর সেই কামনা ও সঙ্কল্প ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির তিন গুণের ধারায় কেমন করে প্রকাশিত হল, এটা বুঝে দেখতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, জগৎ এই তিন গুণের লীলায় চলেছে। গুণাতীত অবস্থায় ঊর্ধ্বে থেকে ওপারে উজিয়ে যাওয়া হ'ল যোগের ভাষায় উত্তার, গুণের ক্রিয়া সেখানে স্তব্ধ। সেখানেই থেকে গেলে শক্তির সম্যক্ পরিচয় মেলে না, তাই গুণলীলার ভিতরেও শক্তিকে চিনে নিতে হবে। আমরা যাকে বলি জীবশক্তি, তা ঈশ্বর-শক্তি বা ব্রহ্ম-সঙ্কল্পের মধ্যেই বিধৃত। সেই ব্রহ্ম-সঙ্কল্প-শক্তি যেমন গুণের ক্রিয়ায় ক্রীড়াবান তেমন গুণক্ষোভের অতীত তার সৌম্যশান্তিতে ও গুণাতীতে ঈশ্বর-শক্তি (Superme Will-Power) স্বরূপে বিরাজমান। তাহলে আমরা বলতে পারি, যদি তাঁর মধ্যে এই গুণাতীততা গুণসাম্য ও গুণক্ষোভ একই সঙ্গে থাকতে পারে, তাহলে আমাদের প্রকৃতি ও স্বরূপে তাই। সদাচারের আদর্শে গুণাতীত থেকে উজানে যাবার

অবস্থায় গুণক্ষোভে বিচলিত না হবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কর্ম করতে আবার নেমে আসতে যদি গুণক্ষোভে ভয় পাই, তাহলে পূর্ণযোগ হল না। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা যে "নি"তে গলার স্বর চড়িয়ে তো থেকে যাওয়া যায় না। "সা"তে নেমে আসতে হয়। বিবেকানন্দ নির্বীজ সমাধিতে মগ্ন হয়ে থেকে যেতে চাইলে রামকৃষ্ণদেব তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন, বলেন "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা।" পরে তিনি বলেছিলেন যে এই চাবি বন্ধ করে কাছে রেখে দিলেন, লোকশিক্ষার কাজ শেষ হলে তবে সেই চাবি খুলে পাকা ফলটি দেবেন।

তাহলে সংসারে থেকে কর্ম করাটাই ক্ষতির কারণ হবে, তা বলা যায় না। গীতা বলেছেন কর্ম বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, যদি সেটা যজ্ঞ রূপে অনুষ্ঠিত না হয়। সংসারে থাকলে ঝামেলা আছেই; সেই যে বলা হয় যে কাজলের ঘরে কালি তো লাগবেই। তা লাগুক, তবুও সেখানে থেকেই ঐ সব ঝুট ঝামেলাকে যুদ্ধং দেহিং বলে রুখে দাঁড়াতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই বীরভাবের ওপর জোর দিয়েছেন। যে শুদ্ধ ভাব নিয়ে ঊর্ধ্ব চেতনায় উজান গতি হল, সেই শুদ্ধ ভাব নীচের এই সাধারণ চেতনায় নামিয়ে আনতে হবে। ঠাকুর ঘরে সদানন্দে বিভোর হয়ে থেকে যেই নীচে নামলাম অমনি বিক্ষুব্ধ হলাম— এই রকম হতে থাকলে পূর্ণযোগ হল না। আলোর পর আঁধার তো আসবেই, তাই তখন চাই ধৈর্য। অসীম ধৈর্য নিয়ে থাকলে আঁধারের শক্তি পরাভূত হবে, ঠাকুর ঘরের শান্তি এই এখানেও বজায় থাকবে এই হল সর্বক্ষণের সাধনা। চব্বিশ ঘণ্টায় নিয়ত কর্ম কিছুটা করি, আবার কিছু কর্ম যেন ঘাড়ে চেপে পড়ে, সে সবই কর্ম; সব রকম কর্মের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে যোগ চাই, তাঁকে সবের মধ্যে পেতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকার অর্থ হল বিশমন পাথর সরিয়ে তাঁকে দেখার মত শ্রমসাধ্য। তিনি যে আমার সব কর্মের অধ্যক্ষ, সব ছাপিয়ে তিনি সবের ওপরে; তবু সমস্ত জগতের

কর্মবিলাসের স্রোত তো তাঁরই নির্দেশে বশীভূত হয়ে চলছ। এই কর্মাধ্যক্ষকে সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণ রূপে দেখে মনে হয় বড় উঁচু সুরে বাঁধা এই ভাব কি শুধুই সিদ্ধের জীবন-বেদ? কিন্তু সাধকের অনুভূতি এই পথ ধরেই চলে। কর্মযোগের যজ্ঞেশ্বর প্রভু যিনি, বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বগত হয়েও তিনি ব্যক্তিগত; আমার জীবন-যজ্ঞের প্রভু। গীতার ভাষায় ক্ষরপুরুষ ও অক্ষরপুরুষ নিয়ে ও তাদের ছাপিয়ে রয়েছেন যে পুরুষোত্তম, সেই উত্তম পুরুষকে জীবনের প্রভু রূপে পাওয়া চাই। তখন ব্যষ্টি বিশ্ব ও লোকোত্তর এই তিন ভাবেই দৃষ্টি খুলে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ লোকোত্তর প্রতিষ্ঠায়—গীতায় যেখানে নৈষ্কর্ম্যের সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সেখানে চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে নিয়ে রেখে দেখিয়েছেন যে সেখানেও কর্ম ত্যাগ করা নয়। কর্ম না করে সেখানে প্রতিষ্ঠা হয় না, আমরা এ বিষয়ে ভুল বুঝে থাকি। কর্মের প্রেরয়িতা তিনি, কর্মের পিছনে তাঁকে দেখতে হয়। প্রকৃতির বশে অবশের মত যে কর্ম হতে দেখা যায়, সে সব কর্মের উর্ধ্বে তিনি। তার অর্থ এ নয় যে কর্মের স্পন্দ সেখানে নেই। প্রকৃতিই সকল কর্মের কারয়িত্রী আর পুরুষ শান্ত নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা এই উপলব্ধিই নৈষ্কর্ম্য। কিন্তু সে উপলব্ধির কর্ম ত্যাগ করে তবে পাওয়া যায় এই ধারণা ভ্রান্ত। এরপর বিশ্বময় বিশ্বগতভাবে যে তাঁর বিসৃষ্টি তাঁর উল্লাস উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, সে তো ঐ নৈষ্কর্ম্যেরই কর্ম। পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির কর্ম, পুরুষের দৃষ্টির বাহিরে প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। বিগ্রহে পুরুষকে দেখলে বোঝা যায় যে জড়ের আধারে প্রাণচৈতন্য নিয়ে তাঁর এক অপরূপ বিগ্রহ মানুষ দেহধারী মানুষের মতই। তাঁর ঐ মানুষ দেহধারী বিগ্রহকে সাক্ষিচৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্ম করতে শিখতে হবে। জীবনের কর্মে এই ভাব আরোপ করতে পারলে কর্মযোগের পথ খোলে। জগদতীত সত্তায় থেকে তিনি যেন কিছুই নিজ হাতে করছেন না অথচ সব কর্মই হয়ে চলেছে। তিনি চাতুর্বর্ণ্যের স্রষ্টা তবুও তিনি অকর্তা। 'আমার

কোন কর্তব্য নেই, তবুও কর্ম করে যাই'—এই রকম এক ভাব। চেতনার এক ভূমি আছে যেখানে কর্ম নেই, সেই প্রশম বা শান্তির অবস্থাই কর্ম ঢেলে দিচ্ছে। গভীর ঘুমের সেই প্রশম সুখের অবস্থাই অকর্ম। আর তাই অকর্তার কর্মের উৎস।

কর্মের গতি অতি গহন, কর্ম অকর্ম বিকর্ম এই তিনের রহস্যই বুঝতে হবে। বিকর্ম হল সেই ধরণের কর্ম যা ঠিকমত হয় না, এলোমেলো হয়; আর সেই কারণেই কর্ম ত্যাগ করে আমরা পালাতে চাই। অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম দেখাই কৃৎস্নকর্মকৃৎএর কর্ম। গীতা যেমন বলেছেন, "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ"; এই হল বুদ্ধিমানের কর্ম। আমরাও কিন্তু সমগ্র দৃষ্টি দিতে পারিনা বলে এটা যেন ঠিক বুঝতে পারিনা যে নবদ্বার পুর এই দেহের মধ্যেই প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে পরমানন্দে যিনি বাস করেন, সেই নৈর্ব্যক্তিক পুরুষই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা হলেই শুদ্ধি ও শান্তির দৃঢ়ভূমি অধিগত হয়। সাধারণ চেতনায় অকর্মে কর্ম ভুল হয়ে যায়, কিন্তু একটা ঘুমের ভাব রেখে যদি কর্ম করি, আবার কর্ম করে যদি বুঝি যে কিছু করিনা, তাহলে কর্মে বন্ধন হয় না। কর্ম যেন ঢেউএর মত চলে যায়, কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। তাই সাধারণ চেতনার দৃষ্টিকোণ দিয়ে অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম বোঝা যাবে না, একটা সমগ্র দৃষ্টিকোণ (totality of vision) নিয়ে আমাদের দেখতে ও বুঝতে শিখতে হবে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত নাহি তুয়া আদি অবসান।" সেই তিনি, তাঁকে তো কিছুই টলাতে পারে না, তাঁর থেকেই বুদবুদের মত জলবিম্ব সৃষ্ট হচ্ছে, আবার তাতেই মিলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত। এই বোধে স্থিত থেকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়, উত্তেজিত হলেই মুস্কিল। আবার উত্তেজনা নেই বলে কাজে এক ম্যাদাটে ভাব কোন স্ফূর্তি নেই, তা হলেও চলবে না। কর্মে উদ্দীপনা থাকা দরকার,

উদ্দীপ্ত কর্মে অন্তরে প্রশান্তি বজায় থাকবে। গুণাতীত উর্ধ্বে অবস্থিত বলে তা যেমন সৎ বস্তু, তেমনি তারই মধ্যে সেই প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, যাকে আমরা বলেছি দিব্যসঙ্কল্প বা সত্যসঙ্কল্প। ঐ ইচ্ছাশক্তির প্রভু তিনি, তাঁকে সেই ভাবে ব্যক্তি-রূপে যখন দেখতে ও বুঝতে পারব, তখন আমার মধ্যে তাঁকে পাব বা আত্মার প্রতিষ্ঠা লাভ করব। কিন্তু সেই অতিষ্ঠায় বা লোকোত্তর চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ও এক বিশ্বব্যাপী. সমগ্র চৈতন্যে ব্যপ্তিরূপে স্থিত হতে না পারলে তাঁর ব্যক্ত মানুষী তনুকে বোধে আনা সম্ভব হয় না। ভগবান বলেছেন "অবজানন্তি মাং মূঢ়া···· সর্বভূতের ঈশ্বরস্বরূপ আমার পরম সত্তা না জেনে মনুষ্য দেহে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করে।" তাঁর গুণাতীত (transcendent) বিশ্বাত্মক ও বিগ্রহবান তিনটি ভাবই ভাল করে বুঝতে হবে। এর মধ্যে একটিকে ধরে থেকে অপর দুটি ভাব না ধরতে পারলে ভুল হয়ে যায়। তিনটি ভাবকে এক সঙ্গে জীবনগত করে ধরে না চলতে পারাই যোগের পথে মূঢ়তা।

আমার মধ্যে তার ভিত্তি কোথায় কি ভাবে? আমার দেহ রয়েছে, রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে আমার সংসার; তাতে আমি রস পাই, তাই আসক্তিতে আমার চিত্ত বাঁধা পড়ে আছে। বলতে পারি 'আমি' যতটা সত্য, আমার বাসনা কামনা এ সবই আমার কাছে নিরেট সত্য। কিন্তু সেখানে তো আমি একা নই, শুধু আমাকে নিয়ে তো আমার সব কিছু চলে না। বাসনা কামনা নিয়ে সকলের সঙ্গে তো আমি মিলতে পারি না। তখন বিশ্বগত ভাবে এই বাসনা কামনার রাজ্যেও নিজের ব্যক্তিগত বাসনা কামনার সঙ্কীর্ণতা ছেঁটেফেলতে হয়। জীবনে অপরের সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সামাল দিয়ে না চলতে পারাটা নাবালকত্ব। সাবালকত্ব হল নিজেকে কেন্দ্র করে নিয়ে প্রথমে একটা পরিবার বৃত্ত হয়, তা থেকে হয় সমাজ, তারপর তা থেকে সারা বিশ্বে সবার মধ্যেই নিজের পরিবার ও সমাজবোধের ভাব জেগে উঠে সে বৃত্তের পরিধি ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে ওঠে। সে বৃত্তের কেন্দ্রে এই

অহং বিন্দুটিই থাকে, কিন্তু পরিধি বাড়তে বাড়তে অনন্ত হয়ে যায়। অহংএর ভাবরূপ বদলাতে থাকে। কখনও কিছুই ভাল লাগে না, সমাজ সংসার জীবনের কলরব সব কিছু থেকে ছুটি চাই, নির্জনতার শান্তি চাই। নিজের আত্মার মুখোমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আসে এক নির্বেদ, এক তুরীয় অবস্থা। যেমন ঘুমের মধ্যে আমি আর জাগ্রতের আমি থাকি না, সেই রকম ঐ তুরীয় অবস্থায় আমার বিষয়-রূপ যে জগৎসংসার তাও থাকে না, তার বিষয়ী আমিও থাকি না। এই ভাবেই বুঝে নিতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে ছাপিয়ে গুণাতীত তুরীয় হয়ে যেমন আছেন, তেমনি জগৎ-প্রপঞ্চের উল্লাসও তো তাঁরই। সৃষ্টিতে তিনি ফুল ফুটিয়েই চলেছেন, একটা ঘাসের ফুল ফোটাতেও যেন তাঁর লক্ষ যুগের তপস্যা; তাতে কোনও শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই, অনন্ত সময় হাতে নিয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে চলেছে তাঁর ফুল ফোটাবার তপস্যা। তাতে তাঁর ক্ষুদ্রতম অংশেরও কলানৈপুণ্য যেমনই বিস্ময়কর তেমনই অন্তহীন এক সমদৃষ্টি ও সমান যত্নে বিধৃত। শ্রীঅরবিন্দ মহাসরস্বতীর শক্তিকে বলেছেন এই কর্মনৈপুণ্যের (perfection in details) দেবতা। ব্যক্তিগত ভাবে যোগকর্মের লক্ষণ হল এই একাগ্রীকরণতা দিয়ে কর্মকলায় নিপুণ হওয়া। একদিকে মহাশূন্য আকাশ হয়ে চেতনা ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে আছে, তার কোনও কূল কিনারা নেই, অপর দিকে ঘনীভূত কেন্দ্রীণ বিন্দুরূপী আত্ম-চৈতন্য—এই দুই দিকই মিলিয়ে নিতে হবে আত্মায়। এই বিন্দুতে সিন্ধু বা আকাশ নামিয়ে নিতে হয়। তাতে এমনও হয় যে এই "আমি"র গণ্ডী ছাপিয়ে বিশ্বগত এক আমি হয়ে গেলাম, তিনি আমার মধ্যে তাই চাইলেন। এমনি করেই সমগ্র বিশ্বে একই রূপে তিনি সব কিছু গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর লীলাবাদে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে সব কিছু করার পিছনে তাঁরই লীলার আনন্দ। কিন্তু যখন দেখি যা হওয়ার লক্ষ্য ছিল তা হল না, অন্যায় করে সত্যকে আবৃত করা হল, তখন আর লীলাবাদের

ব্যাখ্যায় মীমাংসা করা চলে না; সমস্যাকে যেন পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যে জগ'কে আমরা তিন গুণের ভিতর দিয়ে দেখি তা হল অর্ধসমাপ্ত জগৎ। আর সেই কারণেই আমাদের জীবনে যখন আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তখন আমরা এই জগৎকে নিখুঁৎভাবে দেখতে ও রাখতে চাই এমন ভাবে যে সেখানে উত্তম রীতি ও নীতির পরিচালনায় কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না। আদর্শকে নিপুণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে। এক কথায় জগৎ ও জীবনের ছন্দ যাতে যথার্থ ভাবে সুরে ও তালে সমন্বিত হয়ে চলতে পারে, সেই সত্য কল্পনাই আমাদের কর্মের প্রচোদনা। বাস্তব জগতে বেসুরো বেতাল বলে যেটাকে জানতে পারি, সেটাও যে অখণ্ড ভাবে দেখলে তাঁর লীলারই এক খণ্ড দৃশ্য, তা বুঝতে পারলে তিতিক্ষার শক্তিলাভ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু তাকে তো সঙ্কল্পের শক্তি বলা চলে না। ঐ অসম্পূর্ণতাকে আমার সম্পূর্ণ করার এক দায় আছে, আর সেটাই তো আমার সঙ্কল্প। কেন না তিনি নিজে তো তাই করে চলেছেন। মহামানব যখন আসেন, তখন আমরা এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি, কিন্তু এদিকটার পরে আমাদের দেশে যেন ততটা জোর দেওয়া হয় নি। লোকোত্তর ভূমি থেকে নেমে তিনি বলেন "উদ্দিধীর্ষু"—এই অপূর্ণ জগৎকে পূর্ণচৈতন্যে তুলে ধরতে তাঁর তপস্যা। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর তাঁর এই দায়িত্ব তাঁকে সাতদিন ধরে ঘুরিয়েছে। তিনি পদচারণা করেছেন আর চিন্তা করেছেন যে এ কি জগৎকে দিতে পারব না দেব না। মায়ের বাণী থেকেও আমরা তাঁর এই এই দায় সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জগৎ-সংসারের চেহারা দেখে বলা চলে না যে সবই ঈশ্বরেচ্ছায় ঠিকভাবেই চলছে। এইখানে বসে তাই এক তপস্যা চাই—সিদ্ধজীবনের সেই দায় সত্যসঙ্কল্পরই দায়। তাঁর নিজের জীবনে ব্যষ্টির সাধনাসিদ্ধ করে তিনি দেখিয়ে দিলেন সেই সত্যসঙ্কল্পই তাঁর ইচ্ছা।

তাই আমাকে প্রাণ দিয়ে সেই তপস্যাই করতে হবে। তাতে জগৎকে পরিবর্তিত করার কথাও ওঠে, নচেৎ তাঁর ইচ্ছাশক্তির (Supreme will) কথা শুধু বললেই সিদ্ধ করা যায় না। তিনি যে সচ্চিদানন্দ এটা ফলিত করে দেখতে ও দেখাতে হয়। তাঁর শক্তি কর্ম তপঃ এসব তো তাঁর সচ্চিদানন্দ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। আমরা দেখেছি তাঁর জ্ঞানময় তপঃ সৃষ্টিকর্মের মূলে, আর তাতে আমারও অংশ রয়েছে। তিনি সৎলক্ষণে যোগনিদ্রার প্রশান্তিতে যেমন থাকেন, তেমনি আবার তারই মধ্যে আলো ফুটল—আর তা বহু আলোর বিশ্ব (Perfect worlds), তাও জানতে হবে। তন্ত্রে তাকে বলা হয় সদাখ্য তত্ত্ব। আর ব্রহ্মসদ্ভাব, সেখানে তখন বহু নেই। চিৎ-এর স্ফুরণে অনন্ত ব্রহ্ম, তারই বিস্ফোরণে পরমাত্মা। এ দুইই লোকোত্তর চৈতন্যের অবস্থা —কালাতীত। তাতে যখন আনন্দের লক্ষণ দেখছি, দুদিকেই দেখতে পাই। একদিকে তিনি আত্মারাম একার্ণবীকৃত সমুদ্রে অনন্তশয়ান ভগবান বিষ্ণু— "যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।" তাঁরই হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নে যেমন ফুটছে জগতে স্বপ্নরূপ লীলাকমল, তেমনি তারই প্রতিষেধ রূপে জড়ত্বের অভিঘাতে বেরিয়ে আসছে কর্ণমল। এই রহস্যের পেটিকাতেই বিষ্ণুর পার্শ্ব পরিবর্তন জাগরণ ও উত্থান। কিন্তু অপর দিকের বিপরীত কোটিতে যে চিরনিথর অপ্রকাশ সেই সব নিয়েই দেখা দেয় যে জড় বস্তু, তা হল সদ্‌ব্রহ্মেরই প্রকাশের বিপরীত দিক বা উল্টা পিঠ। এই জড়ের মধ্যে চিৎকে ফুটিয়ে তুলতে হবে—সেই তাঁর আনন্দলীলা আর সেই তাঁর ইচ্ছা। সপ্তশতীতে দেখেছি দেবী মধপানের আনন্দে অসুররূপা জড়শক্তিকে আঘাত হানছেন। আমাদের জীবনে এই শক্তিকে চিনে নিতে পারলে, তাঁর আনন্দময়ী শক্তিতেই অন্ধকারের গলিঘুঁচি বক্রতা সব জয় করতে পারব। সৎ-শান্তির আধারে চিদানন্দ নিয়ে তাঁর কর্মই আমরা করব, আর তাই হবে বিশ্বকর্ম, তাঁর আনন্দের কর্ম। বিশ্বাতীত বিশ্বগত বিশ্বব্যাপী ও ব্যক্তি-বিশ্বের কর্মযোগের ঐ হল মূল কথা। ব্যক্তির

কর্ম তখন তাঁরই তপস্যার অগ্নিকণার বিচ্ছুরণ, এক কথায় সে কর্মে তাঁরই প্রকাশ।

কিন্তু এ ভাবে কর্ম করা তো আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। ঐ পথ চলার নির্দেশ জানা নেই, আঁধারে পথ ঠাহর হয় না। তাঁর বাঁশীর ডাকে পথে বেরিয়ে পড়েছি। কোন পথে চলা ঠিক হবে, তা বুঝতে পারছি না, তখন কি করব? তখন বোঝা যায় যে আসল পুঁজি হল হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ধৈর্য। শ্রদ্ধা হল কিশোর চিত্তের সেই প্রত্যয়, যা সত্যের আভাস পেয়ে তাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করে ধরে থাকে চিরজীবনের মত। শুধু বিশ্বাস বললে শ্রদ্ধাকে ধরা যায় না। বিশ্বাস থাকলেই যে শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটবে, তা বলা যায় না, Life Divine গ্রন্থের গোড়াতেই শ্রীঅরবিন্দ শ্রদ্ধাকেই (Faith) মূল সম্পদ বলেছেন। কি করে ঐ পথসঙ্কটে তিনি পথ চলার নির্দেশ দিয়ে দেন, তা যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। তবুও কিছুতেই ভুলতে পারি না যে "আমার এ আঁধারে চালায় কে গো"। যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, তা হৃদয়ের সেই আলোকে, সত্যের সেই আত্মপ্রত্যয়কে কিছুতেই নষ্ট করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে তর্কবুদ্ধিও মাথা তুলে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু কবির ভাষায় "যুক্তি তারে পরিহাসে, মন তারে সত্য বলে জানে।" মনের এই সত্য বলে জানাই হল হৃদয়ের আকৃতি বা শ্রদ্ধা। তখন কিন্তু কিছুটা আয়াসের প্রয়োজন আছে। একবার যখন ওপরের আলো ডাক দিয়ে গেছে, তখন সেটা আর জীবনের পথ থেকে একেবারে চলে যেতে পারে না, তবে তার তীব্রতা ঠিক এক রকম থাকে না। মাঝে মাঝে সেটা দেখা দেয় জোরও ধরে, আবার যেন আকাশে মিলিয়ে যায়। মূলে থাকে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধায় হয় গোত্রান্তর। মেয়ের বিয়ে হলে তার গোত্রান্তর হয়ে যায়, কিন্তু সেই মেয়ে যখন মা হয় তখন তার রূপান্তর আসে। সেই রকম গোত্রান্তর থেকে চাই রূপান্তর, তবে না যোগের সার্থকতা।

সাধারণ দীর্ঘ কাল তাতে লেগে থাকতে হয়, তাই তখন চাই ধৈর্য। কিছুটা করে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। শ্রীঅরবিন্দের প্রিয় শ্লোক গীতার "নিশ্চয়েন হি যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণেন চেতসা"—হতাশ মনমরা ভাব নিয়ে চলা যাবে না, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে চলতে হবে। আমরা অধীর হয়ে পড়ি এবং তখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কোনমতে কেল্লা ফতে করব, এ ভাবে আমাদের পেয়ে বসে। যোগের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর। রাতের আকাশে তারার আলো যেমন নিঃশব্দে ফোটে আর পৃথিবীর বুকে ফুল ফোটার পালায় যেমন এক নীরব শান্ত ছন্দ আছে, সেই শান্ত স্বাভাবিক ছন্দ ঢাকা পড়ে যায় ঐ রাজসিক ব্যাকুলতার অস্থিরতায়। অহংই স্ফীত হয়ে ওঠে রজোগুণের ঐ বিপরীত পরিণামে, আর তাতেই তাঁর শান্ত দৃষ্টির আলোকে ঢেকে দিতে চায়। তবে কি সব ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে হবে? না, শান্তরসের ক্রিয়া তা নয়। সমনস্ক সদাশুচি হয়ে থাকতে হবে, সেটা মনে রাখা চাই। ছটফট করে সব কিছু পণ্ড করব না, সেটা ঠিক। কিন্তু এখনও যা হবার তা হয় নি, তাঁকে যে পাই নি, সে বেদনা বহন করতে হবে বৈ কি। কবি বলেছেন "তোমায় আমি পাই নি যেন সেই কথা রয় মনে, যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" শয়নে স্বপনেও তাঁর বিরহের আকৃতি আমার প্রত্যহের জীবনে বীর্যসঞ্চার করবে, তবেই আমার আকূতি তীব্র-সম্বেগসম্পন্ন হয়ে সিদ্ধ হতে পারবে। তা না হলে প্রাণশক্তির জোর যেখানে বেশী, সেখানে উৎকট সাধনায় কিছু শক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু জড় উন্মত্ত পিশাচবৎ হয়ে আধারের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে লোকে পাগলও হয়ে যায়। আমরা বরাবর শুনে এসেছি পূর্ণযোগের আদর্শ সেটা নয়। ঐ রকম উৎকট সাধনায় শক্তি লাভ করলে অপক্ব পাত্রে সোমরস ঢালার মত অবস্থা হয়। অশুদ্ধ আধারে শক্তির অবতরণে পাত্র বিদীর্ণ হয়ে যায়, অথচ অহমিকা স্ফীত হয়ে উঠে সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। তাই শক্তির অবতরণে আত্মনিবেদনের প্রশান্তিকে

ধরে রাখার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু তাই বলে তামসিক সমর্পণের জড়ত্বকে প্রশান্তি বলে ভুল না করি, সেটা দেখতে হবে। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে যে, ডাকাত পড়া ভক্তি চাই। তামসিক সমর্পণ হল ভ্যাদভ্যাদে চিড়ের ফলারের মত, সেটা পরিহার করতে হবে। আবার শক্তিরও ভাণ্ডার লুটে নেব, এরকম রাজসিক উগ্রতা ও অস্থিরতা ছাড়তে হবে। তাঁরই স্বরূপে নিজের সব কিছু দিয়ে দিতে হবে তো। সেই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে তাঁর লোকোত্তর গুণাতীত পরম সত্তাটিকে জোর দিয়ে ধরতে হবে। তিনি যে সব ছাপিয়ে ঐ আকাশ হয়ে সবের ঊর্ধ্বে থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ! তিনিই যে আমার স্বামী, আমার গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন, আমার সেই অভিমান। এবার আমার রূপান্তর ঘটাও, একেবারে তোমারই করে নাও; আমার সব কিছু আমি সঁপে দিই তোমাকে। কিন্তু তুমি কে, সেখানে আমার ও তোমার মধ্যে কোন আবরণ ধূমায়িত হয়ে থাকলে তো চলে না। বিশ্বাতীত বিশ্বব্যাপ্ত হয়েও তুমি আমার একান্ত আপন জন। তুমি আমাকে স্বীকার করেছ বলেই না আমার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। এখন যা করবার তুমিই করো। তিনি তখন কি করবেন? যা আমার সত্যস্বভাবের অনুকূল, সেই স্বধর্মের পথ ধরেই তিনি চালিয়ে নেবেন।

কিন্তু আমাদের গোলমাল হয় যখন আমরা স্বকর্ম নিয়ে পরের মুখে ঝাল খেতে যাই। সাধুসঙ্গ করতে গিয়ে জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে কর্ম ভুলে গেলাম, আবার ভক্তিবাদীর প্রভাবে হয়তো স্বকর্ম ছেঁটে ফেলে অযথা হৈ চৈ করে মত্ত হয়ে উঠি; তাতে সব মাটি হয়ে যায়। গীতা তাই সাবধান করেছেন যে, স্বধর্ম যখন পেয়েছ সেটাকে ধরে থাক, পরধর্মে লোভ করতে যেও না; সেটা হবে ভয়াবহ। সাধারণত অধ্যাত্মজীবনে রসংর্জনের পথ ধরতে গিয়ে এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে পড়তে হয়। চারিদিকে দেখি রসের ধারাই চলেছে, তবুও সেখানে রস

বাদ দিতে গিয়ে একেবারে ভঁটকো হয়ে পড়ি। কিন্তু স্বধর্মের পথে যদি তাঁর হাতটি ধরা থাকে তবেই রসে বসে চলে স্বধর্ম ও স্বকর্মকে পুষ্ট করতে পারব। আর তখনই পরধর্ম ছাড়তে পারব।

কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের পথে পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—বাধা আসেই। শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে বসে, এমন অবস্থা বারবার হতে পারে। কিন্তু তিনি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে হবে। আর তাহলে দেখতে পাব যে পতনের মধ্যে বা ভুল করার মধ্যেও সত্যেরই উপলব্ধি হচ্ছে। সিদ্ধচেতনায় সমগ্র পথ যখন উদ্ভাসিত হয় তখন দেখা যায় যে জীবনের ভুল ভ্রান্তি বাঁকা-চোরা পথ, সে সব জিনিষেরই অর্থ আছে। তিনি সে সবের মধ্যে হাত ধরে নিয়ে গেছেন। আর ভুল করে পড়ে না গেলে এত বড় সত্যকে বোধকরি দর্শন করতে পারতাম না। এ সত্য ঋতের সত্য, এ বোধও অনেক পরের কথা। তিনি সত্য তিনি ঋত। মন দিয়ে আমরা সত্যাসত্যের বিচার করে থাকি, কিন্তু মন দিয়ে তো পূর্ণকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই অসত্য ও ও অনৃতের যে তাৎপর্য আছে, সেটা প্রথমে বোঝা যায় না। জড় ও চৈতন্যকে শেষ পর্যন্ত আমাদের মিলিয়ে নিতে হবে, তা না হলে অধ্যাত্ম-জীবনে সত্তার পুষ্টি হবে না। তাই তিনি নিজেই এই ভাল ও মন্দের দৈত্যের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমার কর্মাধ্যক্ষ। বিবেকানন্দের শেষ জীবনের উক্তিতে আমরা পেয়েছি, তিনি বলেছেন তিনি যেন প্রশান্তিতে শুয়ে আছেন, ভুলও যে করেছেন তাও সত্য, তা থেকে যা পেয়েছেন তাও সত্য। বৈদিক ঋষির কাছ থেকে শুনি তিনি ঊর্ধ্বে সবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন যে পথের মধ্যেই তুমি আলো গুটিয়ে নিলে বাঁচি কি করে—"তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।...।" তিনিই আলো গুটিয়ে নিলেন অর্ধপথে কর্ম অসমাপ্ত রইল, সেটা ঠিকমত বুঝতে পারলে সত্যদর্শন হয়। বিবেকানন্দের স্বল্প আয়ুর জীবন দেখে আমরা বলে থাকি যেন

তাঁকে অর্ধেক পাওয়া গেল, পুরোটা যেন আর হয়ে উঠলো না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে কুমোর কাঁচা হাঁড়ি পাকা হাঁড়ি সব এক সঙ্গে রোদে মেলে দেয়। সেখানে গরু এসে মাড়িয়ে দিলে কাঁচা হাঁড়ি কতগুলি ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পাকা হাঁড়ি আর ভাঙে না। এই যে পরাভব—এ জীবনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হল না, সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেয়ানা হলে বলতে পারব, না হক, এও তুমি। এই পরাভব গ্রহণ করে তোমাকেই জয় দিয়ে যাব। সিদ্ধি হল না, কাঁচা হাঁড়ি হয়ে যদি ভেঙেও যাই, হাঁড়িকার কুমোর তো তুমিই! "মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে!" তোমাতেই আছি, ফিরব তোমাতেই। এই হল বীর্যের পরিচয়, এ বড় গভীর প্রত্যয়ের কথা। এর মূলে হল শ্রদ্ধা, সেটা থাকলে আমার দাহ ক্ষতি পাপ স্খলন সব কিছু নিয়েও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব।

> "জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি! জয় তোমারি করুণা।
> জয় তব ভীষণ সকল কলুষনাশন রুদ্রতা।...."

এ আত্মসমর্পণ কিন্তু গুণাতীত পুরুষের কাছে নয়, কেননা গুণসাম্যের সে অবস্থায় তিনি কি আর সমর্পণের ধার ধারেন? তাঁর মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এ সমর্পণ প্রেমের ভক্তির ও শক্তির সমর্পণ। আত্মপ্রতিষ্ঠা হল পুরুষেরই রূপ, আর তিনি যে জননী, সেই চৈতন্য এবং মহাশক্তির যুগনদ্ধতা হতেই জগৎ বা জীবের জীবন। প্রত্যেকটি জগৎ বা জীবের পিছনে রয়েছেন ঐ মহাশক্তি। সবাইকে আবিষ্ট করে রয়েছে অন্তর্যামী পরম চৈতন্যর ঈশনা। তাই ভুবনেশ্বরী মহাশক্তিই আমাদের জীবনযজ্ঞে সর্বকর্মের ঈশানী মা।

তাহলে পেলাম যে কর্মে আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে আমাদের কর্মযোগ পথ চলা শুরু হয়। তারপর আমি করছি এই কর্তার ভাব ছেড়ে কর্ম করতে হবে। তখন হয় যন্ত্র হয়ে বা নিমিত্ত হয়ে কর্ম করা। গীতায় শ্রীভগবান

অর্জুনকে নিমিত্ত হতে বলেছিলেন তাঁর সংহার কর্মে। তিনি পূর্বেই যাদের নিহত করে রেখেছেন, তাঁর সেই সিদ্ধ সংকল্পশক্তি কালের গতি অনুযায়ী কার্যকর করে তুলে তাদের নিহত করা—সেই ভাবের ফলিত কর্মই হল নিমিত্ত কর্মের মূল কথা। কর্মের গতিতে আমরা পরপর চারটি অবস্থা দেখতে পেয়েছি। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে"—এই আমি কর্তাই প্রাকৃত কর্মের কর্তা। আমার কর্তৃত্ব নেই, তবুও মনে করি যে আমিই কর্তা। তা থেকে যখন বুঝতে পারি যে প্রকৃতিই কর্ম করিয়ে নিচ্ছে, তখন দেখতে শিখি প্রকৃতিতে কর্ম কিভাবে হয়ে চলেছে। সেই কর্মে যোগ দিয়ে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হবে, ফলের আকাঙ্খা করা চলবে না। তখন কর্মে অকর্ম দেখা বা অকর্তার ভাব পোষণ করে কর্ম করা হবে। তা থেকে আসে নৈষ্কর্ম সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধিতে বা কর্মে আসক্তি থাকবে না। অকর্তার ভাব বা কর্মে অকর্ম দেখা কর্মযোগের প্রথম কথা; কেননা গুণের অধীন হয়ে চলা যোগের পথ নয়। প্রকৃতিতে তিন গুণের খেলায় কুরুক্ষেত্রের হানাহানি দেখে যাই। তাঁরই ইচ্ছায় দুই পক্ষ হয়ে কৌরব ও পাণ্ডব যেন পরস্পরকে আঘাত করে চলেছে—ঐ হল ঘোর যুদ্ধ কর্ম। তাঁরই ইচ্ছা না হলে কিছুই হত না; তখন কিছুই নেই, কিছুই দেখি না। তাই ঐ যুদ্ধকর্মেও প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। কাজেই বিশ্বগত ভাবে দেবতাকে না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধকর্মে নিমিত্ত হওয়া যায় না। বিশ্বচক্রের এক একটি অর যেন এক একটি জীবের জীবন বা জগৎ, কদম্বকেশরের মতই তারা বিধৃত রয়েছে ঈশাধিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মহাশক্তিতে। তাই ব্যক্তির জীবন বিশ্বজীবনেরই অঙ্গীভূত। মূলে তাঁর ঈশনা বা সত্যসঙ্কল্প তাঁর বিশ্বকর্মে আমাকে দিয়েও একটা কিছু কর্ম করিয়ে নেবে। তাঁর সেই সত্যসঙ্কল্পে তিনি অকর্তা থেকেও কর্মের প্রবর্তক ও প্রকৃত কর্তা। এই বোধে কাজ করতে থাকলে অনেক সময় তিনি ও আমি এক হয়ে যায়। সে অবস্থায় গীতা বলেছেন যে দিব্যকর্ম ও দিব্যজন্ম যে জানে

সে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেমন করে তা হয় সে কথা খুলে বলেন নি।
অর্জুনের কর্মও নিমিত্ত কর্ম, দিব্য কর্ম পর্যন্ত সে কর্মের গতি হয় নি।

শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের শেষে ঐ কথাই বলেছেন, যে দিব্য কর্মের রহস্যও জানতে হবে। নিমিত্ত কর্মেরও পর পর কয়েকটি অবস্থা আছে। প্রথম দিকের ভাব হল আমি তাঁর যন্ত্র হয়ে যাই, তাঁর হাতের বাঁশী। কিন্তু শুধু যন্ত্র হয়েই তো আমি থাকি না। তাঁর হাতের বাঁশী যখন তিনি বাজান তখনতো বাঁশীই সুর হয়ে বয়ে চলে। বাঁশী থেকে সুর তখন আর ভিন্ন থাকে না। এই রূপান্তরের অবস্থা বিশ্বগত ভাবেরও অতীত, তাকে ছাপিয়ে চলে। অতিমানস রূপান্তরের কথা তখন আসে। তার পূর্বের অবস্থায় নিমিত্ত কর্মে সালোক্য মুক্তি পর্যন্ত লাভ হলেও সাযুজ্য আসে নি। সেই অবস্থা চলতে থাকলে তাঁর শক্তির অবতরণ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে যায় পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তরের পথে। তাই তাঁর হাতের যন্ত্র তাঁর রসনির্যাসের ফোয়ারা হলেও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয় না। যন্ত্রের অনেক গোলমাল দেখা দিতে পারে। এই 'আমি'টা বড় বেয়াড়া, যন্ত্রের অহংকারের ভাব এসে তখন আসক্তি দেখা দিতে পারে। তাঁর সালোক্য পৌঁছেও "আমি তোমার হাতের বেণু হয়েছি, আর তো কেউ হতে পারে নি," এই রকমের এক সূক্ষ্ম দুর্ভেদ্য অহং-গ্রন্থিতে আটকে যেতে হল, এমনও হয়। রবির তাপে তপ্ত বালির মত অসহ্য উত্তপ্ত এক অহংকারে পথ চলা বন্ধ হয়ে গেল, সে অবস্থাকে পেরিয়ে যেতেই হবে। এই রকম সব ফাঁক সব আড়ালই শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে যেতে পারলে দিব্য কর্মে পৌঁছান যাবে। একেবারে তিনি হয়ে যেতে হবে। দিব্য কর্মের অবস্থায় অহংএর কোন চিহ্ন আর আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। ঘটে-ঘটে বিরাজ করে শুধু তিনিই কর্ম করে চলেন। কর্মযোগের পরাগতি বা কাষ্ঠা হল এখানেই।

১৭

দিব্যকর্ম

কর্মযোগের শেষের দিকের আলোচনায় এবার আমরা এসে পড়েছি দিব্যকর্মের প্রসঙ্গে। Supramental work সম্বন্ধে যে অধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। দিব্য জন্ম লাভের পর যে দিব্যকর্ম, সেই প্রসাদের (Grace) অবতরণে ঐ সিদ্ধকর্ম সম্ভাবিত হবে। কিন্তু সে তো সাধ্য নয় সিদ্ধ, তাই তা ঠিক আমাদের আলোচনায় ধরা পড়ে না। গীতায় দিব্য কর্মের উল্লেখ থাকলেও সে সম্বন্ধে আলোচনা বা নির্দেশ তত স্পষ্ট নয়।

সমস্ত কর্মের কর্মাধ্যক্ষ তিনিই, তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম এবং তাঁরই সম্পাদিত কর্মই দিব্যকর্ম। আবার ঐ দিব্য কর্মই তাঁর ইচ্ছামত আমার ভিতর দিয়ে যে ভাবে উৎসারিত হবে, আমাকে দিয়ে যে সুরটি তিনি বাজিয়ে তাঁর সঙ্গীতে পূর্ণতা আনবেন, দিব্য সুরলোকের সেই বিশেষ ধ্বনিটি আমাকে সেধে নিতে হবে। সেটা ধরতে পারলে তবেই আমার কর্মযোগ তাঁর দিব্য কর্মযোগ হয়ে উঠবে।

গীতায় কর্মযোগের পর পর কয়েকটি স্তর দেখানো হয়েছে, তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ভগবান নিজে সেখানে নৈষ্কর্ম্যের বিরোধী হয়ে বলেছেন "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"। আবার কর্মে সর্বারম্ভপরিত্যাগী ভক্ত যে তাঁর প্রিয়, তাও তিনি অন্যত্র বলেছেন। বিবিক্ত পুরুষ দ্রষ্টা আর প্রকৃতিই কর্মকর্ত্রী, এই ভাবে পুরুষই নৈষ্কর্ম্যের আধার। কি রকম? না নিজে থেকে কোন কর্ম ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে না, অথচ কর্ম করা হয়ে যাচ্ছে, এই হল ভাব—অকর্তার ভাব। তাই বলে অকর্মের দিকে যাতে ঝোঁক না পড়ে, অর্জুনকে সে ভাবে কর্মের নির্দেশ দিতে গিয়ে কর্মের বিশ্লেষণ করেছেন

এই বলে যে, কর্ম না করে কেউ থাকতেই পারে না—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"। শক্তির স্পন্দই হল জীবনের অর্থ, সে শক্তি প্রতিনিয়ত অবিচ্ছেদে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। কিন্তু তা বলে জীবনে কি অস্পন্দের অবস্থা নেই? তা তো হতে পারে না। স্পন্দ থাকলে এক অস্পন্দকেও যে থাকতে হবে। কাজেই জীবনের ছন্দে ঐ স্পন্দ ও অস্পন্দ দুইই মিলিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ কর্ম ও অকর্ম দুই মিলিয়ে তবে কর্মযোগের সিদ্ধি।

সাধারণ ভাবে জগতের দিকে তাকালে দেখা যায় ভূত মাত্রেই কর্ম করে। কর্ম না করে জীবন ধারণই হয় না, এক কথায় পেট চলে না; ভিক্ষা করেও উদর পূর্তি করতে হয়। জীবিকার সংস্থান হলে আদর্শবোধের কথা আসে। সমাজ স্থিতি বজায় থাকলে উন্নততর কর্ম সম্ভব বলে আমরা লোকসংগ্রহের কর্ম ধরে রেখেছি। তাতে সমাজস্থিতি আরও ভাল ভাবে বজায় থাকে, কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সেই কারণে প্রাচীন যুগেও ধর্মের শাসনে ও তার অনুকূলে লোকসংগ্রহ কর্ম আদর্শ ছিল। মনুষ্য-সমাজের রীতি নীতি ও ধর্মবোধ বৃহত্তর মনুষ্যজগতের স্থিতি ও গতির ছন্দ বজায় রাখে, তাতে সমগ্রভাবে সকলের কল্যাণ। এই সমাজকল্যাণ বজায় থাকে যদি প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট কল্যাণকর্ম ঠিকভাবে করে চলে। একটি সংসারে সন্তানের জন্য পিতামাতার ত্যাগ ও কল্যাণবোধ জগৎ-সংসারে ব্যাপ্ত করে দিতে পারা যায়। তাই এই দুই আদর্শ—জীবনধারণের কর্ম ও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম ধর্মজীবনে ও যোগে অনেক দূর পর্যন্ত গ্রহণীয় কর্ম হয়েছে, এটা পরীক্ষিত সত্য। এইভাবে শরীরযাত্রা নির্বাহ-রূপ কর্মকে ধর্মের অনুকূলে যোগজীবনে নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে ফেললে আবশ্যক বস্তু বা উপকরণ অতি সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া যায়। ভক্ত কবীর ছিলেন তন্তুবায়, তাঁত বোনা ছিল তাঁর জীবিকার কর্ম। সিদ্ধ পুরুষ কবীর তাঁর নিজের জন্য এককালে দুখানার বেশী বস্ত্র বয়ন করতেন না, কেননা তাঁর প্রয়োজন বেশী ছিল না। প্রাচীনকালে সাধক জীবনের ঐ অপরিগ্রহের

আদর্শ মানব সমাজের সব স্তরেই বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে মনস্বীর জীবনধারণ অত্যন্ত সরল ও সহজ হয়ে নিশ্চিন্ত হবে (plain living and high thinking)—এই নীতি এদেশের মনে বেশ দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেছিল। পাশ্চাত্য জীবনধারণের কর্ম কোলাহল আমাদের এই বহুকালের নিশ্চিন্ত জীবনে যে ঝড় তুলেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথও একদা বলেছিলেন কর্মব্যস্ততায় কর্মক্ষেত্রে গলরজ্জুবদ্ধ হয়ে মরার কথা (to die in harness)। অতদূর পর্যন্ত সর্বথা সত্য না হলেও সারাজীবন ধরে ত্যাগের তপস্যা এদেশে উচ্চতর জীবনে যে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশ্চাত্যের বিপরীতমুখী প্রাণচঞ্চল বৃত্তির পক্ষে তা হজম করা সহজ ছিল না। ওদেশের মনীষীরা এখন কেউ কেউ বুঝতে আরম্ভ করেছেন ম্যাক্সমূলারের সেই কথাটির অর্থ যে কেমন করে মৃত্যুকে জয় করা যায়, ভারতবর্ষ আমাদের তা শেখাতে পারে। সারা জীবন ধরে যে মৃত্যুর প্রস্তুতি, শেষ ধরেই যে জীবনের শুরু তাকে ধরা—এতে ত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ভোগের সমারোহকে ম্লান করে দিয়েছিল। এ থেকে যে শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাতে ধর্মের শাসনে নিজেকে রেখে প্রাণশক্তিকে একটা খাত কেটে বহাতে হবে। তার জন্য বিধিনিষেধের এক বন্ধনে অভ্যস্ত হওয়ার মূলে ছিল সংযমের সাধনা। অভাববোধকে কমিয়ে এনে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ করার প্রচেষ্টায় ত্যাগের শিক্ষা হয়। আর পাশ্চত্য সমাজে ঠিক এর বিপরীত ভাবে অভাববোধ বাড়িয়ে তুলে সমাজ জীবনে নিত্য নতুনের চাহিদায় মানুষের লোভের প্রবৃত্তি তার সদ্বৃত্তিগুলিকে যেন গ্রাস করতে বসেছে; এই অশান্তির ঝড়ে সমগ্র ভাবে জাতির জীবনে সর্বত্র অভাব বেড়েই চলেছে। শান্তিও নেই, স্বস্তিও নেই। এ দেশের নাগরিক জীবনে এই ঢেউ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে—ওদেশে জীবনের মানে অভাববোধ এনে তাকে উচ্চতর মানে তোলাই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উনিশ শতকে এই লোকসংগ্রহের কর্ম ওদেশে মানবহিতবাদ বা

পরোপকারবাদের বোধে বুদ্ধিমান মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। মিল ও বেন্থামের প্রবর্তিত নীতি তখন এদেশের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যায় ঐ লোকসংগ্রহের কর্মকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে যে দেখিয়েছেন, তাতে ঐ মিল ও বেন্থামের প্রবর্তিত নীতির প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। সকলের কল্যাণ করার জন্য কর্ম করাই কর্মযোগ। লোকমান্য তিলক তাঁর গীতার ব্যাখ্যায় কর্মযোগকে উচ্চে তুলে ধরেছেন—যোগ সর্বভূতহিতে রত এই দৃষ্টি প্রধান করে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থায় ঐ সর্বভূতের হিতের প্রতি উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু মাত্র মানুষ কেন, "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" হলে বিশ্বের কোন কিছুই তো বাদ দেবার উপায় নেই। আত্মার সম্বন্ধ হলে জগৎ-সংসারে সকলের কথাই না ভেবে তো পারি না। কিন্তু তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় এ যুগের থেকে সমাজের গণ্ডীটা অনেক ছোট ছিল মনে হয়। মানুষের নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডী বাড়িয়ে বহুকে নিয়ে সমাজ তৈরী হয়। সে সমাজ মানুষের হিতার্থেই গঠিত। কিন্তু এখন মনুষ্য সমাজ বলতে সারা পৃথিবীতে সে সমাজ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। স্বদেশ ও সমাজ এ সবের হিত করতে গিয়ে সেই হিতকে কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে সমাজকে সামলানো যাচ্ছে না। সামাজিক বা সমষ্টির মধ্যে একটা মনস্তত্ত্বমূলক রীতিও গড়ে ওঠে। তাতে যার যা পরিবেশ তার প্রভাব তার মধ্যে কাজ করে, হঠাৎ তাকে বদলে দিলে সেটা সামলানো গণ্ডীবদ্ধ সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

স্ত্রী পুত্র পরিবার ও তা থেকে দশের ও দেশের কাজ এ সবই অযোগী চিত্তের ব্যাভিচারে পর্যবসিত হতে পারে। জগৎহিতবাদে তা থেকে পৌছানো লক্ষ্য থাকলেও অযোগী চিত্তের অনেক ফাঁকি দিয়ে তাকে অনেক সময় ভরতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তা থেকে সাবধান করার জন্য সেদিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে জীবনধারণ কর্ম থেকে লোকসংগ্রহ কর্ম পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র অহং

ভুলে ভুলে এক আত্মম্ভরিতার প্রাচীর গড়ে তুলে কর্তব্য কর্ম করছি এই অভিমানে সব কিছু কর্ম নষ্ট করে দিতে পারে। সেই সব ফাঁকিগুলি বুঝে বুঝে চিত্তকে মুক্ত রাখতে হবে। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে কর্তব্য কর্মে কোনও ফাঁক থাকবে। সেই কারণে শ্রীঅরবিন্দ গীতোক্ত কর্মযোগের ধারাই গোড়া থেকে ধরিয়ে দিয়েছেন যে যোগীর প্রথম কর্ম কৌশল হল অকর্তা হয়ে কর্ম করা ও কর্মে অকর্ম দেখা। এখানে যে দুটি বিষয় সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়, তা হল অহন্তা ও মমতা, আমি ও আমার এই বোধ। অহন্তা থেকে এই বোধ আসে যে "আমি আছি" বলে একাজ চলছে, না হলে কি চলতে পারে? এটাই হল ভ্রান্তি বা মায়া। যে কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছি, সেখানে বাহির থেকে কোন পরিবর্তন হলেই সর্বনাশ। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে"। আমার কর্তৃত্বে আঘাত লাগলেই আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমি করছি বলে আমার মতলবমত ফলাকাঙ্ক্ষা মনের গহনে থেকে যায়। ভাল কাজই করছি, সেটা বেছে নিয়েছি, তাই প্রত্যাশা থেকে আশা ভঙ্গ হলে সেটা মনস্তাপের কারণ হয়। কিন্তু সে রকম হলে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে কর্মফল আমার হাতে নেই, আমার সাধ্যমত চেষ্টায় আমি কোন ত্রুটি রাখি নি। তবে কর্মের ফল সম্বন্ধে সচেতন থাকলে একটা ক্ষোভ আসতে পারে, তাতে একটা খেলুড়ের সহজ ভাব (sporting sprit) আনতে হবে। যত্ন করে কর্ম করেও যদি না সিদ্ধ হয়, তবে আমার দোষ কোথায়? বিচার করার ভার যাঁর পরে, তিনি যদি দণ্ড দেন, হাসিমুখে সে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে; পরাজয়কেও মেনে নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে কর্ম শুরু করতে হবে।

কর্মফলে নিরাসক্ত থাকা হল গীতায় কর্মযোগের প্রথম পদক্ষেপ। আসক্তি বা বাসনা অনেক সময় কর্মে উদ্যম আনে এটা ঠিক। কিন্তু সেটাই যে সব সময় কর্মের উৎসাহ নিয়ে আসে, তা নয়। কর্মের ইচ্ছাই হল শক্তি। সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ হল ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত কর্ম। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ করে

বলেছেন, যুদ্ধ করতে এসেছে, ধৃতি কই? উপনিষৎ বলেন, সত্যকে ধৃতি দিয়ে আকড়ে ধরার কথা। ফলে আসক্ত না হয়েও ধৃতি উৎসাহ সহকারে কর্ম করতে শিখলে কর্মযোগের প্রথম স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এ ভাবে আপনাকে আলাদা করে রেখে দেখে কর্ম করে যেতে পারলে ক্রমশঃ কর্মে রস পাওয়া যায়। সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থেকে নির্দ্বন্দ্ব হতে হবে। সেজন্য সহ্য করার শক্তি বা তিতিক্ষার সাধন মস্ত কথা। আমাদের প্রবাদ বাক্যে আছে তিনটি শ এর কথা, শ ষ স; তার অর্থ হল সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর। এই তিতিক্ষার পরিণামে ভিতরের শক্তি বেরিয়ে আসে এবং তখনই কূটস্থ আত্মার সাক্ষাৎকারে অকর্তার কর্ম ঠিক মত করা সম্ভব হয়। পুরুষ ও প্রকৃতিকে তফাৎ করতে শিখলে দেখা যায় কর্মের ভার প্রকৃতির আর পুরুষ তার সাক্ষী, তিনি অচল অটল। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে পুরুষ কর্ম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন যে আমি কর্ম করি যদিও তিন লোকে কর্ম করে আমার পাবার কিছু নেই, কর্তব্যও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি কর্ম না করেন তাহলে জগৎ ধ্বংসের পথে যাবে, কেননা সাধারণ লোকে কর্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। অর্জুন বলেছিলেন যুদ্ধ তো ভাল কথা নয়, যুদ্ধের সময় কুলস্ত্রীগণ নষ্ট হয় ও তার ফলে বর্ণ সঙ্কর ঘটে। তাতে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ করে বললেন যে এই যুদ্ধ কর্ম না করলে আমিই বর্ণ সঙ্করের কর্তা হব। বিশৃঙ্খলা মনুষ্য জাতিকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। অথচ ভগবান নিজেই এই যুদ্ধকর্ম ফলিত করে রেখেছেন, কাজেই অর্জুনের দায়িত্বও রইল না। এই হল ভগবানের নিজের কর্ম— গভীরে এক প্রশান্তি দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থিত, সর্বদা সেই সন্নিহিত দৃষ্টির আলোয় ও পরিচালনার প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে কর্ম ঘটে চলেছে। এই অকর্তার কর্ম, আর এই রকম করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে একসঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে

পারলে নিমিত্ত কর্ম ও অকর্তার কর্ম কেমন করে দিব্য কর্মও হয়ে ওঠে, তা বুঝতে পারা যাবে।

তাহলে কর্মের লক্ষ্য কি হবে? ধর্মের কর্মকে আমরা তিন ভাবে দেখেছি কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। তিনটিকে এক সঙ্গে নিয়েই যোগে কর্ম করতে হবে। ভাল করে চিনে নিয়ে বুঝে নিয়ে বিকর্মকে পরিহার করে অকর্মকে দেখতে হবে ও কর্ম করতে হবে। তাহলে অকর্ম বিকর্ম ও কর্ম তিন নিয়েই হবে নিমিত্ত কর্ম। এ ভাব আমাদের দেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে যে যজ্ঞার্থে কর্ম বা উৎসর্গের ভাবনা নিয়ে কর্ম করলে বন্ধন বা আসক্তি হবে না। আর তা না হলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়—"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ"। তাই সবচেয়ে বড় কথা হল "মৎকর্মপরমো ভব"। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সেই "মৎ কর্ম" থেকে বিচ্যুতিই বিকর্ম। তখন কোন স্বার্থে বা মৎলবে কাজ হয়, সে সবই বিকর্ম। যা হতে সর্ব ভূতের উৎপত্তি এবং যা দিয়ে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই তাঁর কর্মই হল মানুষের স্বভাবজ কর্ম এবং সেই স্বভাবজ কর্মে সিদ্ধি লাভ করতে হবে। আবার সেই স্বভাবজ কর্মেই হবে তাঁর অর্চনা। এ সবই গীতার অনুশাসনে আমরা পেয়েছি। কার্লাইল (Carlyle) এই ভাবের কথা বলেছেন Work is worship। কিন্তু শুধু কর্ম করলেই অর্চনা হল না, জ্ঞানসহকারে কর্ম করা চাই। কর্ম সকলের উৎপত্তি যে একই ভূতভাবন উৎস হতে, সেই উৎস সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হবে। সর্বব্যাপী ঐ পরম সত্তাই পরম শিব আর উৎস বা প্রবৃত্তির মূলে পরম শিবেরই স্বীয়া শক্তি—এই সমগ্র বোধে কর্ম চলতে থাকলে কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ হবে। শিব-শক্তিকে এক সঙ্গে নিয়ে চলতে না পারলেই কর্ম হয়ে যাবে বিকর্ম। আর ঐ সামরস্য নিয়ে কর্মযোগ শুরু করলে মানব সেবা, জগৎহিতবাদ ইত্যাদি ছোট আদর্শগুলি তার মধ্যে বলানো যায়। কিন্তু সেসব কর্মে মোহগ্রস্ত হয়ে আটকে যেতে না হয়, তাতে সাবধান হতে হবে। দিব্যকর্ম পর্যন্ত আমাদের

লক্ষ্য প্রসারিত হয়ে চলবে। তাই শিব ও শক্তির জ্ঞান একসঙ্গে নেওয়ার অর্থ হল যে, প্রবৃত্তির উৎস ও তাকে ধরে আছে সর্বব্যাপী যে পরম সত্তা এই যুগ্মবোধকে অদ্বৈত ভাবনায় সর্বক্ষণের জন্য চেতন করে রাখতে হবে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি চিৎপ্রকর্ষই কর্মের লক্ষ্য আর তা-ই জীবনের পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটিকেই সাধারণ ভাবে মানব জীবনের পুরুষার্থ বলে আমরা জেনেছি। কাম ও অর্থ যদি ধর্মশাসিত না হয়, তা হলেই তা সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গীতা বলেছেন, কাম যেন হয় ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম, আর সেই কামের অর্থৈষণা থেকে আসে জীবনের অভ্যুদয়। এই অভ্যুদয়ের পথে চললেও পিছন থেকে ধরে থাকবে অকর্তার ভাব, আর সেই মোক্ষভাবনাই নিঃশ্রেয়সের পথ। একটা যন্ত্রের মধ্যে Flying wheel যেমন অচল ও অনড় থাকার ফলে অন্যান্য ছোট ছোট চাকাগুলি চলে, তেমনি অকর্তার ভাবে পিছনে স্থির ও প্রশান্ত থেকে সব কিছু কর্মের প্রবৃত্তি ও গতিকে সংযমে রাখতে হবে। পিছনের ঐ স্থির অকর্তা বা অনড় চক্রটি হল মোক্ষ। এই রকম করে যজ্ঞার্থে কর্ম সম্পন্ন হলে বলা যায়, ধর্মের শাসনে রয়েছে অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই বিরাট বিশ্বে যে যজ্ঞকর্ম চলছে, তার যজ্ঞেশ্বর তো স্বয়ং তিনি। কাজেই ব্যষ্টির দিক দিয়ে দেখলে প্রত্যেকের পুরুষার্থ হল যজ্ঞেশ্বর প্রভুর উদ্দেশ্যেই কর্ম করা আবার সমগ্র বিশ্বের দিক্ থেকে দেখলে সমষ্টির কর্মও তো তাই; তা তাদের পুরুষার্থ। সেই যজ্ঞেশ্বর প্রভুই তো ভগবান, তিনিই অকর্তা হয়ে সকল কর্মের উৎসকে ধরে আছেন। যোগকর্ম করে করে শুদ্ধ হতে হতে এই বোধে বোধ হয় যে, তাঁর দ্বারা বিধৃত হয়ে আমি চলেছি। সেই আমার সত্যসঙ্কল্প। তাঁরই অকর্মের কর্মে আমার নিমিত্ত কর্ম হতে দেখছি ও সেই ভাবেই আমাকে কর্মযোগে যুক্ত থাকতে হবে। নিবৃত্তিযোগেও অকর্মকে যদি আমরা তার আপন ঘরে বসাতে পারি, তাহলে অকর্তার কর্মই করা হবে।

আমার ক্ষুদ্র সংকল্প কামসঙ্কল্প হলে তার ভার বড় দুঃসহ, তা বারবার ভাঙে, হাতড়ে বেড়াতে হয় অথচ তার দার্ঢ্যের অভিমান অনমনীয়। তাই নিয়ে হানাহানির অন্ত থাকে না, ভাঙা-চোরার মধ্যে চরম অবিশ্বাস এসে হানা দেয়। সেই প্রলয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে চিনতে হয় শ্রদ্ধা কি বস্তু, জানতে হয় বিশ্বাসই বা কাকে বলে আর অনুভব করতে হয় প্রেমই বা কোথায়। এই উপলক্ষে 'বলাকা'র কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করতে পারি। সময়টা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর, হিংসার উন্মত্ততায় পৃথিবী টলমল করছে। মানুষের চিত্তে জীবনের মূল্যবোধ সব হারিয়ে যেতে বসেছে, সেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতাশার চরম ক্ষণে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

"আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল।
বাঁচি আর মরি বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
সামনে ধ্বংসের এই অতল সমুদ্র, তবুও এই এই মৃত্যু পেরিয়ে যেতেই হবে।"

এগুলি সব বিরাট ঘটনা, ঘটছে বিশ্বের মধ্যেই, তারই মধ্যে তাকে পেরিয়ে নতুন কিছু ঘটবেই। নূতন ঊষার আবির্ভাবে যে নতুন যুগের সূচনা সেই স্বর্ণদ্বার খুলে পথ সহজ হবে, এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধৈর্য ধরতে হবে। সেই মহাসন্ধিক্ষণে পুরাতন সব কিছু হারিয়ে নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, আর তখনই সাধকের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে দিব্য শক্তিসম্পাতের ফলে (Divine intervention) সাধক দিব্য অধিকার লাভ করে। ঐ মহতী বিনষ্টির পটভূমিকায় ভগবান বলেছেন যে তিনি নিজেই সংহার-রূপী কাল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ....."। তাঁর নিজের কুল যদুবংশ পর্যন্ত সেই ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেল না। কিন্তু তাঁর দিব্য জন্মের রহস্য ঐ মহাসন্ধিক্ষণে সম্ভাবিত হয় "—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" এই পরম ভরসাটি চরম হতাশার ক্ষণে ধরে থাকতে হবে। তিনি অজ

অব্যয়াত্মা, আবার ভূত সকলের ঈশ্বর তিনিই; স্বীয়া প্রকৃতিকে অধিষ্ঠাত্রী করে আত্মমায়া বা প্রজ্ঞাপ্রকৃতি দ্বারা এই ভূত সকলের মধ্যে ভূতপতি তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাতেই বিশ্বব্যাপারের ছন্দ ধারণ করে যে ধর্ম, সেই ধর্ম আবার নতুন করে সংস্থাপিত হয়। এই রকম করে ঋতছন্দ তাঁর আপন নিয়মে বিধৃত হয়ে চলে, সেই ছন্দঃ প্রতিষ্ঠায় দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের বীজ নিহিত থাকে। এই লক্ষ্যের সহায়ক সাধুগণ বিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে নিগৃহীত হয়ে থাকেন, তাই তাঁদের পরিত্রাণ করাও যুগাবতারের আপন কর্ম।

আমরা দেখতে পাই, বিশ্বজগতে কালের পরিক্রমণ চলছে যন্ত্রের মত এক আবর্তগতির ভিতর দিয়ে। কিন্তু সেটা যে যান্ত্রিক আবর্তন মাত্র নয়, ক্রম-অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সেটা ধরা পড়ে। বারবার পুনরাবৃত্তি হলেও একটা গুণগত উৎকর্ষের দিকে প্রকৃতির যাত্রাপথের লক্ষ্য। তাই এক একটা সন্ধিক্ষণে উপরের চাপে এই আবর্তনের ফলেই নতুন করে একটা গঠন (mould pattern) প্রকৃতির মাঝে সংঘটিত হয়। দিব্যসংকল্পের এই প্রয়োজনই যুগসন্ধিতে তাঁর দিব্যশক্তিসম্পাতের নিমিত্ত হয়ে থাকে। সেই শক্তিসম্পাতের ফলে যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব যেমন সম্ভাবিত হয়, প্রকৃতিতে সৃষ্টিব্যাপারও তার পরম লক্ষ্যের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যায়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময় তাঁর সংহার-মূর্তি দেখিয়ে তিনি তাঁর সেই পরম রহস্যটিও ব্যক্ত করে দিলেন। মহামরণকে বাদ দিয়ে মহাজীবনের প্রতিষ্ঠা তো সম্ভবপর হয় না। দিব্য সংকল্পের প্রয়োজনেই সংহাররূপী মহাকালের ভয়ঙ্কর রূপ তিনি করুণা করে যুগমানব অর্জুনের সামনে প্রকটিত করে দেখিয়ে দিলেন। সেই ভীষণ কালাগ্নি রুদ্র স্বয়ং লোকসমূহ গ্রাস করেছেন, দেবগণ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছেন; তাঁরা তাঁরই দেবশক্তি, তাই তাঁর মহিমা তাঁরা বুঝতে পারছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সকলে স্বস্তি উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করছেন, তার মধ্যে প্রবেশও করছেন। কেউ কৃতাঞ্জলিপুটে ভীত হয়ে প্রার্থনা করছেন, গন্ধর্ব যক্ষ

অসুর সিদ্ধগণ সাধ্যগণ বিশ্বদেবগণ সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত। আর যত বড় বীর যোদ্ধা পরাক্রমশালীই হোক না কেন, মধুছন্দের বিরোধী হলে তাদের আর রক্ষা নেই, তারা অবশের মতই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়ে গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তিনিই স্বয়ং এই মহাকাল বিশ্বরূপ, এই দৃষ্টি খুলে গেলে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে শান্ত মনে সানন্দে মৃত্যু বরণ করা যায়। তা হল দিব্যজন্মেরই মরণ। যুগসন্ধিতে দিব্যজন্মের প্রকট ভাব এবং তাঁর দিব্য কর্মে পরম পুরুষার্থ সাধিত হয়। সেই ভাবটা খাঁটি হলে আমার মধ্যেও মূর্ত হবে সর্বজনহিতায় অশেষকল্যাণগুণকর তাঁর নিজের ইচ্ছা। তখন প্রজ্ঞাদৃষ্টি খুলে যাবে—"সত্যমেব জয়তি নানৃতম" দেখতে ও বুঝতে পারব। তীব্র সংবেগে শ্রদ্ধা জ্বলন্ত; আত্মবিশ্বাস ও ভগবৎবিশ্বাস তখন এক একাকার হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা সত্য সংকল্প সত্য, তাই সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি সেই সংকল্প বহন করে চলেছে। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হলে আমার কর্মও দিব্য কর্ম হবে। কিন্তু প্রবর্ত দশার লোক-সংগ্রহের কর্মকে যেন এই ভূমির কর্ম বলে গোলমাল করে ধাঁধায় না পড়ি। দিব্য কর্ম কর্মযোগের পরিপাকে দিব্য-ভূমির প্রকৃষ্ট ফলস্বরূপ। সাধ্য সাধনার শেষে এই সিদ্ধ কর্মের আবির্ভাব হয় মানুষের আধারে তাঁর মহিমায় ও তাঁর করুণায়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এই দিব্য কর্মের এক তীব্র অনুভূতি আছে। নিমিত্ত কর্মে যন্ত্রী চালক আর নিজেকে তার যন্ত্র, এই বোধে বোধ হয়। কিন্তু তাঁর আবেশ যখন সর্বাঙ্গীণ হয়, তখন "আমি" বলে ভিন্ন বোধ একেবারেই থাকে না; আমি লুপ্ত হয়ে যায়, তিনিই স্বয়ং করেন এই বোধের প্রতিষ্ঠায় দিব্য কর্ম সম্ভাবিত হয়। পরম দেবতার আপন কর্ম তখন সম্পন্ন হয়, আধারের কোন দ্বৈতবোধ আর থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষণে ও কর্মে আমরা দিব্য কর্মের আভাস পেয়েছি, কৃষ্ণমূর্তির ভাষণের সময় যে আবেশ নামত, সে বিষয়ে এ্যানি বেসান্ত জানিয়েছেন যে তিনি ভগবদাবিষ্ট হয়েই তখন কথা

বলতেন। He বলতে বলতে তার জায়গায় I বলতেন। এই "I" স্বয়ং Messiah। এটা হল সেই যন্ত্রের flying wheel-এর অবস্থানের একটা দৃষ্টান্ত। তিনি অকর্তা হয়ে স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অটল হয়ে আছেন, আবার তাঁরই আবেশের ফলে এই 'আমি' স্বয়ং তিনি হয়ে গেছে। যন্ত্র চলছে তাঁরই ঋত ও সত্য ছন্দে গতিতে ও নিয়মে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের কথা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে বলেছিলেন যে এই যে তিনি হাত তুলছেন, সেও তাঁর শক্তিতে। এ শুধু যন্ত্রের ভাব নয়, স্বয়ং তিনিই কর্মে অংশগ্রহণ করছেন তিনিই মানুষ আধার হয়ে গেছেন—participation in the Divine, not only Instrument of the Divine। এই হল দিব্য কর্মের মূল কথা, তাঁর শরিক হয়ে কর্ম করা। কর্মযোগের এই পর্যন্ত পরাকাষ্ঠা।

এর পরেও শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস কর্ম (Supramental work) সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ অধ্যায়টি লিখে রেখেছেন, তাতে দিব্যকর্মের ফলিত দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সবই তিনিময় হয়ে যদি কর্ম দেখতে পাই, তাহলে আমি আর থাকি না, তিনিই থাঁকেন, সবই তিনি। কিন্তু সেই ভগবৎ ভাবে আপ্লুত অবস্থা কর্মযোগে সর্বদা থাকে না বলেই নিমিত্ত কর্মের আদেশ—"মৎকর্মপরমো ভব"। এই ভাব চলতে থাকলে আবেশে ঐ পরের অবস্থা এসে যায়, যখন এ আমি থাকে না, দ্রষ্টাস্বরূপে হয় রূপান্তরিত আমির অবস্থান আর তাঁর পরমা শক্তিই শুধু থাকেন—সেই হল দিব্যজীবন। তাই সব কর্মই তাঁর অর্চনা। ফলাকাঙ্খা থাকছে না, কাজেই ব্যর্থ যদি হই, সে তো আমার ব্যর্থতা। পরমা প্রকৃতির কর্ম কি কখনও কোথাও ব্যর্থ হতে পারে? জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ এ সব দ্বৈতের মূল্য সেখানে একরসে পর্যবসিত হয়। ঐ তাঁর 'নিমিত্ত' হয়ে চলা আর বিদ্যুৎ ঝলকের মত আবেশে তাঁর শক্তিপাত—এইভাবে সিদ্ধ হয়ে অনালোকের আলোর পথে চলাই হল কর্মযোগের সাধ্যের অবধি বা চরম সিদ্ধি।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে আমাদের দেশে কর্মে যে বিতৃষ্ণা দেখা যায় তা এসেছে বৌদ্ধদের এক যুগ থেকে। বেদেই পাওয়া যায় মস্করী সম্প্রদায়ের কথা, তাঁরা ছিলেন বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধী। "মা কুরু" থেকে মস্করী শব্দটি এসেছে। তা থেকে "কিং কুতেন" করে কি হবে? এই "কিং কুতেন" পালি ভাষায় কীকট হয়েছে। কীকট সম্প্রদায়ের নীতি হল একেবারেই কিছু না করা। তাদের মতে কর্ম মাত্রেই বন্ধন। কেননা কর্ম আসে বাসনা থেকে। বাসনা থেকেই জন্ম, জন্ম থেকেই দুঃখ। তন্‌হা বা তৃষ্ণার মূলই কেটে ফেলতে হবে যদি দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি চাই। বারবার জন্ম ও কর্মের আবর্তনে এই পৃথিবীতে আসাকে তাঁরা বলতেন ভব, আর এ থেকে নিরোধ হল অনাবৃত্তি—"....ন পুনরাবর্ততে"। যদি এই জন্ম হওয়াই নিরুদ্ধ করতে হয়, তাহলে কর্মের নিরোধ চাই ও তার মূলে বাসনাকেই নিরুদ্ধ করতে হবে। এই হল দুঃখবাদ থেকে উৎপন্ন নিবৃত্তির দর্শনের দৃষ্টি-ভঙ্গী। কিন্তু এ তো সবাই মানে না বা মানতে পারে না। কেননা জন্ম হলে কর্ম করে মানুষ কি শুধুই দুঃখ ভোগ করে? তা তো নয়, দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে এবং আত্মার স্বভাব হল আনন্দ পাওয়া। সুখ ও দুঃখ সবের মধ্যে থেকে সে আনন্দকেই রস স্বরূপে পায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আত্মহত্যায় পর্যন্ত এক রস আছে বলেই সেটা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার ভোক্তা এক গুপ্ত পথে (occult way) সেই রস পান করে থাকে। রোগের যন্ত্রণা ভোগও সেই রকম চৈত্যসত্তার (Psychic being) রোগ ভোগের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আসে, তারই অভিজ্ঞতা (experience) সঞ্চয়ের জন্য। জগতের যা কিছু ভোগ, ব্যথা বেদনা হাসি কান্না জ্ঞান কর্ম প্রেম সবের মধ্যেই চৈত্যপুরুষ রস ভোগ করেন, সেজন্যই ভোগের ব্যবস্থা। বাউলের সেই গানটা আবার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"যোগে প্রেম ভোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে"। যেহেতু ব্রহ্মই সব হয়েছেন, তদতিরিক্ত কিছুই থাকতে পারে না। তিনি রসস্বরূপ হলে

রোগভোগে তাঁরই রস। এই ভাবে যদি সবটা নিয়ে বুঝি তাহলে কর্ম নিরুদ্ধ করে জন্ম নিরোধ করব কেন? দেহ সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। যে দেহ নিয়ে জন্ম, তা হল আমার ভোগায়তন। আমি বাসনামুক্ত হলাম, দেহটা নেই; আমি কোথায়? সেই অসৎ মহাশূন্যে। সে বড় বিষম ঠাঁই। যাজ্ঞবল্ক্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থার কথায় বলেছিলেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি"। কিন্তু সেখানে গিয়েও ফিরে আসা হয় কেমন করে? বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর বুদ্ধ তো আবার ফিরে এসেছিলেন। তাহলে সেখান থেকে ফিরে জগতে আসা যায়। এমন তো হতে পারে যে শেষ যাওয়া এমন গভীরে তলিয়ে গেল যে আর ফেরা হল না। কিন্তু এরও প্রতিবাদ আছে বোধিসত্ত্বের বারবার ফিরে আসার কথায়। পরিনির্বাণগত বুদ্ধও রেখে গেলেন মৈত্রেয় বুদ্ধকে। তাহলে জন্ম নিরোধ হচ্ছে কোথায়? জন্মনিরোধ তো একেবারে করা যায় না, তবে এই আধারের লয় হয় আবার নতুন আধার গ্রহণ করতে হয়। জলের বুদ্বুদ জলে মিলে যায়, কিন্তু অসংখ্য বুদ্বুদ আবার দেখা দেয়। ব্রহ্মই তাহলে বারবার জন্ম নিচ্ছেন। জলের বুদ্বুদ হয়ে আমি তুমি সকলে জলে মিশে গেলাম বা ব্রহ্মই হয়ে গেলাম। তারপর? বৈষ্ণবেরা বলে থাকেন ভগবানের পার্ষদ বা লীলা সঙ্গী হয়ে ভগবান যখন আবির্ভূত হন তাঁর সঙ্গে আসা—এই হল ভক্তের কর্ম। চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় অভিনয়ের পূর্বে মঞ্চের নিখুঁৎ ব্যবস্থা ঠিক রাখার (setting) মত যবনিকার অন্তরালে লীলাময়ের আবির্ভাব ও লীলার সব ব্যবস্থা যেন ঠিক করা থাকে। তাহলে সে দর্শনের মতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের নিত্য ইচ্ছায় তিনি যেমন বারে বারে আসেন তাঁর বিভূতিও সেই সঙ্গে আসে। সৃষ্টির মূলে নিত্যকালের প্রবহমানতার সঙ্গেই সেই ব্যবস্থা তাঁর নিজেরই পরিকল্পনা মত হয়ে রয়েছে। তাই ঘুরে ফিরে জগতে সেই যুগসন্ধি বারবার আসবেই যখন তিনি নিজে অবতীর্ণ হয়ে দিব্যকর্মের সূত্র ধরিয়ে দেন।

বৈষ্ণব বলেছেন "মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান"। যতক্ষণ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁদের মতে ততক্ষণ কিছু হয় না। অনন্ত জীবন যেমন, তেমন অনন্ত কর্মও। তাঁকে নিয়ে সেই কর্ম তাঁরই সেবা। এই হল ভক্তের নিত্য কর্ম। তাই তাঁর সঙ্গে মৃত্যুর উল্লাসে ভাঙা গড়ার মধ্যে ভাঙার কাজও করে চলতে হয়, এইভাবে বুঝতে পারলে তবেই জীবনের সমগ্র দর্শনের চিত্র পাওয়া যায়। উপশমে সবই লয় হয় সে ঠিক আর সেটা চাইও, কিন্তু তা দেবার বা পাবার কর্তা তো তিনিই, আমি নই। যাঁর উপশম, তাঁরই আবার বদরসের খোয়াড়, সেই ভাগাড়ে বসে ভূত প্রেতের ঠ্যাঙানিও আছে। তিনি গড়বেন বলে যখন ভাঙবেন, তা সে যে ভাবেই হক ভাঙাগড়া হবে। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যতই সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া যাক, তার শেষ নেই। যেমন কায়ব্যূহবাদে বলা হয়ে থাকে অনন্ত সঞ্চিত কর্ম আছে। প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হলে যোগী অসংখ্য কায় পরিগ্রহ করে বিস্তৃত হয়ে সবের মধ্যে ঢুকে ভোগ করলেন তবে শান্তি হল। একটা সাম্য বা শান্তি তো আনতেই হবে ত? যে বাদেই চলা হক না কেন। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু কর্মক্ষয়ের কথা বলেন না। প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হলে জ্ঞানের উদয়ে তো মৃত্যুই সম্ভাবিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বের (impersonally personal) কথা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে সম্যক্ জ্ঞানী হয়েই দিব্য কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। রামানুজ এই প্রসঙ্গে নাকি পরিহাস করে বলেছিলেন তাহলে কি পিণ্ডপাতের দ্বারা মরণে সিদ্ধি হয়? জ্ঞানের পর যে দেহ তা হল অবিদ্যা—এ সব নিয়ে অনেক তর্ক ও বাদানুবাদ আছে। শঙ্করবেদান্তে ভামতী প্রস্থান ও বিবরণ প্রস্থানে এ সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তির কর্মপিপাসা থেকে না হয় তার প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হল কিন্তু ভগবানের প্রারব্ধ কর্ম কি কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় থেমে যাবে, যে ব্যক্তি সংসারগণ্ডীর মধ্যে থেকে দিনগত পাপক্ষয় করে চলে? সেখানে কেউ যদি মনে করে আমি এটা

করব না, তাকে যেন ঘাড় ধরিয়ে সেই কর্ম করানো হল, এমন বহু ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি নিজে পরিচালক হয়ে যেমন যুদ্ধ ঘটিয়ে দিলেন, তেমনি তাঁর ইচ্ছা ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে সমগ্রভাবে জীবন দর্শন করলে সব যুক্তিই পঙ্গু হয়ে পড়ে। কোনও "বাদ" দিয়েই তাঁর কর্মের নাগাল পাওয়া যায় না। তাঁর ইচ্ছায় যুক্ত হয়ে কর্মকে বুঝে নিতে হবে, এই হল কর্মের সমগ্র দর্শন (integral philosophy)। ত্রয়ী পথে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযোগের মিলনে জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া (oneness), ভক্তিতে ও প্রেমে তাঁর লীলারস আস্বাদনে ডুবে যাওয়া (fusion & embrace), এ সব উপলব্ধ হলেও শক্তির প্রকাশ চাই কর্মের প্রচণ্ড উল্লাসে। তখন যুক্তি ও ভক্তির সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটে, তা না হলে পূর্ণযোগের পথ ঠিক উন্মুক্ত হয় না। তাই ঐ ত্রয়ীকে একসঙ্গে করে সব্যসাচী হয়ে তাঁর কর্ম করে যেতে হবে. তাঁর কর্ম করতে করতে কর্মই হয়ে যেতে হবে—সেটাই হল নিমিত্ত কর্মে যুক্ত থাকা, সম্পূর্ণভাবে তাঁর হয়ে যাওয়া। এই জন্যই তিনি আদেশ দিলেন "মৎকর্মপরমোভাব"। তা না হলে তিনি ও আমি একরস হব কেমন করে?

বৃন্দবনদাস চৈতন্য ভাগবতে বলেছেন মুক্ত না হলে ভগবানকে ভালবাসা যায় না। ভক্তিতে পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকলে সে ভক্তি শুদ্ধ হয় না। শ্রীঅরবিন্দ সেই শুদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গেই বলেছেন পূর্ণ জ্ঞান না হলে ভক্তি সিদ্ধ হয় না, আধারে কৃষ্ণপ্রেমের অবতরণ হয় না। শ্রীবাসের আঙিনায় মহাপ্রভু চৈতন্যকে ভাবাবিষ্ট শ্রীবাস বলেছেন যে জন্মে জন্মে জীব যে অনন্ত দুঃখ পায়, তা আমি ভোগ করব। ঠাকুর তুমি তাদের সকলকে মুক্ত কর। এ জীবপ্রেম কি রকম? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সর্বশেষ প্রাণীটির পর্যন্ত নির্বাণ অধিগত না হলে তিনি পরিনির্বাণে যেতে পারেন না। একটি প্রাণীকে মুক্তি দিতে লক্ষ জন্মের বন্ধন স্বীকার করা সে কি রকম জ্ঞান আর সেই হৃদয় আর তার প্রেমই

বা কি রকম? এ যুগেও বেদান্ত কেশরী বিবেকানন্দের গর্জন শুনতে পাই—"মুক্তি চাইনে, সর্ব জীবের মুক্তি দে মা। মা তুই নেমে আয়।" এই সব দেখে শুনে বুঝি এই সেই পুরুষের প্রেম, পুরুষোত্তমের প্রেম-বীর্য। সে তো শুধু প্রেম-বিলাস আর পূজাগ্রহণ নয়। ধরার ধূলি সঙ্গে কাদা মাটি ক্লেদ মাখামাখি হয়েও মুক্তির পথ খনন করে চলা, সোমপাত্র গঠন করার জন্যে সূক্ষ্ম তন্তু বয়ন করে চলা—এই সব হল দিব্যজীবনের ভূমিকায় দিব্য কর্ম—যা শ্রীঅরবিন্দ সর্ব মানবের জন্য করে চলেছেন। Life Divine গ্রন্থে তিনি অসম্ভূতির দিকও দেখিয়েছেন। অসম্ভূতিতে গিয়ে কেউ কেউ আসতে চায় না বা আসেও না। সেই সবই তাঁর ইচ্ছায়। কিন্তু তাঁরই যে সম্ভূতি, তাকে তো অস্বীকার করা যাবে না। এক দিকে ঝুঁকে পড়লে সমগ্র দর্শন খণ্ড হয়ে যায়, কিন্তু সমগ্রে অভিভূত হয়ে খণ্ডকে দেখতে পারলে তার ব্যষ্টিত্বও বজায় থাকে, অখণ্ডের খণ্ড হয়ে সে শোভা পায়; সে "মৎকর্মপরম" হয়ে যায়।

২০

অতিমানস ও রূপান্তর

কর্মযোগ সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। গীতার আদর্শ নিয়ে কর্মযোগের কর্ম করা থেকে আরম্ভ করে দিব্যকর্ম পর্যন্ত আমাদের আলোচনার বিষয় ও লক্ষ্য ছিল। তা যেখানে শেষ পর্যন্ত পরিনিষ্ঠিত, সেই অতিমানসই দিব্যকর্মযোগের উৎস ও পরিণাম—এটা আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই জানতে ও বুঝতে পারলাম। অতিমানস কর্মকে কর্মযোগের গোড়া থেকেই আদর্শ ও লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হবে এ কথা ঠিক, কিন্তু অতিমানসকে নিয়ে এক উদ্ভট কল্পনা করে গোড়াতেই তাকে কর্মে নামাতে চেষ্টা করলে, সেটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। সাধক দুরাগ্রহবশত যেন সেদিক দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে বিপথে না পড়েন, সেদিকে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। দিব্যকর্মের ভাব সহজ হলে তার পরিপাকে অতিমানস কর্ম স্বাধিত হতে পারবে, সেই দুর্লক্ষের অভিসারে শক্তিপাত হতে হতে অতিমানসের আবেশে এক দিব্য পরিমণ্ডল গঠিত হবে। তা বুঝতে ও ধরতে পারার সাধনায় একেবারে গোড়ার কথা হল সুসমঞ্জস হওয়া চাই। পূর্ণযোগ সর্বাঙ্গীণ যোগ, তার প্রতিটি অঙ্গই এক সুষম সমতায় বিধৃত থাকবে। কোন একটি অঙ্গকে অধিক পরিপুষ্ট করতে গিয়ে যোগের সর্ব অবয়বের পবিত্র তন্তুতে চাপ পড়ে বদ্ধ আবর্ত তৈরী হয়ে শক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের ভূমিকায় সাধনার প্রারম্ভেই "ব্যাপ্তিরূপেণ সংস্থিতা" ঈশ্বর-শক্তিতে আবিষ্ট হলে সাধকের স্বধর্ম ও স্বকর্ম সহজ হয়ে আসবে। বৃহত্তের সঙ্গে আত্মার ব্যাপ্তির বোধ যতই নিবিড় ও লঘু হয়ে আসবে, ঊর্ধ্ব লোকের শক্তিধারা ততই কার্যকরী ও সহজ হতে পারবে। সাধারণত মন দিয়েই আমরা সাধনা করতে যাই, আর তাতে রুচি ও সংস্কার

অনুযায়ী একদিকে ঝোঁক পড়ে ও সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলি। অথচ একটা শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় পাই বলে নিজের অসম্পূর্ণ দর্শন ও অসংযত আবেগকে তাঁর ইচ্ছা বা ব্রহ্ম-সঙ্কল্প বলেও ভুল করতে পারি। জ্ঞান ভক্তি ইচ্ছা সবই একসঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকবে সাধন কর্মে। পাখির দুটি ডানার মত জ্ঞান ভক্তিকে সমভাবে বিধুনিত করে স্বচ্ছন্দে আকাশবিহার—এই হল দিব্যকর্মযোগের গতির স্বরূপ ভাবনা। তাই আধার ও শক্তির বিভেদ অনুসারে কর্মফল বা কর্মপন্থা সকলের সমান না হলেও কোন একদিক নিয়ে মত্ত হতে গেলেই ডানা-ভাঙা পাখির অবস্থা দাঁড়াবে। তা আমাদের পরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই অতিমানস শব্দের মোহে শক্তিলাভের দিকে ঝোঁক না দিয়ে, দিব্য ভাব বা ভগবত্তাই হবে আমাদের আধার গতি সহায় ও লক্ষ্য। সর্বার্থসাধিকা মায়ের চেতনার মধ্যে আমাদের সর্বাংশে নিমজ্জিত হতে হবে। সেই অখণ্ড সমগ্র চেতনায় জেনে বা না জেনে সব কিছুই বিধৃত হয়ে আছে। সে মহিমার পারে যাওয়া যায় না। তাঁকে আশ্রয় করেই পরম পুরুষের পরমার্থ। তাই মায়ের শিশু হয়ে চলাই সাধারণভাবে সকলের পক্ষে সহজ পথ আর সেই পথে আমাদের জীবনেরও তো পুরমার্থ।

অতিমানস অনেক দূরের কথা, তাকে সামনে পেলেও চেনা ও ধরা আমাদের পক্ষে এখনও সহজ নয়। তাই Higher mind বা উত্তর মানসের বোধ গোড়ায় থাকলে সেটাই বড় কথা। এই যে আমাদের সাধারণ দেহ-প্রাণ-মন, একে অতিক্রম করে যে এক বৃহতের বোধ আমাদের ঘিরে রয়েছে, তাতে আবিষ্ট হতে পারলে মানসোত্তর ভূমির কাজ সহজ হবে, তাঁর ইচ্ছামত তিনি শক্তিপাত করে করে অতিমানসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। তাই মনে হয়, অতিমানস কর্ম নিয়ে গোড়ায় মাথা ঘামিয়ে শব্দ নিয়ে টানাটানি করতে গেলে কর্মযোগই পণ্ড করে ফেলব। রূপান্তর যোগের প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে চৈত্যরূপান্তর চাই সবার আগে। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগটি নিবিড় প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।

আমাদের মধ্যে যে ভক্ত, সেই তো চৈত্যপুরুষ। বৈষ্ণব বলেছেন ভক্তিই জীবের স্বভাব। শিব হয়েও ভক্তির ভাব নিয়ে জগৎ-সংসারে যে বিচরণ করা যায়, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি এ যুগের রামকৃষ্ণদেবের আচরণে। তাঁরই কথায় জেনেছি যে বাপ যদি ছেলের হাত ধরে থাকে, সে ছেলে পড়ে যেতে পারে না; কিন্তু ছেলে বাপের হাত ধরে চললে পড়ে যেতে পারে। এই যে তিনি এসে হাত ধরেছেন—এই ভাব নিয়ে কর্ম করাই হল "মৎকর্মপরমো ভব"। তোমারই কর্ম, এই ভাবের প্রতিষ্ঠা হয় ভক্তিতে ভালবাসায়। ভগবানের জন্য যে তৃষ্ণা, সে তো ভালবাসারই কাঙালপনা। "দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না"—এই তীব্র অভাববোধই তো পাগল করে তোলে। আর তখনই নকল আমির মুখোস খসে যায়, চৈত্যপুরুষ তাঁর নিজের আসনে বসতে পারেন। ঐ নকল আমি তখন রূপান্তরিত হতে থাকে; তাকে বিসর্জন দিয়ে "আমি নিঃশেষে তোমার," ভালবাসায় এই রকম আত্মোৎসর্গের পরিণামে আসে চৈত্যরূপান্তর। জীবন তখন সরস ও মধুর হয়। অজানা দীর্ঘ পথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই বালিকা বধূর সহজ নির্ভরতা নিয়ে সাধক তখন পথ চলে। ছোট মেয়ে, সে তার বরকে ভাল করে চেনে না। তার নিজের মত ছোট করেই সে তাকে দেখে; তাতে গুরুজনের চোখে তার বরের কাছে হয়তো কত অপরাধই করে বসে। কিন্তু তার বঁধু তার বর, সে তো হৃদয়ভরা প্রেম নিয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে যে, তার বালিকা বধূর হৃদয়ে সেই প্রেম জাগবে কবে, তার হৃদয় দিয়ে বঁধুর হৃদয় চিনবে কত দিনে? কত রাতই বিফলে চলে যায়; কিন্তু যেদিন দুঃখ-রাতের ঝড় এসে সব কিছু টলিয়ে দেয়, তখন ঐ বালিকা বধূটি তার বরকেই সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখনও সে জানে না যে তুমি তার জন্য নন্দনবনের মধুও সংগ্রহ করে রেখেছ। সেই রকম চৈত্যসত্তার স্ফুরণে চিদাবেশে সাধক তার পথ চলা শুরু করে। পথ অজানা, আলো আঁধারের মেঘ ও রৌদ্র পেরিয়ে যেতে তার হৃদয়ের সহজ ভালবাসাই হয়

দিশারী। চৈত্যপুরুষের স্থান হল হৃদয়ে আর চৈত্যপুরুষ তো তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানেন না। তাই তাঁরই শক্তিতে চৈত্য রূপান্তরের ফলে সেই সহজ রসের ধারাটিই পুষ্ট হয়। তখন জীবনের সব কিছু মধুময় হয়ে ওঠে। আকাশ বাতাস আলো প্রাণী সারা জগৎ অন্তরের ঐ রসের প্রবাহে ভেসে চলে। শ্রুতির সেই বিখ্যাত মন্ত্র "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ..." চৈত্য রূপান্তরের মধুময় অনুভব। জীবভাব সম্পূর্ণ বজায় থেকেও সব কিছু তুমিময় মধুময় হয়ে ওঠে। বাউল গেয়েছেন—

"কানে শোন চোখে দেখ ধুলা আর মাটি
প্রাণ রসনায় চাইখ্যা দেখ রসের সাঁই খাঁটি।"

এই বুদ্ধি এলে হয় জীবভাবের সিদ্ধি। চৈত্যরূপান্তরের আত্মপ্রকৃতি জীবভূতা সনাতনী পরা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তখন অপরা প্রকৃতির পঞ্চভূতের বিকার আর মন বুদ্ধি অহঙ্কার সবই তাঁর হয়ে গেল। বৈষ্ণব ভক্তের পরিভাষায় সাধক তখন হয় গোপী। গোপী কৃষ্ণের নাগাল পায় না, তিনি অনেক দূরে। তাঁর আবেশে গোপী কৃষ্ণময় হয়ে যায়। আবার জ্ঞানের দিক প্রবল যেখানে, সেখানে সাধক পুরুষের মত বিবিক্ত থেকেও দেখে যান, সেই দ্বিদল চণকের মত পুরুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান—সম্পরিষক্ত অবস্থা। এই ভাবের ওপর নিমিত্ত কর্ম দিব্য কর্ম হয়ে ওঠে, তিনিই আছেন আমি নেই।

চৈত্যপুরুষের প্রকৃতিতে পুরুষ নেমে এলে হয় পুরুষের রূপান্তর। গোপীদের নিয়ে রাসলীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, কেননা ভক্তির অহঙ্কারে গোপী তাঁকে বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁধবে কে? ভাগবত বলেছেন, তিনি যখন চলে গেলেন তখন সবই শূন্য। সেই বিরহের শূন্যতাই কৃষ্ণ। গোপীগণ নিজেদেরই কৃষ্ণ মনে করে তাঁর লীলানুসরণ করছে; এই ভাবে গোপী স্বয়ং কৃষ্ণই হয়ে যায়। প্রকৃতি পুরুষে উঠে যাচ্ছে, ব্যষ্টি-চৈতন্য সমষ্টি-চৈতন্যে একাকার—"মহাত্মা সর্বভূতাত্মা"। তখনই আসে চিন্ময় রূপান্তর। আর

তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র চৈতন্যের রূপান্তরের অভিযানে, এই এক একটি লক্ষণে ভূমির পর ভূমি অধিগত হতে থাকে অতিমানস রূপান্তরের পথে। শ্রীঅরবিন্দ সেখানে একটা গভীর কথা বলেছেন spiritual positivism—অস্তিত্বের প্রত্যয়টি গাঢ় নিবিড় সর্বগ্রাসী হবে। চৈত্যপুরুষই চিন্ময় পুরুষে পরিণতি লাভ করেন। এক সাযুজ্যের ফলে অদ্বৈত চেতনায় গোপীর মত তিনি ও আমি এই উল্লাসের রসবিলাস চলতে থাকে। কিন্তু সে পর্যন্তও সূক্ষ্ম অহং অনেক সময় ছায়ার মত থাকে, যা থাকলে অতিমানস রূপান্তরের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তথাকথিত সিদ্ধ চেতনাতেও অহং সম্পূর্ণ নির্গলিত না হলে রূপান্তরের যোগ সম্পূর্ণ হতে পারবে না। আত্মায় তাঁর মহাশক্তির অবতরণে যে প্রভূত বীর্য বা বলের আধান হয়, সে শক্তিবলে নিজের হাত দিয়েই নিজের মাথা কাটতে হয়। না হলে ঐ অহং (ego) থাকলে সেই ছিদ্রপথেই শক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। শম্ভু হতে গিয়ে সাধক তখন শুম্ভ হয়ে যায়। দেবীকে বাহুর মধ্যে পেয়েও সে মার খেয়ে নীচে পড়ে যায়। এই কারণেই শক্তির প্রকাশে বিভূতির দিকে ঝোঁক গেলে বিরাট বাধা এসে পড়ে, যাতে প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চিন্ময় রূপান্তর সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করাই হল spiritual positivism।

পূর্ণব্রহ্ম তাঁর পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত—সেই ব্রহ্মকে এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েও যদি অনুভব করতে পারি। অথচ চিন্ময় আবেশ পুরোপুরিই আছে। ব্রহ্মশক্তির সেই আনন্ত্যের ভার বহন করা প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ যুগের তপস্যায় সিদ্ধ হতে চলেছে। সেই সহজ ভাবের ওপরেই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। সেখানে যেন লীলাচ্ছলেই যত কিছু সাধন সম্পদ সব সহজ ভাবেই অধিগত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আধারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণে তাঁর সাধনার সিদ্ধি বলে ঘোষণা করেছিলেন। আবার সেই সিদ্ধ বিষ্ণুচৈতন্য নিয়েই তিনি আরও গভীরে সে সিদ্ধিকে টেনে নিয়ে গেছেন এই জগৎকে তুলে ধরার জন্য।

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রয়ী যোগের কথা বিশেষভাবে বলে তিনি আত্মসিদ্ধি-যোগের কথা সর্বশেষে বলেছেন। আসলে সহজ যোগ বলার অর্থই হল যে কর্ম জ্ঞান ভক্তি সবই পরিপূর্ণ আত্মসিদ্ধির উপায় এবং সেই কর্ম যোগকর্ম হলে সিদ্ধিও তখন সহজ হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি যে কর্মের সহচরিত, তা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে ধরতে পেরেছি। কিন্তু তবুও সে সহজ সিদ্ধি লোকের পক্ষে সহজ হয় না। তাই মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়ী ত্রয়ীকে আলাদা করে করে অনুশীলন করে পূর্ণকে আমাদের বুঝতে হবে এবং সাধনায় তাদের মিলিয়ে নিতে হবে। কর্মযোগের পর এবার আমরা জ্ঞানযোগের আলোচনায় জ্ঞানের সম্যক পথটি ধরে চলার চেষ্টা করব।

* * *

যোগের প্রথম কথাই হল একাগ্রতা। একাগ্রতা নিয়ে অন্তর্মুখীন হয়ে পথ চলা শুরু করলে তবে যোগের পথ খুলে যেতে থাকে। না হলে বকের মাছ ধরায় বা শিকারী বিড়ালের উপায় কৌশল্যে যে একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে চিত্ত অন্তর্মুখীন হয় না। সমাধি হলেই যোগ হয় না। তাই প্রথমেই চিত্তবৃত্তিগুলি বহির্মুখ না থেকে অন্তর্মুখ হতে থাকে। যোগের শুরুতে এইভাবে জ্ঞানের ধারা উলটে যায়। আমি কে, আমাকে জানব কি করে, ইত্যাদি আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে যে ব্যাকুলতা বেড়ে চলে, তা বাড়তে বাড়তে আত্মাকে জানতে গিয়ে বিরাট ভূমাকে জানতে চায় ও সেই বৃহতের মধ্যে ডুবে যায়। তারপর জানতে হয় জগৎকে—দুনিয়ার দিকে আত্মার দৃষ্টি ফেরাতে হয়। গুণত্রয়ের ভিতর দিয়ে বিশ্বে যে কালের পরিক্রমা চলছে, তার ভিতরে অণুরও অণু আবার মহানেরও মহান্ দুভাবেই তাঁকে পেতে হবে, জানতে হবে, এই হল যোগ। তখন দেখি প্রকৃতিতেই তো যোগ চলেছে। তাই আত্মসচেতন হয়ে হুঁশে থাকা যোগের প্রাথমিক লক্ষণ। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিকা নিয়ে সব কিছু কর্মই করা যেতে পারে।

তার জন্য সর্বাবস্থায় সর্বভাবেই আত্মসংযমের অনুশীলনটি চাই। সব কিছুই বুঝে করতে হবে, কোন মতেই প্রমত্ত হয়ে সংযম থেকে ভ্রষ্ট হতে নেই। All life is Yoga-এর এই হল প্রধান কথা।

অতিমানস রূপান্তর পর্যন্ত লক্ষ্য রেখে আমাদের যোগপথে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু আগে থেকে অতিমানস শব্দ নিয়ে প্রমাদের সৃষ্টি করে লাভ তো নেই-ই, বরং ক্ষতি আছে। চৈত্য রূপান্তর ও চিন্ময় রূপান্তরের পরিপাকে যথা সময়ে অতিমানস রূপান্তর সম্ভাবিত হবে। এক হিসাবে তাই হল শেষ কথা। তাই তাঁর প্রসাদে যোগক্ষেম বজায় রেখে চলতে হবে। অপ্রাপ্ত বস্তুকে লাভ করা যায় যোগের ফলে, আর সেই প্রাপ্ত বস্তুকে রক্ষা করাই হল ক্ষেম। যা পাওয়া যায়, তাকে আত্মসাৎ করতে হবে, হজম করতে হবে। ঋদ্ধিতে সিদ্ধিতে চিদ্‌বিভূতি সব ঝরে ঝরে পড়ে, মহাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে সব কিছু ঢেলে দিতে চাইছেন পার্থিব চেতনার 'পরেই। এই বিরাট শক্তি আধারে সহজ হয়ে আসন গ্রহণ করতে পারলে তবেই না রূপান্তরের যোগ সফল হবে।

অতিমানসের পথে আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য যে মানস বা মন সর্বদাই সঙ্গে রয়েছে। মন আলোময় হতে হতে শেষ পর্যন্ত অতিমানসে রূপান্তরিত হচ্ছে লোকোত্তর অতিমানসের আবেশেই। শ্রীঅরবিন্দ যোগের প্রভাবে মনকে নিস্পন্দ করার সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন। মন শূন্য হয়ে যায়। অমনীভাব (land of no mind) মনেরই অন্য দিক। সেখানে মন কাজ করে না কিন্তু পূর্ণ বোধ থাকে। ঐ শূন্যতা বা অমনীভাব পিছনে থেকে কাজ করে। উত্তর মানস প্রভাস মানস বোধিমানস অধিমানস এই ক্রমে সাধক পূর্ণযোগে আরূঢ় হলে অতিমানস তাঁর স্বীয়া শক্তিতে সক্রিয় হতে পারেন। অদ্বৈত অনুভূতির চরম কথাও হল তাই।

ঈশোপনিষদের মন্ত্রগুলিতে অতিমানসের আভাস পাওয়া যায়। আত্মাতে সর্বভূত, সর্বভূতে আত্মা ও আত্মাই সর্বভূত। এইভাবে আত্মা ব্রহ্ম ও জগৎ

তুরীয় অদ্বৈতানুভব। আত্মদীপ অন্তরে আর বাহিরে সর্বব্যাপী তুরীয় যে ব্রহ্মজ্যোতি, দু-ই এক। অদ্বৈতানুভূতির চরম কথা হল সর্বভূত—জীব জগৎ ব্রহ্ম সব একাকার। অনন্ত আলোর পরিধি, কিন্তু কেন্দ্র হল আত্মবিন্দু। তাই আত্মভাব থেকেই সব কিছু দেখা যায়, যেন ঘরভরা আলো আবার মানুষগুলিও আলো। ক্ষুদ্র অহংএর ক্ষুদ্রতা ভাঙে ভালবাসায়, কিন্তু সে ভালবাসা কোথায়? সেই ভালবাসায় বেঁচে থাকা, জীবন্ত প্রেমমূর্তি হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হওয়া, এই তো সার কথা। নির্বাণের পর যে শ্রীঅরবিন্দযোগের সত্যিকার আরম্ভ বলা হয়েছে, তার সূত্র হল ওই। বিজ্ঞান ভূমিতে অনন্তের পথে (Infinity) যাত্রা, অনন্তে প্রসারিত চিত্ত আর আলোর মতই সেই চেতনার ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিদেবীই অতিমানসের কাজ শুরু করেন। বৈদিক ঋষির মন্ত্র "উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম" জীবনে জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাইরের মাটিতেও 'মা'টি দেখা দেন। বস্তুজগৎ ভাবজগৎকে প্রকাশ করে দেয়। সেই ভাবের পরিপাকে ভাবই আবার জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। ভাবের জ্যোৎস্নালোকের আবেশে স্বপ্নময় এক অবস্থা প্রথমে আসে, তা কিন্তু সূর্যের আলোর মত অত স্বচ্ছ নয়। কিন্তু ঐ স্বপ্নালোকেই শক্তির পলিমাটি পড়ে পড়ে চিৎসূর্য উদিত হবেন। তখন হয় ভাবেরই জাগ্রত জগৎ। স্বপ্নাবস্থায় বা অন্তর্দশায় চিজ্জ্যোতির প্লাবন বিদ্যুতের মত ঝলকে ঝলকে আসে। একপ্রত্যয়সার প্রভাসে ভিতরে অন্তর্জ্যোতি অন্তরে চিৎসূর্য ও জাগ্রত ভাবের ইন্দ্রিয় সব একরসে ঝলমলিয়ে ওঠে। তখন তো সৃষ্টিধারাই উলটে যায়। বোধির আলোয় দিব্য আবেশ প্রাতিভ-সংবিৎ থেকে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও তা থেকে জগৎ পরিবেশ সবই যেন রূপ ধরে। এইভাবে বিষয় বিষয়ীর ভিতরে আগে সৃষ্ট হয়, তার বহির্মুখ প্রকাশ আত্মচৈতন্যেরই বিকিরণ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখিয়ে দিলেন "ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব"—আগে থেকেই তাঁর নিধন-যজ্ঞ হয়ে আছে। কালের নিয়মে যথাসময়ে তাকে এই বস্তু জগতে প্রতিফলিত কর, নিমিত্ত হয়ে

কর্ম করে। এই ভাবেই বুঝতে পারা যায় যে তখন শ্রবণ (শ্রবঃ) দর্শন (চক্ষু) ব্রহ্মসংস্পর্শে সবই দিব্য হয়ে যাবে। "মহেরণায় চক্ষসে" এই মন্ত্রে শ্রুতি বলছেন, এই চোখ দিয়েই সেই মহান্ বিপুল আনন্দকে দেখব, এই সমস্ত জগটাই দিব্য দেখতে পাচ্ছি। বাহিরের চেতনায় এই অনিবাধ বৈপুল্য আত্মারই আত্মপ্রসারণ। এই রকম করে বিশ্বচৈতন্যে নিমজ্জিত হয়ে উজ্জ্বল রসে জারিত হয়ে ব্যক্তিচৈতন্য ভগবৎ-চৈতন্যকে আত্মসাৎ করে। সেই মহাপ্লাবনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গলে যাবে। আর তখনই অতিমানসের মহা বিস্ফারণ সজ্ঘটিত হবে। রূপান্তর যোগের কাজ তখনই সম্পূর্ণ হতে পারবে, তার পূর্বে নয়। অতিমানস কালশক্তিকে কি ভাবে নিয়মিত করে, সে সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ শেষের দিকে সূত্র ধরিয়ে দেবেন। কালাতীত অধিষ্ঠানে মহাকাল ও ত্রিকাল সেখানে একাকার, কালের প্রবাহে সেই মহাবিন্দুক্ষণটি চেতনায় ধরতে শিখতে হবে। সেই মহান আবিষ্কারে চেতনার রূপান্তরে পূর্ণযোগের পরমা সিদ্ধি পর্যন্ত সম্ভাবিত হতে পারবে।